সমাজকল্যাণে আলিমগণের ভূমিকা ঃ ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯০১-১৯৫০ইং পর্যন্ত

গবেষক

মোঃ শফিকুল ইসলাম

এম.ফিল গবেষক

রেজি. নং ঃ ৭৮/১৯৯৫-৯৬

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library

446902

446902

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ - ২০০৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **মোঃ শফিকুল ইসলাম** কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"সমাজকল্যাণে আলিমগণের ভূমিকা ঃ ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯০১-১৯৫০ইং পর্যন্ত"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানামতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম এবং ইতিপূর্বে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

০৬.০১.০৯

(ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

446902

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"সমাজকল্যাণে আলিমগণের ভূমিকাঃ ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯০১-১৯৫০ইং পর্যন্ত"** অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণা পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

০৬.০১.০৯

মোঃ শফিকুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

446902

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমার এ গবেষণা কর্মটি (**সমাজকল্যাণে আলিমগণের ভূমিকা ঃ ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯০১-১৯৫০ইং পর্যন্ত**) সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার গবেষণাকর্মের প্রধান উৎসাহ দাতা মরহুম অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্দিনকে। আমার গবেষণাকর্মের শেষ পর্যায়ে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদনে শারীরিক অসুস্থতা ও কর্ম ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি যে তাগিদ ও পরামর্শ দিয়েছেন কোন বিনিময়েই তার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। আমি গভীর চিত্তে আজকের এই স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহর দরবারে তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করেন। আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাজনে আবদ্ধ হয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান। তার নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তার প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তার দীর্ঘায়ূ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা মোঃ আব্দুস সাত্তার মাতুব্বর ও পরম শ্রদ্ধেয় আম্মা জনাবা সকিনাহ বেগম, শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মাওঃ ইসমাইল হোসেন ও শাশুড়ী খাদিজা বেগম, বড় ভাই মাওলানা খলিলুর রহমান, ছোট ভাই যাকারিয়া, স্ত্রী আফিফা বেগমসহ পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যের প্রতি। আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য সহযোগিতা দানে তাদের জুঁড়ি নেই। আমার জীবনের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় আমার আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন ও স্ত্রী তাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের একটা বড় অংশ ছাড় দিয়েছেন আমার গবেষণাকর্মের স্বার্থে। আমি স্বকৃতজ্ঞচিত্তে মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জীবনের সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং অনেকের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাদের মধ্যে জামালপুর মালঞ্চ কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা আবু ইউসুফ খান, জামালপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রাক্তন ডিডি জনাব রেজাউল করীম, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা-মোড়েলগঞ্জ বাগেরহাট এর অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও শিক্ষকবৃন্দ, মোড়েলগঞ্জ লতিফিয়া কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা রুহুল আমীন খান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও আগ্রহ আমার গবেষণা কাজের গতি বৃদ্ধি করেছে বলে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থান "পাদটীকা" উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম ও তাদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। ঐ সব লেখকের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত পর্বে যারা বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের মধ্যে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবুল বাসার, জনাব মাওলানা মোস্তফা জামান এবং ডিপ্লোমা-ইন-সায়েন্স কম্পিউটার অপারেটর মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূঁইয়া অন্যতম। তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সর্বোপরি আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

১০.০৬.০৭

মোঃ শফিকুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

আ.	=	আরবী
আ.	=	আলাইহিস সালাম
আ.	=	আব্দুল
ইং	=	ইংরেজী
উঃ	=	উত্তর
খৃ.	=	খৃষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দে
খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ/খ্রীষ্টাব্দে
খ্রি.	=	খ্রীষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দে
খৃ. পূ	=	খৃষ্টপূর্ব
জ.	=	জন্ম
দ.	=	দক্ষিণ
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর (পি.এইচ.ডি)
প.	=	পশ্চিম
পুন.	=	পুনরায়
পুন. পুন	=	বারবার
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
বাং	=	বাংলা
মৃ	=	মৃত, মৃত্যু
মাও.	=	মাওলানা
রহ.	=	রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
রেজি.	=	রেজিষ্টার্ড
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
স./সা.	=	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
হি.	=	হিজরী
A.H	=	হিজরী সন
A.D	=	খ্রীষ্টাব্দ
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ/অনুদিত
সম্পা.	=	সম্পাদনা/সম্পাদিত
তা.বি.	=	তারিখবিহীন
বি. দ্র.	=	বিস্তারিত/বিশেষ দ্রষ্টব্য
P.	=	Page.
Opcit	=	Open Cito.
Ed.	=	Edition/Editor/Edited.
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangal
Ibid	=	(Ibidem) in the same place, from the same source.
Vol		Volume

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমাজকল্যাণ বলতে আধুনিককালের সুসংগঠিত সেবাদান কার্যকে বুঝায়। এর লক্ষ্য হল জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধন। এ কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে সমাজকল্যাণ কিছু পরিকল্পনা, নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। যদিও এখন পর্যন্ত সমাজকল্যাণের কোন নির্দিষ্ট ও সার্বজনীন দর্শন গড়ে উঠেনি। কারণ সমাজ পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। প্রত্যেক দেশেই সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সেদেশের আর্থ-সামাজিক, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এজন্য সমাজকল্যাণ দর্শনের মধ্যে সার্বজনীন ঐক্য পরিলক্ষিত হয়না। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজকল্যাণ দর্শনেরও পরিবর্তন ঘটে। তদুপরি সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, অনুশাসন এবং অনুভূতিই সমাজকল্যাণ দর্শনের সার্বজনীন ভিত্তি। ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে মানুষ যেমন স্রষ্টাকে চিনছে তেমনি স্রষ্টার সৃষ্টির সেবায়ও নিজেকে নিয়োজিত করতে শিখেছে। সমাজকল্যাণ দর্শন অনেকাংশে কতগুলো চিরায়ত ধর্মীয় নীতির উপর অধিষ্ঠিত বিধায় সার্বজনীন সমাজকল্যাণ দর্শন গড়ে না উঠা সত্ত্বেও অভিন্ন কতগুলো মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সব সমাজে পরিচালিত হয়ে আসছে। যদিও সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজবদ্ধ মানুষের প্রয়োজনের বিভিন্নতার জন্য সমাজকল্যাণের অভিন্ন ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব নয়; তথাপি সমাজবদ্ধ মানুষের কতিপয় অভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ সবের স্বীকৃতি, লালন ও উন্নয়নই সমাজকল্যাণকে স্বকীয়তা ও সার্বজনীনতা দান করেছে। তাই সমাজকল্যাণ দর্শন এমন সব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান যা সমাজবদ্ধ মানব গোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্য কল্যাণ সাধনের চালিকা শক্তি যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও যুক্তিযুক্ত অবস্থা নির্বিশেষে সব মানুষের সার্বিক মঙ্গল বিধান করে। যার ফলে কতিপয় অভিন্ন বিষয়ে সকল মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়।"

জাতি-ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সামগ্রীক কল্যাণ সাধনই সমাজকল্যাণের মূল দর্শন। মানব সভ্যতার উষালগ্নেই সমাজকল্যাণের শুভ সূচনা হয়। এর পিছনে সর্বদাই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে মানুষের পারস্পরিক প্রয়োজন, ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবিক চেতনা। আদিকালে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই মানুষ পরস্পরকে বিপদাপদে সাহায্য সহযোগিতা করত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানুষের বিপদে সাহায্য করার মত যখন কোন ব্যবস্থা কার্যকর ছিলনা, তখন ধর্মীয় তাগিদেই মানুষ বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। কারণ, মানবকল্যাণের চিরন্তন বাণী নিয়েই প্রতিটি ধর্মের আবির্ভাব। বিশ্বের প্রতিটি ধর্মেই মানবসেবার প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পারস্পরিক প্রয়োজন ও নির্ভরশীলতা, মানবতাবোধ, মানবিক চেতনা প্রভৃতি সমাজকল্যাণ দর্শনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রেরণা সমাজকল্যাণ দর্শনের সার্বজনীন ভিত্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে। ধর্মপ্রচারকদের শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ যেমন স্রষ্টাকে চিনেছে, তেমনি সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার তাগিদ ও অনুভব করতে শিখেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ক্ষুধার্তকে অন্নদান, অসহায়কে সাহায্য দান, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান, বিপদগ্রস্তকে পরিত্রান দান এবং অক্ষমকে সহানুভূতি ও সমানুভূতি প্রদর্শন প্রভৃতি সব সমাজে পরিলক্ষিত হয়, যেগুলো সকল দেশের সমাজকল্যাণের মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। ধর্মপ্রাণ মানুষ পরকালীন মুক্তির আশায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে কাজ করতেন। এদিক থেকে পীর, ফকির, মুরশিদ, যাজক, পুরোহিত ও ভিক্ষুদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা জনগণের দুর্দশা লাঘবে সর্বদাই যেমন ধর্মীয় বাণী প্রচার করেছেন তেমনি মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডার মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন করেছেন। কারণ সকল ধর্মেই সমাজকল্যাণের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের "বদান্যতা" বৌদ্ধধর্মের "জীবপ্রেম" খ্রীষ্টধর্মে "মানবপ্রেম" এবং ইসলাম ধর্মের "জনসেবা" বিশ্বব্যাপী মানুষের কল্যাণ সাধনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সমাজকল্যাণের প্রতি তাগিদ দিয়ে ইসলামে বলা হয়েছে, "তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

মানবতার কল্যাণের জন্য। তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজে আদেশ করবে এবং অসঙ্গত কাজের নিষেধ করবে।" উপকারের প্রতিদান উপকারই হয়ে থাকে। তুমি পরোপকার কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক। তারা আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্থ, ইয়াতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমাদের আহার্য দান করি; আমরা আমাদের কাজ থেকে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও চাইনা।

মহানবী (স.) বলেন-"মানুষের জন্য তাই ভালবাসবে যা নিজের জন্য ভালবাস, তবেই মুমিন হবে।" যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করেনা, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" সেই লোকদের মধ্যে ভাল, যে লোকের উপকার করে।" পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তবে স্বর্গবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর দয়া করবেন। সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিজন, সৃষ্টির মধ্যে সেই আল্লাহর প্রিয়তম যে তাঁরএই পরিজনের সর্বাপেক্ষা উপকারক।

সুতরাং দেখা যায় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের স্পৃহা হৃদয়ে না থাকলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। তাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দরিদ্র, অভাবী, মজলুম, অসহায় ও বিপদগ্রস্থদের সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, মজলুমকে জালিমের অত্যাচার হতে রক্ষা করতে, অত্যাচারী শাসকের সামনে উচিত কথা বলতে। এসব কিছুই ইসলামে হুকুকুল ইবাদ নামে পরিচিত।

এসব ধর্মীয় আদর্শ, বাণী, প্রেরণা ও অন্তর্দৃষ্টি সমাজকল্যাণের দার্শনিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এছাড়াও ইসলামে সমাজকল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাকাত, বায়তুলমাল, ওয়াক্‌ফ, করযে হাসানা ও সদকায়ে জারিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রেরনাই এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ নিবাস ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সুতরাং আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে ইসলামের অবদান সর্বাধিক তাৎপর্যমন্ডিত। কেননা, ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়; একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাও বটে। সমগ্র মানবজাতির মুক্তির ও কল্যাণের বাণী নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজীবন এক অবিভাজ্য সত্তা। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি এতে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। এজন্য ইসলাম ইহকালীন ও পরকালীন উভয়বিধ উন্নতিতে বিশ্বাসী। পবিত্র কুরআনে মানুষকে উভয় জগতের উন্নতি ও কল্যাণসাধনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য বলা হয়েছে "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ইহজগত এবং পরবর্তী জগতে কল্যাণ দান কর।" অন্যত্র বলা হয়েছে -' তোমরা উপাসনা কর এবং পরে তোমাদের দৈনন্দিন কাজে বেরিয়ে পড়।" এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতের কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দেয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায় সৃষ্টি জীবের সেবা। মানুষের প্রতি রক্ত শোষণ এবং স্ত্রী পুত্রকে ভরন-পোষণ হতে বঞ্চিত রেখে কেবল 'আল্লাহ', "আল্লাহ" বললে মুক্তি হবেনা। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে পানি দান এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, পীড়িতকে সেবা শুশ্রুষা, এর ভিতর দিয়েই বিশ্ব প্রভুকে প্রকৃতভাবে সন্তুষ্ট করা যায়। কেননা, মানুষকে দু'টি চোখ অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি দেয়া হয়েছে, কথা বলার শক্তি দেয়া হয়েছে, শুভ-অশুভ দু'টি পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে করে সে দায়িত্বের কঠিন পথ পরিক্রমায় উত্তীর্ণ হয়। দায়িত্বের সে কঠিন পথ পরিক্রমা হচ্ছে দাসমুক্তকরণ, অভাব-অনটনে জর্জরিত নিরন্ন ও নিঃসহায়দের খাদ্য দান তথা অভাব দূরীকরণ এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং পরোপকারে ব্রতী হওয়া। যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে দূর্গত জরাজীর্ণ মানবতার সেবা করার, আর্তের প্রতি দয়া করার, দরিদ্র-পীড়িত, বন্যা কবলিত, প্রাকৃতিক দূর্যোগে পতিত দূর্দশাগ্রস্থ ইয়াতিম, মিসকীন, অনাথ ও বিপদগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করার তাগিদ করা হয়েছে।

মহানবী (স.) মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থার সূত্রাবদ্ধ এমন এক নীতি দর্শন ভিত্তিক জীবনাচরণের পরিমন্ডল গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে স্রষ্টা আল্লাহর আনুগত্যের ভেতর দিয়ে মানুষ ব্যক্তিগত দলগত ও সমাজবদ্ধ জীবনে পূর্ণতর ও সমৃদ্ধ জীবন লাভে সক্ষম হওয়ার সুযোগ পায়। জীবনের প্রথম লগ্নে একজন ইয়াতিম, নিরক্ষর ও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র হয়েও তিনি নিজ চরিত্রগুণে সকলের প্রিয়পাত্র হন এবং "হিলফুল ফুজুল" নামক সংস্থা গঠন করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যৌবনের প্রথম পর্যায়ে মক্কায় "হরবুল ফুজ্জার" বা অন্যায় যুদ্ধ নামক পাঁচ বছর ব্যাপী যুদ্ধজনিত বিভীষিকা ও সমকালীন সামাজিক অশান্তিদায়ক অবস্থা দেখে কতিপয় উৎসাহী যুবককে নিয়ে তিনি "হিলফুল ফুজুল" নামক একটি শান্তি সংঘ গঠন করেন। এ সংস্থাই বস্তুত তার জীবনের প্রথম প্রতিষ্ঠানিক সমাজ সেবার উদ্যোগ।

আর নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রতিকুল সামাজিক, রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝাময় জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে একটি বিশৃঙ্খল ও মানবিকতাবোধ বিবর্জিত জাতিকে সংঘবদ্ধ করেন, সুখী সমৃদ্ধ সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলেন এবং সামগ্রিক আদর্শ মানুষ হিসেবে সমাজকল্যাণকর জীবন লাভে সক্ষম করার প্রয়াস চালান আর তাঁর একাজে তিনি বিস্ময়করভাবে সফলতা অর্জন করেন। তিনি ঘোষণা করেন "মানব জাতির মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কমনা করেন। বক্তব্যটির গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা হল শুধু অপরের অধিকার সংরক্ষনই নয়; অধিকন্তু মঙ্গলসাধন করতে হবে। ইসলামের আদর্শের আলোকেই ৬২২ সালে স্বাধীনতা, সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে মদীনায় প্রতিষ্ঠায় হয় সত্যিকার অর্থে প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র, সেখানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা ছিল। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ সর্বযুগের মৌলিক অধিকারের প্রকৃষ্ট দলীল ও সর্বোত্তম দিক-নির্দেশনা। যার প্রথমে তিনি বলেছেন,"তোমাদের এই পবিত্র শহরে, এই পবিত্র মাসে, আজিকার দিনটি যেমন পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ, তোমাদের একের প্রাণ, ধনসম্পদ অপরের নিকট তদ্রুপ মর্যাদাপূর্ণ।

তদুপরি তিনি এ অধিকারগুলো শুধু তার জীবদ্দশায় সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা নয়; বরং তার অনুসারী ও ভক্তবৃন্দের জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করার আহবান জানিয়েছেন, কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁর অনুসারীরা তাদের জীবনে সেই মহামূল্য নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বায়তুলমালের মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণসাধন করে সমাজকল্যাণ তথা সামাজিক ন্যায়বিচারকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী অনুশাসন অনুসরণ করে খুলাফা এ রাশেদার যুগে আদর্শ রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাকে বিশ্বের প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগেও মুসলিম সাম্রজ্যে সমাজকল্যাণের একই ধারা অব্যাহত থাকে। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এক নবতর অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রকট বর্ণভেদ প্রথা, ব্রাহ্মন্যবাদ ও এর আক্রমনাত্মক প্রভাব প্রভৃতি কারণে বৌদ্ধ ও নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায় সিন্ধু আক্রমনকারী আরবদের (৭১২ খ্রী.) স্বাগত জানায় এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ ইসলামের সুমহান আদর্শ, সহজ-সরল রীতি-নীতি, সহিষ্ণুতা ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আরব বণিক, ধর্মপ্রচারক, পীর-দরবেশ, শাসকবর্গ প্রমুখ উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় সুদীর্ঘ ৮শ বছর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে। ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অনন্য আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্যের উদার বাণী, মানবতাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফলে দুঃস্থ, অসহায়, ইয়াতিম, বিধবা, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানে বেসরকারী পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়।

ধর্মপ্রচারক সুফী-সাধক ও দরবেশগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে খানকাহ্, দরগাহ বা আস্তানা নির্মাণ করেন এবং পাশেই মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, শিক্ষালয়, বিশ্রামাগার, লঙ্গরখানা, ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, বাসস্থান প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর; দীঘি, কূপ ও খাল খনন, বৃক্ষ রোপনসহ দরিদ্র ও নির্যাতিতদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। ইসলামী প্রথা ও প্রতিষ্ঠান যাকাত দান, সাদাকা, ফিতরা, ওয়াক্ফ, ওশর প্রভৃতিও এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

যুগ যুগান্তরে ঘটনা পরম্পরায় নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ইসলামে সমাজকল্যাণের এ ধারা ভারতীয় উপমহাদেশে আজও বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন এ উপমহাদেশের আলিম সমাজ। সমাজকল্যাণ ও মানবতার কল্যাণে তাদের অবদান সত্যই অনবদ্য। তাই বিষয়টিকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য এর বিষয়বস্তুকে মোট ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সমাজকল্যাণের স্বরূপ, পরিচিতি ও শিক্ষা ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামে সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশ ; তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতী উপমহাদেশে সমাজকল্যাণের বিকাশ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সমাজকল্যাণে উপমহাদেশের আলিমগণের অবদান (১৯০১–১৯৫০) পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : পৃষ্ঠা

সমাজকল্যাণের স্বরূপ, পরিচিতি ও শিক্ষা---------- (১-২১)

দ্বিতীয় অধ্যায়:

ইসলামে সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশ---------- (২২-৪০)

তৃতীয় অধ্যায়:

ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজকল্যাণের বিকাশ---------- (৪১-৫৭)

চতুর্থ অধ্যায়:

সমাজকল্যাণে ভারতীয় উপমহাদেশের আলিমগণের অবদান--------- (৫৮-১৯৯)

উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জী: ---------- (২০০-২০৫)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সমাজকল্যাণের স্বরূপ, পরিচিতি ও শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রাসঙ্গিক কথা ঃ

'সমাজ' ও 'কল্যাণ' এ দু'টো শব্দের সমন্বয়ে সমাজকল্যাণ প্রত্যয়টি গঠিত। এদু'টো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে সমাজকল্যাণের একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। সমাজ বলতে অনুভূতিক্ষম জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা তাদের একই মনোভাবের কথা জানে ও অনুভব করে এবং যে কারণে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমবেতভাবে কাজ করে থাকে। বস্তুতঃ সমাজে সমস্যা ও প্রয়োজন আছে আর সে সব সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজন পুরণে সমাজের মানুষ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে।[১]

আর 'কল্যাণ' একটি মানসিক ধারণা এবং তা পরিবর্তনীয় ও গতিশীল। স্থান, কাল, পাত্র শ্রেণীভেদে এ ধারণাটি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। মানুষের তৃপ্তি, সন্তুষ্টি ও সুখানুভূতির সাথে এটি সম্পর্কিত। মানুষের মানসিক বা মনোজগতের যে তৃপ্তি তা শুধুমাত্র বিশেষ দিক থেকে নয়, বরং সার্বিক দিক থেকে বিচার্য। সার্বিক তৃপ্তি বলতে মানুষের নৈতিক, সামাজিক, দৈহিক ও আর্থিক ইত্যাদি সামগ্রিক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এজন্য 'কল্যাণ' প্রত্যয়টি সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই বলা যায়, সমাজকল্যাণ হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও দৈহিক ইত্যাদি সামগ্রিক দিকের তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা বা কার্যক্রমের সমষ্টি। আর 'সমাজকল্যাণ' সমাজের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত একটি ধারণা। সমাজের ধারণা যেমন অতি প্রাচীন, তেমনি 'সমাজকল্যাণ' প্রত্যয়টিও সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট।

সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষ তার স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কারণেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। তবে মানুষের সমাজবদ্ধ হওয়ার পেছনে সামগ্রিকভাবে কল্যাণমূলক চিন্তাই মূলতঃ কাজ করেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে কিভাবে উন্নত পর্যায়ে জীবন-যাপন করা যায়, তারই অব্যাহত প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে সমাজ। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী বিকশিত হতে থাকে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ ইত্যাদি মানুষকে একে অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত করে। ধর্মীয় আদর্শ ও অনুপ্রেরণা মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টাকে আরও সুসংহত ও সুসংগঠিত করে।

কালের আবর্তনে মানব সমাজের সম্প্রসারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক পরিবর্তন, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে ব্যাপক, বহুমুখী ও জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এরই ফলশ্রুতিতে পরোপকার, দানশীলতা ও মানবতাবোধকে সুসংগঠিত করে সুপরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সামাজিক সমস্যার সমাধানে উদ্ভব ঘটে আধুনিক সমাজকল্যাণের। যা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত উপায়ে সমাজের সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত। এটি মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধান করে এমন এক বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ গঠন করতে চায়

Dhaka University Institutional Repository

যাতে সকল মানুষ সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় ও সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন যাপন করতে পারে। প্রত্যেক বিষয়েরই (Descipline) বহু ব্যবহৃত কিছু ধারণা বা প্রত্যয় (Conception) থাকে, যেগুলো ঐ বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সেগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ধারণা বা প্রত্যয় হচ্ছে এমন কিছু বিষয় বা উপাদান যে সম্পর্কে কল্পনা, অনুধাবন বা চিন্তা করা যায় (thing Concieved) । অর্থাৎ ধারণা বা প্রত্যয় হচ্ছে একটি বিমূর্ত অবস্থা বা উপাদান যা মানসিক অনুভূতি বা প্রত্যক্ষণ দিয়ে উপলব্ধি করা হয়। এটি কোন বাস্তব ঘটনা, বিষয়, ক্ষেত্র, দল বা শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা বা বর্ণনা। যেমনঃ সমাজ, মানুষ, গণতন্ত্র, ভালবাসা, উন্নয়ন ইত্যাদি।

একটি সমন্বয়ধর্মী অনুশীলনের বিজ্ঞান (Science of Practice) হিসেবে সমাজকল্যাণেরও বহু ধারণা বা প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ সমাজকল্যাণের উদ্ভব, বিকাশ, জ্ঞান ও দক্ষতা, মূল্যবোধ গঠন, পেশার মর্যাদায় উন্নয়ন এবং অনুশীলনে সহায়ক ধারণা বা প্রত্যয়গুলোকে সমাজকল্যাণ সংশ্লিষ্ট ধারণা প্রত্যয় বলে। যেমন- সমাজসেবা, সমাজকর্ম, সমাজসংস্কারক, সামাজিক আইন, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক নীতি, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি। সুতরাং সমাজকল্যাণকে সুগভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য এধারণাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। মূলতঃ মানুষের সামাজিক সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন করে একটি সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ কাঠামো গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য।

সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা ও পরিচিতিঃ

'সমাজকল্যাণ' মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ প্রচেষ্টারই সুসংবদ্ধ বহিঃপ্রকাশ। যুগ যুগ ধরে মানুষের কল্যাণে গৃহীত সেবামূলক প্রচেষ্টার সমষ্টিকেই সমাজকল্যাণ বলে। এটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি সাহায্যকারী পেশা, একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া ও একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। তাই সমাজকল্যাণের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সময়, কাল ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে বক্তব্য রেখেছেন। যেমন-সমাজকল্যাণ সম্পর্কে এলিজাবেথ উইকেনডেন (Elizabeth Wickenden) বলেন, Social welfare is a system of laws, programmes, benefits and services which strengthen or assure provisions for meeting social needs recognised as basic for the welfare of the population and for the functioning of the social order. the system is undergoing rapid transformation in response to the transiction of our society from scarcity to relative abundance and to the revolution of rising expectation.[২] (সমাজকল্যাণ হল এমন এক ধরণের কর্মসূচী, আইন, সুযোগ-সুবিধা ও সেবামূলক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজের স্বীকৃত মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়; যেগুলো সমাজের মানুষের কল্যাণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। এটি সমাজের অবস্থান্তর পর্যায়ে সৃষ্ট অপ্রতুলতা থেকে অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য এবং বর্ধিত বৈপ্লবিক প্রত্যাশা দ্রুত পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের এক রূপান্তরিত ব্যবস্থা।)

Dhaka University Institutional Repository

রোনাল্ড সি. ফেডেরিকো (Ronald C. Federico) বলেন, "সমাজকল্যাণ হল মানবিক প্রয়োজন পূরণকারী একটি প্রতিষ্ঠান। ..... নির্দিষ্ট সমাজ কাঠামোর সকল স্তরে আর্থিক ও সমাজসেবা কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক ক্রিয়ার উন্নয়ন এবং দূর্ভোগ হ্রাসের সমাজ স্বীকৃত ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে সমাজকল্যাণ বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।"[৩]

এইচ.এল. উইলেনস্কী এবং চার্লস এন. লেবো (H.L. Wilensky and Charles N Lebeaux) বলেছেন, Social Welfare is those formally organized and socially sponsored institutions, agencies and programes which function to maintain or improve the economic conditions, health and interpersonal competence of some parts or all of a population.[৪]

সমাজকর্ম বিশ্বকোষের সংজ্ঞা মতে, "স্বীকৃত সামাজিক সমস্যাদির সমাধান, প্রতিরোধ বা লাঘবের অথবা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠিত কার্যাবলীর সমষ্টিই সমাজকল্যাণ।" (The term social welfare denotes the full range of recognised activities of valuntary and governmental agencies, that seek to prevent, alleviate or contribute to solution of recognised social problems or to improve the well being of indeviduals, group, or communities.)[৫]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছে, Social welfare is a state of complete physical, mental and social well being and not merely the amelioration of specipic life. the enjoyment of the highest attainable standard of life is one of the foundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic and social condition. the welfare of all people is foundamental to the attainment of peace and security."[৬] (সমাজকল্যাণ বলতে শুধু নির্দিষ্ট জীবনের উন্নতিকে বুঝায় না, বরং সামগ্রিকভাবে দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গলজনক অবস্থাকেই বুঝায়। বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার নির্বিশেষে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জীবনমান লাভ করা প্রতিটি মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার। সকল মানুষের কল্যাণ সাধনই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের মূলভিত্তি।)

সমাজকল্যাণের বহুল পরিচিত সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক ওয়াল্টার আর্থার ফ্রিডল্যান্ডার। তিনি বলেছেন, "সমাজকল্যাণ হল সমাজসেবা ও প্রতিষ্ঠানের (সামাজিক) এমন এক পরিকল্পিত ও সংগঠিত পদ্ধতি যা ব্যক্তি এবং দলকে সন্তোষজনক স্বাস্থ্য ও জীবনমান লাভ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক অর্জনে সহায়তা করে। এটা তাদের পূর্ণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি লাভে সক্ষম করে তোলে।"(Social welfare is the organised syestem of social service and institutions designed aid indeviduals and groups to attain satisfying standard of life and health and

Dhaka University Institutional Repository

personal and social relationship which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.)[৭]

পর্যালোচিত সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমাজকল্যাণ সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের সকল সমস্যা দূর করে সমস্যামুক্ত সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সমাজকল্যাণ মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ, নিজস্ব সম্পদ, সামাজিক সম্পর্ক লাভ প্রভৃতির উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে থাকে। তাই বলা যায়, আধুনিক সমাজকল্যাণ এমন এক সংগঠিত প্রচেষ্টা যা সমাজ জীবন থেকে সকল ধরণের সামাজিক, ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা দূর করে মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন, নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং উন্নত সামাজিক সম্পর্ক ও জীবনমান লাভে সহায়তা করার মাধ্যমে এমন এক বাঞ্ছিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় সেখানে সবাই সুখ ও শান্তিতে বাস করতে পারে।

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য হল সাহায্য প্রার্থীকে তাদের মনোভাবও আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তনে সহায়তা করা। সাহায্য প্রার্থী বলতে ব্যক্তি, পরিবার, দল, সংগঠন, সমষ্টি প্রভৃতিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে তাদের পক্ষে সামাজিক কর্মকান্ড ও ভূমিকা পালন সহজতর হয়। সামাজিক কর্মকান্ড বা ভূমিকা পালনে যে সব সমস্যা রেয়েছে সেগুলো সমাধান করাও সমাজকল্যাণের লক্ষ্যভূক্ত।[৮]

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য প্রসঙ্গে চার্লস ডি. গারভিন বলেছেন-সমাজকর্ম, সামাজিক নীতি এবং সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে, সাংগঠনিকভাবে, সমষ্টিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে মানুষের জীবন মান উন্নত করা। "the goal of social work, social policy and social welfare is to improve the quality of life for persons, individually and in organizations, communities, and societies through social intervention."[৯]

জাতিসংঘের মতে, "Social welfare is an organization activities aimed at helping individuals or communities to meet their basis needs and at promoting their well-being in harmony with the interests of their families and communities." সমাজকল্যাণ এমন এক সংগঠিত কর্মপ্রচেষ্টা যার লক্ষ্য হল ব্যক্তি অথবা সমষ্টিকে তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করা এবং তাদের পরিবারও সমষ্টির প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতী রেখে কল্যাণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।[১০]

Charles Zastraw বলেছেন, "the objectives of social welfare is to meet the social, economical, health and recreational need of all men of the society." (সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হল সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত ও চিত্ত বিনোদনমূলক সকল প্রয়োজন পূরণ করা।)[১১]

Dhaka University Institutional Repository

Federico আমেরিকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণের সুস্পষ্ট ও সুপ্ত দু'রকম উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলঃ

* জনগণের ভূমিকাকে অধিকতর কার্যকর করতে সহায়তা দান,
* জীবনের লক্ষ্য অর্জনে জনগণকে সহায়তা করা
* ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা এবং
* সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে তোলা

সুপ্ত উদ্দেশ্যগুলো হল ঃ

* ন্যূনতম পর্যায়ে নির্ভরশীল হতে পারে এমন সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করে জনগণের (বিশেষ করে গরীব ও সংখ্যালঘুদের) আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা
* মুক্ত বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতী রেখে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা,
* সেবা কার্যক্রমের মাঝে ক্ষমতা ও পছন্দ নির্দিষ্ট করে পেশাগত স্বায়ত্বশাসন রক্ষা করা।[১২]

মোহাম্মদ আলী আকবর ও সৈয়দ আহম্মদ খান স্বাধীনতাউত্তর পর্যায়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণের কতিপয় লক্ষ্য উল্লেখ করেন। যেমন-

* জনগণের জীবনমানের প্রগতিশীল উন্নয়ন
* সামাজিক পরিবর্তন সাধন ও সামঞ্জস্য স্থাপনে জনগণকে শিক্ষা দান
* জনসমষ্টি সম্পদের সংগঠন ও কাজে লাগানো এবং
* শোষিত মানুষের কল্যাণ সাধন ও সংরক্ষণ এবং জনসমষ্টির দায়িত্বের আওতাভূক্ত হিসেবে বিবেচিতদের প্রতি যত্নবান হওয়া।[১৩]

সমাজকল্যাণের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

*** সকল মানুষের কল্যাণ ঃ**

সমাজকল্যাণ সমাজ জীবনের অন্তর্গত সকল মানুষেরই কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। সমাজকল্যাণের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, বয়স-লিঙ্গ-শ্রেণী, সাদা-কালো যাই মানুষের অবস্থান হউক না কেন সবাই সমান। মানুষের চাহিদা যাই হোক না কেন, সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতায় সকলেই অন্তর্ভূক্ত। সেজন্য সমাজকল্যাণ সম্পর্কে অর্ধশতাব্দী পূর্বে বলা হয়েছিল যে, এটি সকল মানুষের জন্য সকল মানুষের সংগঠিত তৎরপতা। Charles Zastraow এর ভাষায়, "the goal of social welfare is to fulfill the social, financial, health and recreational needs of every one in a society."[১৪]

সমাজকল্যাণের ব্যাপক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে W.A. Friedlander বলেছেন, "the objective of social welfare is to secure for each human being the economic necessities, decent standard of health and living conditions, equal opportunities

Dhaka University Institutional Repository

with his fellow citizens and the highest possible degree of self-respect and freedom of thought and action without interfering with the same rights of others."[১৫]

মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণে সহায়তাকরণঃ

মানুষের মৌলিক চাহিদা (Need) পুরণ করা সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। স্থান, কাল, পাত্রভেদে চাহিদার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে মৌলিক প্রয়োজনগুলোর ভিন্নতা দেখা দেয়।

আধুনিক সমাজকল্যাণ সব অবস্থায় মানুষের (ব্যক্তি, দল, সমষ্টির) কল্যাণে নিয়োজিত। প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন (need) নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার (Situation) উপর। সুতরাং সেবা তখনই সম্ভব, প্রকৃত অর্থে ব্যক্তির (individual) অনুভূত চাহিদা (felt need) কি? তার উপর।

Luise C. Johnson and Charles L. Sehwartz-এর মতে মানবীয় চাহিদা হলঃ

1. Sufficient food, clothing and shelter for physical survival;
2. A safe environment and adequate health care for protection from and treatment for illness and accidents.
3. Relationships with other people that provide a sense of being cared for, of being loved and of belonging.
4. Opportunities for emotional, intellectual and spiritual growth and development, including the opportunity for individuals to make use of their innate talents and interests
5. Opportunities for participation in making decisions about the common life of one's own society, including the ability to make appropriate contributions to the maintenance of life together.[১৬]

সমাজকল্যাণ মানবীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি সুসংগঠিত তৎপরতা। Friedlander 1955, Wilnesky and lebeavx 1958, Wickenden 1965, Barker 1995 এবং Macarov 1995 সকলেই সমাজকল্যাণের চিন্তায় মানবীক চাহিদা পূরণ এর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। R.E.Goodin তাঁর এক গবেষণামূলক লেখায় এরও পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, সকল সমাজে সমাজকল্যাণ অভাবের বদলে চাহিদা পূরণের সাথে জড়িত এবং প্রায় সকল সমাজে সমাজকল্যাণ কর্মসূচীসমূহ চাহিদা পূরণকারী হিসেবে নিজেদের নির্দিষ্ট করেছে। Charles D. Garvin বলেছেন, "Social welfare is the pattern of ways that society organizes to provide for its members basis needst food, clothing shelter and personal care"[১৭]

জাতিসংঘ-এর মতে, "In Social welfare includes organized activities aimed at helping individuals or communities to meet their basic needs and to promote their well-being in harmony with the interests of their families and communities."[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

*** সমাজবাসীর সামগ্রিক মঙ্গল বিধানঃ**

মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে কোন এক বিশেষ দিক নিয়ে সমাজকল্যাণ কাজ করে না, সমাজকল্যাণ মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ বিধানে নিয়োজিত। সমাজকল্যাণ তৎপরতা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনঃস্তাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্যগত ইত্যাদি সকল দিকের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। আবার মানব জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা যেমনঃ দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা এবং অপরাধ ও কিশোর অপরাধ ইত্যাদি সমাধানে কাজ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organization) ব্যাখ্যা হল "Social welfare is a state of complex and not merely the amelioration of special life. the enjoyment of the highest attainable standard of life is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic and social condition. the welfare of all people is fundamental to the attainment of peace and security." (সমাজকল্যাণ বলতে শুধু নির্দিষ্ট জীবনের অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থা বুঝায় না, বরং সামগ্রিক দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গলজনক অবস্থাকে বোঝায়। ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক বিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জীবন মান লাভ করা অন্যতম মৌল অধিকার। আর সকল মানুষের কল্যাণ সাধন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের মূল ভিত্তি।[১৯]

বিশেষ শ্রেণীর দরিদ্র ও দুঃস্থদের সাহায্য প্রদানঃ

প্রত্যেকটি সমাজেই বিশেষ শ্রেণীর দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী থাকে, যারা নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা নিজ পরিবারের মাধ্যমে মৌল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। এ সমস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকারী-বেসারকারী সংগঠন বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের দুঃস্থ, দরিদ্র শ্রেণীর মৌল চাহিদা পূরণ করা। Robert Morris সমাজকল্যাণের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "Social welfare is ..... the sum of those efforts by governments and other organization to relieve the poverty or distrees of a people who are more or less helpless, that is unable to meet their basic needs by their own labour or by their families."[২০] সমাজকল্যাণ হল সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত যে সব কার্যক্রম যে গুলো দারিদ্র ও দুঃস্থবস্থা হ্রাসে মানুষকে সাহায্য করে। যে অবস্থা সংশ্লিষ্টদের শ্রম দ্বারা অথবা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা মৌল চাহিদা পূরণে অক্ষম করে তোলে।

সামাজিক ভূমিকা পালনে সাহায্য করাঃ

সমাজকল্যাণ পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশে মানুষ যাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সাহায্য করে থাকে। Federico-এর ভাষায়, সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হল সামাজিক পরিবেশে কার্যকর ভূমিকা পালনে মানুষকে সাহায্য করা, এর অর্থ সমাজকল্যাণ শুধু বেঁচে থাকার জন্য মৌল চাহিদাগুলো পূরণে মানুষকে সাহায্য করে না, বরং মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় সব চাহিদা পূরণে মানুষকে সাহায্য করে। যাতে মানুষ পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নিজস্ব সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।[২১]

ব্যক্তি ও পরিবেশের উন্নয়নঃ

ব্যক্তি ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মিথস্ক্রিয়া সমাজকল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজকল্যাণে ব্যক্তি এবং পরিবেশের কার্যকর মিথস্ক্রিয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়, যাতে মানুষ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়। সমাজকল্যাণে বিশ্বাস করা হয় Men is the by product of his environment মানুষ যে পরিবেশে বড় হয় সেই পরিবেশের প্রভাব তার ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। পরিবেশ যদি ব্যক্তির জীবনে অনুকূলে হয় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ইতিবাচক হবে এবং পরিবেশ যদি ব্যক্তির জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নেতিবাচক হবে। পাশাপাশি পরিবেশ যাতে সমাজকল্যাণ উপযোগী হয় সেই দিক নিয়েও সমাজকল্যাণ কাজ করে থাকে। সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও পরিবেশের যুগপৎ উন্নয়ন, যাতে ব্যক্তি হিসেবে এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়নে ও শক্তিশালী করণে মানুষকে সাহায্য করা সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যার্জনের জন্য সমাজকল্যাণে ব্যক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সামাজিক সমস্যা সমাধানঃ

সমাজকল্যাণের বিকাশধারা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এটি শুধু মানবীয় চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়েই উদ্ভব ও বিকশিত হয় নি। পরিবর্তনশীল সমাজে স্বীকৃত সামাজিক সমস্যার সমাধান, প্রতিরোধ দূরীকরণের লক্ষ্যেও গঠিত ও পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান সমাজকল্যাণ Caring, curing Preventive ধারায় কাজ করে যাচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

সমাজকল্যাণ বিশ্বাস করে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সুপ্ত ক্ষমতা (Dorment potenalities) রয়েছে। যদি এই সুপ্ত ক্ষমতা বিকশিত করা যায়, তাহলে ব্যক্তি (client) নিজেই নিজের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে এবং নিজস্ব প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান করতে পারবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ, পরামর্শ দান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে সমাজকল্যাণ। সামাজিক ভাবে উৎপাদনশীল (Social productive) হতে মানুষকে সাহায্য করে, যাতে সে নিজের ও সমাজের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। Ronald C. Federico-এর ভাষায়, "Social welfare's task is to help people function more effectively so that they become productive members of society."[২২]

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক পরিবর্তন সাধনঃ

সমাজকল্যাণ শুধু সমস্যার প্রতিকার নিয়ে ব্যাপৃত নয়, বরং যে সব অবস্থা সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী, যে সব অবস্থার পরিকল্পিত পরিবর্তনে সাহায্য করে সমাজকল্যাণ। সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হল পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজে প্রত্যাশিত পরিবর্তন সাধনে প্রচেষ্টা চালানো। সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের প্রতিরোধ এবং প্রত্যাশিত পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টিতে মানুষকে সাহায্য করে, যে পরিবর্তন মানুষের সার্বিক জীবন মানোন্নয়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও জোরদার করে, সে ধরনের পরিবর্তনকে সমাজকল্যাণ উৎসাহিত করে।

সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়নঃ

সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রভাবে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা মানুষের সংহতি বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক সহযোগীতা, সহানুভূতি ও সমানুভূতির অভাবে সামাজিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। এমতাবস্থায় সমাজকল্যাণ সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। R.M.titmus -এর মতে, " সমাজকল্যাণের বিবেচ্য বিষয় হল সমাজে মানুষের সুশৃঙ্খল ও যথাযথ সম্পর্ক (Right order of relationship in society) প্রতিষ্ঠা।[২৩]

সামাজিক নিয়ন্ত্রণঃ

সমাজকল্যাণের বিশেষ লক্ষ্য হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ Gambrill-এর মতে, ঐতিহাসিক ও পরিপ্রেক্ষিতগত দিক থেকে সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ তিনটি মূখ্য কাজের সাথে জড়িত। তা হলঃ মনস্তাত্ত্বিক ও বস্তুগত চাহিদা থেকে পরিত্রান দেয়া, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজসংস্কার। এগুলোর মধ্যে তিনি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে Maintaining Social order, and descipline, regulating the labour market ইত্যাদির কথা বলেছেন।[২৪] সমাজের নিয়ন্ত্রণ রক্ষার্থে সমাজে এমন মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের অস্বাভাবিকতার কারণে সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি হুমকির সৃষ্টি করে।

সমাজের নিম্ন ও নির্যাতিত শ্রেণীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার সংরক্ষণঃ

সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল সমাজের নিম্ন ও নির্যাতিত শ্রেণীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ। সমাজের পশ্চাৎপদ ও নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে তাদের কারিগরী দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা বেসরকারীভাবে পরিচালিত-'ইউসেপ' বাংলাদেশের কথা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি। 'ইউসেপ' সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা প্রদান করে তাকে। শুধু তাই নয় ছেলে-মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার পর চাকুরীর মাধ্যমে পুনর্বাসন করে থাকে। সমাজকল্যাণের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হল দরিদ্র, অসহায়, ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীকে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করা।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিকীকরণের সাহায্য করাঃ

সমাজকল্যাণ মানব কল্যাণে সামাজিকীকরণের (Socialization) ভূমিকাকে সুসংহত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বৃহৎ সমাজের আদর্শ, মূল্যবোধ, নিয়মনীতি, বিধিবিধান আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া হল সামাজিকীকরণ। সমাজকল্যাণ মানুষের সাথে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক (inter personal relationship) তৈরিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। আন্তঃসম্পর্ক হচ্ছে, (বাবা-মা)-এর সাথে সন্তান এর সম্পর্ক, ভাই-বোনের সাথে ভাই-বোনের সম্পর্ক। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ইতিবাচক হবে আর সম্পর্ক যদি স্বাভাবিক না হয় তা হলে ব্যক্তির সামাজিকীকরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে সামাজিকীকরণে সাহায্য করা। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ জীবনের একটি নির্দিষ্ট ছকে জীবন যাপন করে থাকে। সুতরাং প্রতিটি মানুষ যাতে সুষ্ঠু সামাজিক জীবন লাভ করতে পারে সেজন্য সমাজকল্যাণ সামাজিকীকরণে সাহায্য করে থাকে।

সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বন্টনঃ

সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমাজকল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। C.Murray সমাজকল্যাণ পরিভাষাটি সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বন্টনের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, "Social welfare as .....the system of distributing valued resources, such as money, jobs, housing and educational health and social services." (সমাজকল্যাণ সমাজের মূল্যবান সম্পদ যেমন- অর্থ, কর্মসংস্থান, গৃহায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজসেবার মতো মূল্যবান সম্পদ বন্টনের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাই সমাজকল্যাণ)[২৫]

জনগণকে সমস্যা মুকাবিলা ও সমৃদ্ধি অর্জনে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাঃ

সমাজকল্যাণ একটি সুসংগঠিত সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মানুষের সমস্যার প্রকৃতি, বা আঙ্গিক যাই হউক না কেন, সমাজকল্যাণ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে সাহায্য করে থাকে যাতে সে তার সমস্যা নিজেই বুঝতে পারে এবং নিজস্ব প্রচেষ্টায় সমাধান করতে পারে। সমাজকল্যাণ ব্যক্তিকে তার সুপ্ত ক্ষমতার (dorment potentialities) বিকাশে সহযোগিতা করে থাকে। W.A. Friendlander -এর মতে "Social welfare is the organized system cf social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health and personal and social relationship that permit them to develop their full-capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of thir families and the community" অর্থাৎ সমাজকল্যাণ হল সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমাজসেবা প্রদানের সুসংগঠিত কর্মপদ্ধতি যার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও দলকে সন্তোষজনক জীবনমান ও স্বাস্থ্যগত উন্নয়নে সহায়তা করা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করে তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ সাধন করা এবং পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে তাদের কল্যাণের পথ সহজতর করা।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, সমাজকল্যাণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক। সমাজ জীবন যত গতিশীল এবং পরিবর্তিত হচ্ছে পাশাপাশি সমাজকল্যাণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ততদূরই বিস্তৃত হচ্ছে। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায়, সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা হল এমন একটি হাতিয়ার, যা মানবকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনে সমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। Charles Zastrow বলেছেন, "the purpose of social welfare institutions are to prevent alleviate or contribute to the solution of recognized social problems so as to improve the well-being of individuals, groups and communities directly. অর্থাৎ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল স্বীকৃত সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ, বিমোচন বা সমাধানে অবদান রাখা, যাতে ব্যক্তি, দল এবং সমষ্টির কল্যাণ প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধি পায়।[২৭]

সমাজকল্যাণের পরিধি

সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমাজকল্যাণের পরিধি বলতে এর জ্ঞানের প্রায়োগিক দিককে বুঝানো হয়ে থাকে। অন্যকথায়, সমাজকল্যাণের জ্ঞান বা বিষয়বস্তুর প্রয়োগের সীমাই হল এর পরিধি। তবে কোন দেশের স্বীকৃত সামাজিক সমস্যা, জনগণের অপূরিত চাহিদার ধরন এবং যেগুলো মুকাবিলার চেষ্টা, দেশের প্রচলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক দর্শন এবং প্রশাসনিক কাঠামো সে দেশের সমাজকল্যাণের পরিধির ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেয়। বর্তমানে সমাজকল্যাণের পরিধি অনেক ব্যাপক। এর ব্যাপক পরিসরের মধ্যে সমাজের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে গৃহীত সকল প্রকার কার্যাবলীকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[২৮]

আধুনিক সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আনয়নে মানুষকে সাহায্য করা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে গৃহীত সকল প্রচেষ্টায় সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধির্ভূক্ত। সমাজের কোন বিশেষ দিকে এর পরিধি সীমিত নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠিত সেবাকর্ম যেমন সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধির অন্তর্ভূক্ত; তেমনি মানবিক ও ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর বিচ্ছিন্ন সেবাকর্মও সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধির আওতাভুক্ত। এলিজাবেথ উইকেনডেন সমাজকল্যাণের পরিধি প্রসঙ্গে বলেন, "সমাজকল্যাণের অন্তর্ভূক্ত হল যেসব আইন, কর্মসূচী সুযোগ-সুবিধা ও সেবামূলক কার্যক্রম যেগুলো জনগণের জন্য স্বীকৃত মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণের নিশ্চয়তা বিধান বা জোরদার ও উত্তম সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত।"[২৯]

মিনাহান (Minahan) সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(১) মানুষের সক্ষমতা ও সমস্যা-সমাধানে যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা সমাজকল্যাণের পরিধিভূক্ত।

(২) সম্পদ অর্জনে মানুষকে সহায়তা করা

(৩) মানুষের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে সংগঠন গড়ে তোলা

(৪) সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করণে সহায়তা করা

Dhaka University Institutional Repository

(৫) সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করা

(৬) সামাজিক ও পরিবেশগত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা।[১]

মানব জীবন একটি অবিচ্ছেদ্য সত্তা। এর বিভিন্ন দিক যথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর যে কোন একদিকে অসুবিধা দেখা দিলে সমগ্র মানুষটিই অসুখী হয়ে পড়ে এবং তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। যার প্রতিফলন ঘটে সমাজ জীবনেও। একই কারণে মানব জীবনের কোন একটি দিককে বাদ দিয়ে কিংবা উপেক্ষা করে অন্যদিকের উন্নতি বা অন্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই সমাজকল্যাণ সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধানে পরিচালিত। তাই বৃহত্তর দৃষ্টিতে সকল সামাজিক সমস্যা মুকাবিলার সকল কর্মতৎপরতা এর আওতাভূক্ত। সমাজ জীবনে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক অনেক সমস্যা রয়েছে।

এ পর্যায়ে বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বেকারত্ব, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা, ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি, পঙ্গুত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। এসব সমস্যা পরস্পর গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির প্রতি গুরুত্ব দিলে সমস্যার সার্থক মুকাবিলা সম্ভব নয় এবং সমাজের সার্বিক মঙ্গল নিশ্চিত করা যায় না। সে জন্য সমাজকল্যাণ সমাজ জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর করে সমাজের সার্বিক অবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট।[৩০] তাই আর.এ. স্কীডমোর এবং এম.জি. থ্যাকারী (R.A. Skidmore and M.G. thackery) বলেন, "বৃহৎ দৃষ্টিকোণ হতে সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক চাহিদা পূরণ এবং কল্যাণ সাধনই সমাজকল্যাণের পরিধিভূক্ত।"[৩১]

এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের রির্পোটে বলা হয়েছে, "Social welfare includes those organized, activities, aimed at helping individuals or communities to meet their basic need and promoting their well being in harmony with the interests of their families and communities."[৩২]

সমাজকল্যাণ কার্যক্রম মূলতঃ তিন প্রকারের। যেমন প্রতিকারমূলক, প্রতিরোধমূলক ও উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরেই কোন না কোন ধরনের সমস্যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাবলী প্রতিকারমূলক সমাজকল্যাণের (Curative aspect of social welfare) পরিধিভূক্ত। প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পঙ্গু পুনর্বাসন, ভিক্ষুক পূর্নবাসন, অপরাধ সংশোধন, চিকিৎসা সমাজকর্ম ইত্যাদি কার্যক্রম। এছাড়া দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যা মুকাবিলা করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম প্রতিকারমূলক সমাজকল্যাণের পরিধিভূক্ত।[৩৩]

সামাজিক সমস্যার মূল উৎস হল সমাজ। সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতির সামঞ্জস্যহীনতা এবং অবক্ষয় হতেই সৃষ্টি হয় সামাজিক সমস্যা। সমস্যা সৃষ্টির উৎস এবং

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয় বোধ করে সম্ভাব্য ভবিষ্যত বিপর্যয়ের মুকাবিলা করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যাবলী প্রতিরোধমূলক সমাজকল্যাণের (Preventive aspects of social welfare) পরিধিভূক্ত। প্রতিরোধমূলক সমাজকল্যাণের মধ্যে রয়েছে সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম, গ্রামীণ সমাজসেবা, পরিবার ও শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ, দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, প্রতিবন্ধিদের প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রম ইত্যাদি। অন্যদিকে যেসব গঠনমূলক ও পরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সাধনের দ্বারা সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয় সেসব কার্যাবলী উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণের (Preventive aspect of social welfare) পরিধিভূক্ত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলী উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণের অন্তর্ভূক্ত। মানব সম্পদ উন্নয়ন সামাজিক নিরাপত্তা, ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠানের বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন, সমাজকল্যাণ কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন, শহর সমষ্টি উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধিভূক্ত।[৩৪]

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কোন সমস্যা সাধারণত ব্যক্তিগত, দলীয় এবং সামাজিক পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে। বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাধানের লক্ষ্যে একই সাথে তিনটি পর্যায়েই পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য। তিনটি পর্যায় থেকে সমস্যা মুকাবিলা করার জন্য সমাজকল্যাণের নিজস্ব তিনটি মৌলিক পদ্ধতি রয়েছে। যেমনঃ ব্যক্তি সমাজকর্ম (Social case work), দল সমাজকর্ম (Social group work) এবং সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন (Community organization and development) । এ সকল পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য আবার তিনটি সাহায্যকারী পদ্ধতি রয়েছে। যেমনঃ সামাজিক গবেষণা (Social research); সামাজিক প্রশাসন (Social administration) এবং সামাজিক কার্যক্রম (Social action)। ইদানীংকালে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সকল পদ্ধতির মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমন্বিত পদ্ধতি (Integrated method) নামে একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজকল্যাণ নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার সকল পর্যায় যেমন-ব্যক্তিগত, দলীয় এবং সামাজিক পর্যায় থেকে সমস্যা মুকাবিলা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।[৩৫] এ মৌলিক ও সাহায্যকারী ছয়টি পদ্ধতিই আধুনিক সমাজকল্যাণের আওতাভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আধুনিক সমাজকল্যাণের দু'টি প্রধান শাখার একটি হচ্ছে পেশাদার সমাজকর্ম এবং অপরটি হচ্ছে অপেশাদার সমাজকর্ম। জনগণের কল্যাণে উভয়ে একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সকল সরকারী এবং বেসরকারী সমাজকল্যাণ কার্যক্রম (স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক) বৃহত্তর পরিসরে সমাজকল্যাণের আওতায় আসে। তাছাড়া কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা প্রসারের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন ও শিক্ষা ইত্যাদিতেও সমাজকল্যাণের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজকল্যাণের পরিধি ও ক্ষেত্রও পরিবর্তনশীল। সমাজ ব্যবস্থা এবং সামাজিক সমস্যার জটিলতার প্রেক্ষাপটে আধুনিক বিশ্বে সমাজকল্যাণের পরিধি ও ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশেষ করে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে জনকল্যাণকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নেয়ায় সমাজকল্যাণের পরিধিও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু

সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু বলতে যে তাত্ত্বিক বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজকল্যাণ একটি সামাজিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে। আধুনিক সমাজকল্যাণ হল একটি সমন্বয়ধর্মী সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজকল্যাণের তাত্ত্বিক আলোচনা সমৃদ্ধ নিজস্ব জ্ঞানভান্ডার রয়েছে। যা সমাজস্থ মানুষের সার্বিক সমস্যা ও সমাধানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সমাজের মানুষের সার্বিক সমস্যা ও সমাধানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সমাজের মানুষের সমস্যা ও সমাধানকে কেন্দ্র করে সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু আবর্তিত। সমাজের মানুষের সমস্যা, পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হতে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানে সমাজকল্যাণে আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি (Inter disciplinary approach) প্রয়োগ বলা হয়। ফলে সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। মোটামুটিভাবে সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তুকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(১) মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান

(২) বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবার কর্মসূচীর পর্যালোচনা

(৩) ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে কাজ করার দক্ষতা এবং

(৪) জ্ঞানের প্রয়োগ ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বাস্তবক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ।[৩৬]

মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান ঃ

মানুষ এবং সমাজকে ঘিরে সমাজকল্যাণ আবর্তিত। সেজন্য মানুষ ও তাদের সামাজিক আচরণ, সমস্যা প্রভৃতি দিক এর বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত। ব্যক্তি, দল, পরিবার, জনসমষ্টি, সম্পদ, সামাজিকীকরণ, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক নীতি, সামাজিক আইন, সামাজিক শৃঙ্খলা, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া, সংস্কৃতি প্রভৃতি সমাজকল্যাণের আলোচনার বিষয়বস্তু। সমাজকল্যাণ সমাজবিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃ-তত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, আইন, মনোচিকিৎসা প্রভৃতি বিজ্ঞান থেকে আহরিত জ্ঞান সমন্বয়ের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছে। তাই ফ্রীডল্যান্ডার বলেছেন, "Social work draws scientific knowledge and insight from several discipline-sociology, economics, political science, phychology, psyciatry, anthropology, biology, history, law, education and philosophy but it has synthesized them into a unique science."[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তুতে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে-দারিদ্র্য, জনসংখ্যাস্ফীত, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, যুব অসন্তোষ, নারী নির্যাতন, পতিতাবৃত্তি, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান ভিত্তিক আলোচনাও সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য। সমাজের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তিতে মানব আচরণ এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। সেজন্য সমাজকল্যাণ মানব আচার-আচরণ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অনুভূতি, আবেগ, আত্মরক্ষামূলক কৌশল, দৈহিক ও মানসিক বিকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে।[৩৮]

বিভিন্ন ধরণের সমাজসেবা কর্মসূচীর পর্যালোচনাঃ

অতীতে যেমন সমস্যা ছিল বর্তমানেও তেমনি সমস্যা রয়েছে। তবে কালের বিবর্তনে সমস্যা যেমন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে তেমনি সমাধান প্রক্রিয়াও যুগোপযোগীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাক-শিল্পযুগে মহানুভবতা, দানশীলতা, ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় মানুষ সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করত। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী যুগে সমস্যা সমাধানের গতানুগতিক ধারণায় পরিবর্তন ঘটে এবং সমাজকল্যাণের নতুন তথা আধুনিক দর্শনের জন্ম হয়। ফলে সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিবর্তন, আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব একটি অন্যতম বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত। প্রাক্-শিল্প যুগের সমাজকল্যাণ আধুনিক সমাজকল্যাণের, দর্শন, বিভিন্ন ধর্মের সামাজিক মূল্যবোধ, শিল্পায়ন ও শহরায়ন, সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্কারকদের অবদান প্রভৃতি এর বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।[৩৯]

এছাড়া সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সমাজসেবা কর্মসূচী যেমন- গ্রামীণ ও শহর সমাজসেবা কর্মসূচী, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, নারী কল্যাণ, বৃদ্ধ কল্যাণ, পরিবার কল্যাণ, পল্লী উন্নয়ন, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী হাসপাতাল সমাজসেবা, মনোচিকিৎসা সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রম সবকিছুই সমাজকল্যাণের আলোচনার বিষয়বস্তু।

ব্যক্তি, দল ও জনসমষ্টির সাথে কাজ করার দক্ষতাঃ

এ দক্ষতা অর্জনের পূর্ব শর্ত হল তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন। সে লক্ষ্যে সমাজকল্যাণের কতিপয় নীতি, মূল্যবোধ, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির জটিল সমস্যাসমূহ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাধান দেয়া সম্ভব হয়। ফলে সমাজকল্যাণের যেসব নীতি, মূল্যবোধ, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দলের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্ম, সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমষ্টি এবং গঠন ও উন্নয়ন এবং আরও তিনটি সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা, সমাজকর্ম প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতিসমূহের আলোচনা সমাজকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানের প্রয়োজন ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণঃ

সমাজকল্যাণের জ্ঞান যেমনি এর বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত তেমনি সে জ্ঞান প্রয়োগ করে-কিভাবে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য মনোভাব সৃষ্টি ও কৌশল প্রয়োগের জন্য তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান এর বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে বিবেচিত।[৪১]

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক সমাজকল্যাণ হল একটি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার নাম। যে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার আলোকে মানব সমাজের সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণই সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তুর পরিধিভূক্ত। যেহেতু সমাজকল্যাণের লক্ষ্য সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আনয়ন; সেহেতু সমাজের সার্বিক দিকই এর বৃহত্তর পরিধিভুক্ত। বর্তমান সমস্যার সমাধান, ভবিষ্যত সমস্যার প্রতিরোধ এবং সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে সামাজিক কাঠামো, সামাজিক সমস্যার সামগ্রিক দিক, সমাজসেবার ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং সমাজসেবা কার্যক্রমের বর্তমান ধারা ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজকল্যাণে আলোচনা করা হয়। বাস্তবায়িত প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাদার সমাজকর্ম যেমন এর পরিধিভূক্ত ; তেমনি মানবিক ও ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তিগত সেবাকর্ম ও সমাজকল্যাণের আওতাভূক্ত। সমাজকল্যাণের সাহায্য প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে সমাজকর্ম। সমাজকর্মের মৌল ও সহায়ক পদ্ধতিগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য সমাজস্থ মানুষের মানসিক গঠন, বিকাশ ও সামাজিক দল ও সমষ্টিগত আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে হয়।

সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক সমাজকল্যাণের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেগুলো সনাতন সমাজকল্যাণের ধারা হতে একে পৃথক সত্তা দান করে। ধর্মীয় অনুভূতি এবং মানবিকতাবোধে অনুপ্রাণীত সমাজসেবা কার্যক্রমের মধ্যে আধুনিক সমাজকল্যাণের পরিধি সীমিত নয়। সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে আধুনিক সমাজকল্যাণের স্বীকৃত। বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল-

সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত সাহায্যদান প্রক্রিয়াঃ

সমাজকল্যাণের প্রতিটি সংজ্ঞাতেই সমাজকল্যাণকে সুসংগঠিত সাহায্য পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ আধুনিক সমাজকল্যাণের সংগঠিত দিকটিই একে সনাতন সমাজ সেবা প্রক্রিয়া হতে পৃথক সত্তা দান করেছে। সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির জনগণকে তাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তাদানই সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষমকারী প্রক্রিয়াঃ

আধুনিক সমাজকল্যাণ মানুষের পক্ষে কাজ করে না। এটি মানুষের জন্য কাজ করে। সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশ এবং আওতাধীন সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে মানুষকে সক্ষম করে তোলাই আধুনিক সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য। যাতে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে সক্ষম হয়।[৪২]

সব শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপঃ

আধুনিক সমাজকল্যাণ ব্যক্তি, দল বা শ্রেণী বিশেষের কল্যাণে নিয়োজিত নয়। সকল স্তরের মানুষের সমস্যার প্রতি এতে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজকল্যাণে বিশ্বাস করা হয়, সমাজের এক শ্রেণীর সমস্যাকে উপেক্ষা করে অন্য শ্রেণীর কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সামগ্রিক সমাজকল্যাণ আশা করা যায় না। এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণী হতে অধিক গুরুত্ব প্রদান আধুনিক সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।

সামগ্রিক সমাজকল্যাণঃ

সমাজ হচ্ছে একটি অখন্ড যৌগিক একক সত্তা। এর বিভিন্ন দিক অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। আধুনিক সমাজকল্যাণ সমাজ জীবনের সার্বিক কল্যাণে বিশ্বাসী। সমাজের সব দিকের ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন এবং কল্যাণের মাধ্যমেই সামগ্রিক সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, উইলেনস্কি, লেবো, ফ্রিডল্যান্ডার প্রমুখ মণীষীদের সংজ্ঞায় সমাজকল্যাণের এ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষের দৈহিক, মানসিক,নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, সবদিকের ভারসাম্যমূলক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা আধুনিক সমাজকল্যাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৪৩]

সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টাঃ

আধুনিক সমাজকল্যাণে বিশ্বাস করা হয় যে, প্রাক্-শিল্প যুগের ন্যায় স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমান শিল্প সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণ আনয়নে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরণের প্রচেষ্টার প্রতি সমাজকল্যাণ সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে "সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সমন্বিত রূপটি হচ্ছে আধুনিক সমাজকল্যাণ।"এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যল ওয়ার্ক গ্রন্থের সংজ্ঞায় সমাজকল্যাণের এ বৈশিষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৪৪]

স্বাবলম্বন নীতির উপর পরিচালিতঃ

সমাজকল্যাণে স্বাবলম্বন নীতিতে বিশ্বাসী এবং স্বাবলম্বন নীতির উপর ভিত্তি করে এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত। এতে বিশ্বাস করা হয় যে, বাহ্যিক সাহায্যের মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির নিজস্ব সম্পদ এবং সামর্থের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ সমাজকল্যাণে গ্রহণ করা হয়। স্বাবলম্বন অর্জনে সহায়তা দানই সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য। মণীষী ফ্রিডল্যান্ডারের সংজ্ঞায় সমাজকল্যাণের এ বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বহুমুখী ও গতিশীল সাহায্যদান প্রক্রিয়াঃ

নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত সমাজকল্যাণ কর্মধারাও সদা পরিবর্তনশীল। স্থবিরতা আধুনিক সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। সমাজ পরিবর্তনের ফলে সামাজিক সমস্যার গতি-প্রকৃতি, কারণ, প্রভাব, পরিধি ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটে। এজন্য সমাজকল্যাণের সাহায্যদান প্রক্রিয়া সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীল ও বহুমুখী রূপ লাভ করে। কারণ একক ও অপরিবর্তনশীল সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বহুমুখী ও গতিশীল সামাজিক সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়।

সমস্যার স্থায়ী সমাধানঃ

সনাতন ও ঐতিহ্যগত সমাজসেবা কার্যক্রমের ও আধুনিক সমাজকল্যাণের মূল পার্থক্য হচ্ছে আধুনিক সমাজকল্যাণ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সম্পদ এবং সামর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের নিশ্চয়তা বিধান সমাজকল্যাণকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছে।[৪৫]

বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াঃ

আধুনিক সমাজকল্যাণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা, সম্পদ এবং সামর্থের প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত সমাজকর্ম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা। সমাজকর্মের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াই সমাজকল্যাণকে ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞানের মর্যাদা দান করেছে।

প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক ভূমিকাঃ

আধুনিক সমাজকল্যাণ সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। কারণ সামাজিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান এরূপ ত্রিমুখী কার্যক্রম ব্যতীত সম্ভব নয়। সমস্যা সমাধানে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক দিকের প্রতিফলন সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজকল্যাণে বিশ্বাস করা হয় যে, প্রতিকার এবং প্রতিরোধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা গেলেও জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন বা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব হয় না। সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আধুনিক সমাজকল্যাণে প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য দান প্রক্রিয়াঃ

আধুনিক সমাজকল্যাণ সনাতন সমাজ সেবার ন্যায় বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ সেবা কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত নয়। পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগত সাহায্য দান প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতিমালার অধীনে সুশৃঙ্খল এবং পরিকল্পিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত দৃষ্টিকোণ হতে সাহায্য দানঃ

আধুনিক সমাজকল্যাণএকটি পেশাদারী সমাজ সেবা কার্যক্রম হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। অতীতের ন্যায় ব্যক্তিগত ইচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যক্রম হিসেবে সমাজকল্যাণকে বিবেচনা করা হয় না। পেশাদার সমাজকর্মী নিয়োগ করে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের সাহায্য দান প্রক্রিয়া বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। আধুনিক সমাজকল্যাণের সার্বিক সাহায্যদান প্রক্রিয়া পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির উপর ভিত্তি করে পারিচালিত হয়ে থাকে।

সমন্বয়ধর্মী ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞানঃ

সমাজকল্যাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিজস্ব একটি বিজ্ঞান গড়ে তোলে। সমন্বয়ধর্মী ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজকল্যাণ পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত।

মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ সাধনের প্রতি গুরুত্বারোপঃ

সমাজকল্যাণের যাবতীয় কার্যক্রম স্বাবলম্বন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজেরপ্রতিটি সদস্যকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সমাজকল্যাণ মানুষের সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতা বিকাশ সাধনের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

==========

তথ্য ও টিকা নির্দেশ

১. Maclver and Page, **Society**, Indian Print, 1972, P.8

২. Elizabeth Wickenden, **Social Welfare in Changing World,** Washington, Department of Health Education and welfare, 1965, P.VII.

৩. Ronald C. Federico, **the Social Welfare Institution,** Lexinton, D.C, Health and Co, 1983, P.21.

৪. H. L. Wilensky & Charles N lebeaux, **Industrial Society and Social Welfare,** Newyork, Russel sage foundation, 1958, P.17.

৫. **Encyclopedia of Social Work,** Newyork, the National association of social workers of U.S.A, 1965, P.3.

৬. উদ্ধৃতঃ মোঃ আবদুল হালিম মিয়া, **সমাজকল্যাণ পরিক্রমা,** হাসান বুক হাউস, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ৪

৭. W.A. Fried Lander, Introduction to social welfare, New Delhi, Prentice Hall-1963, P. 4

৮. Bradford W. Sheafor, Charles R.Horesji, Tecknique & Guidlines for social work, Boston-188, P.13

৯. Charles D. Garvin, Social Work in Contemporary Society, 2nd ed. 1998, P.2

১০. As qouted by W.A. Friedlander, op.cit, P.4

১১. Charles Zastraw, Introduction to Social Welfare Institutions, Social Problems, Services Current Issues, 1982, P.7

১২. Federico, op.cit, P. 42

Dhaka University Institutional Repository

১৩. Md. Ali Akbar and Sayed Ahmed Khan, "Private Investment in Social Welfare, College of Social Welfare and Research, University of Dhaka-1971, P.3
১৪. Charles Zastraw, op.cit, P.3
১৫. W.A. Friedlander, op.cit, P.5
১৬. Luoise C and others, Social Welfare, 4th, (ed), P.4
১৭. Charles D. Garvin, op.cit, p.3
১৮. W.A. Friedlander and apte, op.cit, P. 4
১৯. উদ্ধৃত: সম্পাদাস, সমাজকর্ম : প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েজ, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৩৯
২০. Robert Morris as qouted by Sampa Das, P.40
২১. R.C. Fedrico, Social Welfare in todays World, 1990, P. 25
২২. Ibid, P. 27
২৩. R.M. titmus, as qouted by Sampa Das, op.cit, P. 41
২৪. lieen Garmbrill, Social Work practics, A Critical thinkers Guide, Oxford University Press, NewYork.
২৫. Encyclopedia of Social Work, op.cit, p. 220
২৬. W.A. Friedlander, Introduction to Social Welfare (3rd ed), 1969, P.4
২৭. Charles Zastraw, op.cit, P. 13
২৮. আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০, পৃ. ১৭
২৯. Elizabeth Wikenden, op.cit, P. 7
৩০. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৩৪
৩১. Skidmore and thackery, Introduction to Social Work, 1991, P.3
৩২. the development of National Social Welfare Programes, NewYork, 1959.
৩৩. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ১৪
৩৪. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫
৩৫. মোঃ আব্দুল হালিম মিয়া, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ১০
৩৬. মুহাম্মদ আলী আকবর, "সমাজকর্ম প্রশিক্ষণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ও সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও অবদান" সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ সমাজকর্ম শিক্ষক সমিতি, রাজশাহী-১৯৯০, পৃ. ৯২-৯৩.
৩৭. Friedlander and Apte. Introduction to Social Welfare, New Delhi, Prentice Hall of India Pvt. Ltd. 1982, P. 5
৩৮. আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৪০. মুহাম্মদ আলী আকবর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৪১. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সমাজকর্ম, বাংলা একাডেমী ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ২-৫
৪২. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৪৪. উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশধারা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সমাজকল্যাণ চিন্তা ঃ

সমাজকল্যাণের আধুনিক ও সুসংগঠিত যে রূপ দেখা যায়, তার পেছনে ইসলামের অন্তর্দৃষ্টি, অনুপ্রেরণা, অনুশাসন ও মানবীয় দর্শন এবং মানব কল্যাণের সার্বজনীন নীতি প্রধান ভূমিকা পালন করে। ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বাস্তবমুখী ব্যবস্থাবলী সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের প্রতিটি স্তর ও পর্যায়ে ইসলামের প্রভাব ও প্রাণশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা, ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন। মানব জীবনের প্রতিটি দিকই এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মানব কল্যাণের চিরন্তন বাণী নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব। মানবতাবোধের বিকাশ, মানবিক চেতনা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক বিপদ-আপদে সাহায্য দানের প্রেরণা ইসলামই মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছে। দানশীলতাকে ইসলাম ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়নি, বরং বাধ্যতামূলক করেছে এবং সকল কাজের মধ্যে সমাজ সেবাকে উত্তম কাজ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামী অনুশাসনের তাগিদেই যুগ যুগ ধরে মানুষ সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে এবং সমাজ জীবনে সুখ-শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

ইসলাম এভাবে সমাজ ও সমাজ জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে, যা সমাজের বুক থেকে অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটায় এবং ন্যায়বিচার ও শোধনের ফল্গুধারা প্রবাহিত করে। বস্তুত ইসলামের জীবন দর্শন সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি গঠনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে।

ইসলাম আমাদের সামনে মানবকল্যাণ ও সমাজ কল্যাণের যে মূলনীতি ও আদর্শ তুলে ধরেছে তা খুবই ব্যাপক। মহানবী (স.) বলেছেন, মানব জাতির মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করেন। মুসলিমদের সেবার আদর্শ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের উৎকর্ষই চায়না, এর দৃষ্টি-দিগন্ত আরও দূরপ্রসারী, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য উন্মুখ ও সর্বজনীন মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকারের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।"[১]

"এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে।"[২]

কাজেই দেখা যায় যে, অপরের সেবার জন্য মানুষের জন্ম - এই হল কুরআনের বাণী এবং মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে যে, সমস্ত মানবজাতির জন্য তাদেরকে মানবতার চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করার জন্যে শ্রেষ্ঠতম জাতি করে প্রেরণ করা হয়েছে। একদিকে যেমন মানুষের সমাজে যা সৎ ও ন্যায়সংগত তা প্রতিষ্ঠার নজ্য মুসলিমদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি অবৈধ অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া আইনের পরিপন্থী যাবতীয় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই ইসলাম আদর্শ সমাজ গঠনের মূলনীতিসমূহ সরবরাহ করেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল সকল মানুষ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং সকল মানুষ সমান। ইসলামের শিক্ষা হল, আল্লাহর দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সবাই অভিন্ন নয়। অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ব মানুষের এক জাতীয়তার ভিত্তি। আল্লাহ মানুষকে এক জাতিরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে শত সহস্র পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল মানুষই এক, তারা এক আদমেরই বংশধর। যোগ্যতা, সম্ভাবনা, উচ্চাকাঙ্খা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এর কোন পার্থক্যের উপরই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের আসন স্থাপন করতে পারে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ক্ষেত্রে তার বংশ-গোত্র, তারা দৈহিক বর্ণ (সাদা, কালো, বাদামী), তার সম্পদের পরিমাণ এবং তা সম্ভ্রমের মাত্রার কোন গুরুত্ব নেই।[৪]

এখানে শ্বেতকায়, কৃষ্ণতায়, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ, ধনী ও নির্ধন সকলেই মানুষ, সকলেই আল্লাহর বান্দা। শ্বেতকায় ও শ্বেতচর্মের বলে কৃষ্ণকায়ের উপর প্রভত্ব করতে পারে না; আবার ধনী ধনের বলে নির্ধনের উপর প্রভূত্ব করতে পারবে না। আরব-অনারবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; সাদা ও কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বংশ গৌরব, ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও পদমর্যাদার অহমিকার উপর মানুষের পার্থক্য বা আভিজাত্য নির্ভর করেনা, নির্ভর করে শুধু তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণতায় আর তার একমাত্র গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি হল পুণ্যশীলতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ। আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[৫]

সুতরাং ইসলামী সমাজে গোত্র, বর্ণ বা সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য একেবারেই কৃত্রিম ও অর্থহীন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এসব পার্থক্য মানুষের প্রকৃত মর্যাদাকে এতটুকু প্রভাবিত করে না। বস্তুত সমতার ইসলামী মূল্যমানের ভিত্তি ইসলামী সমাজ কাঠামোর অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। এটি নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো থেকে উৎপন্ন হয় ঃ ১. সমস্ত মানুষ বিশ্বলোকের প্রভূ এক অভিন্ন ও শাশ্বত আল্লাহর সৃষ্টি; ২. সমস্ত মানুষ একই মানবকূলের অন্তর্ভূক্ত এবং আদম হাওয়ার বংশধারার সমান অংশীদার; ৩. আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ন্যায়পরায়ন ও দয়াশীল কোন বিশেষ গোত্র, যুগ বা ধর্মের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব নেই। সমগ্র বিশ্বলোক তার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র জনপ্রাণীই তার সৃষ্টি, সমস্ত মানুষ সমানভাবে জন্মগ্রহণ করে বলে কেউই কোন বিশেষ অধিকার সঙ্গে নিয়ে আসে না এবং সমস্ত মানুষ সমানভাবে মৃত্যুবরণ করে বলে কেউই পার্থিব কোন সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যায় না। ৪. আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার নিজস্ব গুণাবলীর ভিত্তিতে এবং তার নিজস্ব কর্মকান্ডের আলোকে বিচার করবেন; ৫. আল্লাহ মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই দিয়েছেন সম্মান ও মর্যাদার অধিকার।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের সামাজিক জীবন ঐশী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তিকে নিশ্চিত করা। শ্রেণী সংগ্রাম, বর্ণাশ্রম এবং সমাজের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব কিংবা তার বিপরীত অবস্থা ইসলামের সামাজিক জীবনের পরিপন্থী। কুরআন-সুন্নাহর কোথাও শ্রেণী, বংশ বা সম্পদের দরুন শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ নেই, বরং এর বিপরীত কুরআনের বহু আয়াত ও মহানবীর (স.) বহু হাদীস মানব জাতিকে জীবনের অপরিহার্য বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে বিষয়গুলো একই সঙ্গে ইসলামের সামাজিক কাঠামোর মূলনীতিরূপেও কাজ করছে। এর মধ্যে প্রধান বিষয় হল, মানব জাতি এক ও অভিন্ন পিতা-মাতা থেকে উদ্ভূত এবং একই চরম লক্ষ্যের দিকে উদ্বুদ্ধ একটি পরিবার সদৃশ। অতএব, অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে তার তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন তার উপর অভিন্ন দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। মানুষ যখন উপলব্ধি করবে যে, তারা সকলেই এক আল্লাহর সৃষ্ট আদম ও হাওয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত, তখন আর বর্ণ বিদ্বেষ, সামাজিক অবিচার কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের কোন অবকাশ থাকবে না। অভিন্ন পিতৃ-মাতৃত্বের দরুন লোকেরা যেমন প্রকৃতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ, তেমনি সামাজিক আচরণেও তারা হবে ঐক্যবদ্ধ। কুরআন ও সুন্নাহতে প্রকৃতি, উৎস ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিক থেকে মানবীয় ঐক্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হল বর্ণগত অহমিকা ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে নির্মূল করা এবং যথার্থ ভ্রাতৃত্বের পথকে সুগম করে তোলা। আল-কুরআনে তাই বলা হয়েছে, "তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়।"[৭]

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্যই হল আল্লাহর বন্দেগী করা এবং তাঁর উদ্দেশ্য সফল করে তোলা। দুনিয়ায় সত্য ও সুবিচার, ভালবাসা ও অনুকম্পা, ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকতার প্রতিষ্ঠাও এ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।[৮]

ইসলাম বলে মানুষ একজন অপরজন হতে নিরাপদ থাকবে এবং কেউ কোন প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হবে না। পিতার প্রতি পুত্রের, পুত্রের প্রতি পিতার, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর; ভৃত্যের প্রতি মনিবের আর মনিবের প্রতি ভৃত্যের; একজন মুসলমানের প্রতি আর একজন মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখাই হল এ সকল নির্দেশিত কর্তব্যের মৌলিক উদ্দেশ্য। আবুল হাশিম তাঁর 'দ্য ক্রিড অব ইসলাম' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "ইসলাম মানব প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখে না বা তার উপর জোর যুলুম চালায় না। ইসলাম দেহ, মন ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনার সুসামঞ্জস্য বিকাশ ঘটাতে চায়, যাতে অন্যের অনুরূপ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে মানুষের নিজস্ব সত্তার স্বাভাবিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়।"[৯]

ইসলামে সামাজিক জীবনের কাঠামো অত্যন্ত নিখুঁত, মহৎ ও ব্যাপক। এই কাঠামোর উল্লেখযোগ্য মৌল উপাদানগুলো হল সহযোগী লোকের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, আর্তের প্রতি সান্ত্বনা ও সমবেদনা, রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা, ব্যথিতের ব্যথা উপশম, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সংহতির অনুভূতি, জীবন, সম্পত্তি-সম্পদের প্রশ্নে অন্যান্য লোকের

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলোর কয়েকটি হল, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পনকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মরিওনা এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পার।"[১০]

এভাবেই ইসলাম মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশ্বজনীন-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য। সকল মানুষই সমান এবং জন্ম ও মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এটাই ইসলামের বিঘোষিত নীতি। ইসলাম এমন ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যেখানে জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ কারণেই একজন অন্যজনের অধিকারকে পদদলিত করতে পারে না। মানবতার আদর্শ হিসেবে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে প্রভেদ মানে না। অমুসলিমগণকে ইসলাম তার সমাজ কাঠামো হতে বিচ্ছিন্ন করেনি। এক আল্লাহর অধীনে ইসলাম সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে চায়। মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে ভৌগলিক সীমারেখা, জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের উর্ধ্বে একটি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে শান্তি আনয়নই ইসলামের লক্ষ্য।

মানুষের উপর মানুষের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে। যেমন- জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, চিন্তা ও কথা বলার অধিকার; কর্ম, উপার্জন ও জীবিকার অধিকার। ইজ্জত, আব্রু ও সমান-মর্যাদার অধিকার। এসব অধিকার প্রদান করা ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি একদিকে যেমন মানুষের মানবিক ও নৈতিক বোধ থেকেই উৎসাহিত হয়, ঠিক তেমনি ইসলাম এসব অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা আইনগতভাবে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। নৈতিক ও বিবেকবোধ তথা মানবতাবোধ থেকেই যদি মানুষের প্রতি মানুষের এসব কর্তব্য চেতনা সৃষ্টি হয়, তবেই সমাজে নেমে আসতে পারে মানবপ্রেমের অনাবিল শান্তির এক নির্মল পরিবেশ। কেননা, ইসলাম মূলতই মানবতার ধর্ম, একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে।

সুতরাং দেখা যায় যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের স্পৃহা হৃদয়ে না থাকলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। তাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দরিদ্র, অভাবী, মজলুম, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, মজলুমকে যালিমের যুলম থেকে রক্ষা করতে, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলতে। এসব ইসলামে 'হুক্কুল ইবাদ' নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মানুষে মানুষে বৈষম্য স্বীকার করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ বা রক্তের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হয়না, বরং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার উপরই মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন।[১১] এ খলিফা বা প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কিত ধারণাই ইসলামী সমাজের মূল্যবোধের উৎস এবং ইসলামী নীতি অনুযায়ী মানব অস্তিত্বের চারিত্রিক রূপের মাপকাঠি। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর রবুবিয়াতের কাজ (লালন ও পালন নীতি) মানুষ তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে করে যাবে।[১২] যেহেতু মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব তাই আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন, আদমকে কুর্নিশের মাধ্যমে মানুষের প্রাধান্য স্বীকার করতে।[১৩] আল্লাহ স্বয়ং মানব জীবনের চাহিদা পূরণের সকল ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে ও তাদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে। যাতে করে পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করে সমগ্র সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করতে পারে। কেননা, এ বস্তু জগতে মানুষের মর্যাদা হচ্ছে মানুষ এর নির্যাস। মানুষকে কেন্দ্র করেই এ বিশ্বলোকের সৃষ্টি। তাই এ বিশ্বলোককে মানুষের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য। মানুষ তার উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে এর ব্যবহার করবে। এ সবই স্বতঃই মানুষের কল্যাণে নিরত। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনিই পৃথিবীতে সবকিছু তোমাদের (মানবজাতি) জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।"[১৪]

ইসলামের পরিকল্পনায় মানুষই হল সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। তার জন্যই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি এবং তারই জন্য এত আয়োজন। এভাবেই ইসলাম সৃষ্টিলোকে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে এবং ধর্ম-বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ না করে সমগ্র মানব জাতিকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। এই সম্মান ও মর্যাদা সব মানুষের জন্মগত অধিকার। আকীদা-বিশ্বাস পোষণ, জ্ঞানার্জন ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সে সবাইকে সমান অধিকার দেয়। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পছন্দ ও ক্ষমতানুযায়ী কার্য পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। এজন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।"[১৫]

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাত কায়েম করিলে, যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রামে সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা, যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই ইসলামে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজ সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজের কল্যাণকে ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করা হয়েছে। সর্বোপরি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম সুযোগ, সামাজিক দায়িত্ব, সম্পদের সুষম বন্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে, যা সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়নের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছে।

ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বন্টনের লক্ষ্যেই আবর্তিত হয়েছে। যাকাত আদায়ের পরও ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তাহারা ব্যয় করিবে, বল, যাহা উদ্বৃত্ত" "তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।"[১৭] এখানে 'তোমাদের' শব্দটি কোন ব্যক্তি, সমষ্টি বা গোত্রকে সম্বোধন করে বলা হয়নি, বরং সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সম্পদ ভোগ ইসলাম সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে এবং বিশেষ অধিকারকে শুধু যে অস্বীকার করেছে তা নয়, বরং কোন অঞ্চলের সম্পদে শুধু সে অঞ্চলের লোকদের কায়েমী স্বার্থকেও ইসলাম স্বীকৃতি দেয়নি। দারিদ্র বা সম্পদের স্বল্পতার অজুহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ ইসলাম কাউকে দেয় না। প্রত্যেককেই কম-বেশী সমাজের জন্য ব্যয় করতেই হবে। তাই আল্লাহ বলেছেন, "বিত্তবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ যাহাকে যে সামর্থ দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।"[১৮]

সমাজের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে সামাজিক ন্যায়বিচার অপরিহার্য। সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যতীত সম্পদের সুষম বন্টন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন, সামাজিক সাম্য ও নিরাপত্তা এবং আইনের শাসনের বিকাশ সাধন হয় না; সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হয় না। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অনন্য। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল, দূর্বল, ধনী-দরিদ্র এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ইসলামে যে বিচার নীতি উপস্থাপন করেছে তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আত্মীয়তা, নৈকট্য, বন্ধুত্ব, আকীদা, বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানে কোন ভেদাভেদ নীতির অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেছেন,"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও ইহা তোমাদিগের নিজের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্য অভিভাবক।"[১৯]

এজন্যই ইসলাম তার অনুসারী মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছে যেন তারা প্রথমত তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, নারী, শিশু বিশেষ করে ইয়াতিম, দরিদ্র ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং মুসাফির যাদের খোঁজ-খবর নেয়া ও সমবেদনা জানানো। প্রয়োজনে তাদের সকলের সাথে গঠনমূলক আচরণ করা। ঠিক এ কারণেই ইসলামের সামাজিক সুবিচারের আদর্শ একটি মানবিক সুবিচার এবং মানব জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য একটি মৌলিক উপাদান। এটা সীমিত অর্থে নিছক অর্থনৈতিক সুবিচারের কথা বলে না। জীবনের সমুদয় তৎপরতা ও দিক নিয়ে এর পরিসীমা। এমন কি মানুষের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, অন্তঃকরণ ও বিবেক এর আওতাভূক্ত। এই সুবিচার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে তৎপর নয় বা নিছক জড়বাদী মূল্যবোধই তার কর্মক্ষেত্র নয়, বরং এ হচ্ছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকসহ অন্যান্য সকল মূল্যবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণ।[২০] ইসলামে সামাজিক সুবিচারের ধারণার দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি হল নিরঙ্কুশ ন্যায়ভিত্তিক ও সমন্বিত ঐক্য এবং দ্বিতীয়টি হল সাধারণভাবে ব্যক্তি ও সমাজে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, যা একদিকে মানব প্রকৃতির মৌলিক উপাদানসমূহকে বিবেচনা করে, তেমনি মানুষের যোগ্যতার সীমাকেও সামনে রাখে। পবিত্র কুরআনে মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এবং সে অবশ্যই ধন-সম্পদের লালসায় উন্মুক্ত।"[২১]

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষকে যদিও কাজের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তার কর্মদ্যোগের স্বাধীনতা রয়েছে, সে অর্থোপার্জন ও তা দখলে রাখার অধিকার পেয়েছে; তবু প্রকৃত সত্য হল এই যে, সে অর্জিত সম্পদের নিছক একজন আমানতদার মাত্র; সে কেবল তার সম্পদ, তার আমানতের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তার উপার্জন করার, বিনিয়োগ করার ও ব্যয় করার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ধন-সম্পদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে নারাজ। ইসলামের মতে, গ্রাস ভর্তি খাবার, মুঠো মুঠো ধন-সম্পদ বা দেহজ কামনা-বাসনার নাম জীবন নয়। যদিও ইসলাম ব্যক্তিকে সঙ্গতি সম্পন্ন থাকতে, কোন কোন সময় তারও বেশী থাকতে বলে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের মাধ্যমে বা ব্যক্তি মালিকানায় বিশ্বাসী অর্থ ব্যবস্থার সহায়ক কোন উদ্যোগের মাধ্যমে সে এই সঙ্গতি লাভ করতে পারে, যাতে একদিকে দারিদ্রের ভয় দূরীভূত হয় এবং সাথে সাথে উপার্জনের ব্যাপারে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার অপব্যবহারও বন্ধ হয়। জীবন ধারনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছে। গরীবের প্রয়োজনের স্বীকৃতি, সমাজের জন্য কল্যাণকর সীমা পর্যন্ত সম্পত্তি অর্জন এবং ধনীদের ধন-সম্পদের উপর গরীবের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এভাবেই ইসলাম সমমান, ভারসাম্য ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলাম বস্তুগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়াদিসহ জীবনের বহুবিধ উপাদানের কোনটিকেই উপেক্ষা করেনি। বরঞ্চ এর সবগুলোর এমনিভাবে সংগঠিত করে যাতে তারা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এবং গড়ে উঠতে পারে সর্বাত্মক ঐক্য।[২২]

তাই ইসলাম সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে যাকাত, ওয়াক্ফ, বায়তুলমাল, করজে হাসানা, সদকায়ে জারিয়াহ ইত্যাদি। ইসলামের এসব অনুশাসন এবং প্রেরণাই ইয়াতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ নিবাস ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার প্রতিবেশীদের অধিকার বা অংশ রয়েছে তার সম্পত্তির উপর। সেজন্য ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের সুষম বন্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টনের তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাতকে গণ্য করা হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্য যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। কিন্তু যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়, যা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দয়া করে দেয়া হয় বরং যাকাত ধনীর সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনীদের আয়কে গরীবদের মধ্যে যারা ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতার (দৈহিক, মানসিক বা বাইরের কোন অসুবিধা যেমন বেকারত্ব) ফলে নিজের প্রচেষ্টায় সম্মানজনকভাবে জীবন-যাপনে অপারগ, তাদের মধ্যে পুনর্বন্টন করে দেয়া যাতে "যারা বিত্তমান তাদের মধ্যেই যেন ধন-সম্পদ আবর্তন না করে।"[২৩]

যাকাত বলতে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমপক্ষে ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ হলে তার শতকরা ২.৫ টাকা হারে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্র ও অসহায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার প্রথাকে বোঝায়। হাদীস অনুযায়ী সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর ঘুরে না আসা পর্যন্ত যাকাত দান ফরয হয় না। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য পছন্দ করে না। এটাকে প্রতিরোধ ও নির্মূল করার চেষ্টাও করে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ধনী মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটা অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দূর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হয়, যার নাম যাকাত। এর ফলে যেমন অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ সাধিত হয় তেমনি সামজে আয় বন্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য অনেকটা কমে যায়।

দারিদ্র মানবতার শত্রু। যে কোন সমাজ ও দেশের জন্যে এটা সবচেয়ে জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতির সৃষ্টি হয় দারিদ্রের ফলে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্রের জন্যে।[২৪] এ সমস্যার প্রতিবিধানে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা অনন্য। দরিদ্র ও অসহায় জনগণের কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যেই ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। যাকাত সামাজিক ক্ষেত্রে দারিদ্র দূর করে, সামাজিক সংহতি ও উন্নয়ন বজায় রাখে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। নৈতিক ক্ষেত্রে এটি সম্পদশালীদের লোভ এবং মালিকানা লাভের আকাঙ্খাকে বিধৌত করে এবং দারিদ্র সমস্যা দূরীকরণে তাদের সজ্ঞান ও দায়িত্বশীল করে তোলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সুযোগ ও সামাজিক সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, যাতে সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে আবর্তিত না হয় এবং গরীবরা যেন আরও গরীব না হয়। যাকাত দানের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহনশীলতা, মিতব্যয়িতা, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করে। এসব গুণাবলী সমাজ জীবনের সংহতি ও শৃঙখলা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ আনয়নের জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন। যাকাত একাধারে ইবাদাত এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। যাকাত ব্যবস্থায়ই বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যার দর্শন ও আদর্শের অনুসরণে গড়ে উঠেছে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হল বায়তুল মাল। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুল মাল বলা হয়। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারী অর্থভান্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থভান্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানকে বায়তুল মাল বলা হয়।[২৫] ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের নিকট থেকে রাজস্ব হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ এখানে জমা হত এবং এখানে থেকেই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার মিটানো হয়। সারা বছরের ব্যয় বহনের পর যে অর্থ রাজকোষে উদ্বৃত্ত থাকে তা দিয়েই জনকল্যাণমূলক কাজ করা হয়। বায়তুলমালের মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। বায়তুলমালে সঞ্চিত সম্পদে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত। কেউ যাতে মৌলিক চাহিদা হতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করা এর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। যাকাতের নির্ধারিত আট শ্রেণীর জনগণের চাহিদা পূরণ না হলে বায়তুল মাল থেকেই তাদের সাহায্য প্রদান করা হত।[২৬] খুলাফা-এ-রাশেদার আমলে বায়তুল মাল একদিকে দুঃস্থ, অসহায়, অক্ষম, দরিদ্রদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর জনগণের কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জনগণের কল্যাণ সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বায়তুল মাল।

ইসলামে মানবকল্যাণের স্বার্থে জাগতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের আর একটি দিক হল ওয়াক্ফ ব্যবস্থা। সাধারণত কোন ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে কোন মুসলমানের সহায়-সম্পদ ও সম্পত্তির সমুদয় অথবা আংশিক স্থায়ীভাবে দান করার প্রথাকে ইসলামী বিধান মতে ওয়াক্ফ বলে।[২৭] ওয়াক্ফ একটি ধর্মীয় বিষয় যা জনসাধারণ ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত হয়। এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান সমাজকল্যাণ সংস্থা। এর মাধ্যমেই মুসলিম সমাজের স্থায়ী কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। ওয়াক্ফ ইসলামের একটি ঐচ্ছিক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। তাই এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যাকাত যেখানে একটি বাধ্যতামূলক সার্বিক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সেখানে ওয়াক্ফ হল সে কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানে একটি সহায়ক সংগঠন।

ইসলামের অপর একট সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হল করজে হাসানা বা সুন্দর ঋণ অর্থাৎ সুদমুক্ত ঋণ। অভাবগ্রস্ত মানুষকে প্রয়োজনের মুহূর্তে বিনাসুদে ও শর্ত সাপেক্ষে ঋণ দানের প্রথাকেই করজে হাসানা বলে। এর উদ্দেশ্য হল অভাবগ্রস্ত জনগণকে বিপদের মুকাবিলায় সাহায্য দান এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। পবিত্র কুরআনে এই 'সুন্দর করজকে আল্লাহকে কর্য দেয়া বলা হয়েছে, "সে কে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ (করজে হাসানা) প্রদান করিবে। তিনি তাহার জন্য ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিবেন, আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাহার নিকট তোমরা প্রত্যাণিত হইবে।"[২৮]

ইসলামের অন্যতম সমাজ সেবা কার্যক্রম হল সাদাকাহ বা দান প্রথা। যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদশালী মুসলমানদের দিতে হলেও শুধু যাকাত প্রদান করেই কোন ব্যক্তি সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে যাকাত দানের পরও সম্পদশালীদের অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব রয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

"যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শষ্য বীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শষ্যকণা। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। যাহারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং যাহা ব্যয় করে তাহা বলিয়া বেড়ায়না ও ক্লেশও দেয় না, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।"[২৯]

এভাবেই ইসলাম প্রত্যক্ষ নির্দেশের মাধ্যমে যেমন মানবতার সেবা করার জন্য তাগিদ দিয়েছে, তেমনি পরোক্ষভাবে সমাজ ও জাতির কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এছাড়াও মুসলিম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকতর কল্যাণের জন্যে ইসলামে আরও কিছু দান-সাদাকাহ প্রদানের নিয়ম রয়েছে যা সাধ্যানুসারে সকল সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানই করে থাকেন। এসবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ঈদুল ফিতরের সময় ফিতরা আদায় এবং ঈদুল আযহার সময় কুরবানীর পশুর চামড়া বা তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান। ইসলামের এই অর্থ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়া এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন। এর ফলে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়।

উল্লেখ্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কেবল মুসলমানদেরই সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম, মত নির্বিশেষে সকলের পূর্ণ নিরাপত্তা এতে দেয়া হয়েছে এবং বায়তুল মাল ব্যবস্থার মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করে সমাজকল্যাণকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গ্রহণ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যায়, ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য একটি মহোত্তম আদর্শ। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং মানবীয় সমতা হচ্ছে ইসলামের মূলভিত্তি। ইসলাম একটি দর্শনমাত্র নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি জীবন বিধান। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও আবেদন আন্তর্জাতিক। বর্ণ, গোত্র, রক্তের সম্পর্ক ও ভৌগোলিক সীমারেখার চৌহদ্দী পেরিয়ে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও স্তরে ইসলামের প্রভাব ও প্রাণশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। মোটের উপর ইসলাম একটি গতিশীল শক্তি ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থা। তাই মানুষের জীবনের সত্যিকারের যা প্রয়োজন তার সবই মেটাবার প্রয়াস এতে রয়েছে।

মহানবী (স.)-এর সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলী ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায় সৃষ্ট জীবের সেবা। মানবের প্রতি অত্যাচার, অবিচার, দরিদ্রের প্রতি নির্মম ব্যবহার, প্রজার রক্ত শোষণ এবং স্ত্রী পুত্রকে ভরণ-পোষণ হতে বঞ্চিত রেখে কেবল 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' বললে মুক্তি হবে না। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে পানি দান এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, পীড়িতকে সেবা শুশ্রুষা, এর ভিতর দিয়েই বিশ্ব প্রভূকে প্রকৃতভাবে সন্তুষ্ট করা যায়। কেননা, মানুষকে দু'টি চোখ অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি দেয়া হয়েছে, কথা বলার শক্তি দেয়া হয়েছে, শুভ -অশুভ দু'টি পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে করে সে দায়িত্বের কঠিন পথপতিক্রমায় উত্তীর্ণ হয়। দায়িত্বের সে কঠিন পথ-পরিক্রমা হচ্ছে দাস মুক্ত করণ, অভাব অনটনে জর্জরিত নিরন্ন ও নিঃসহায়দের খাদ্য দান তথা অভাব দূরীকরণ এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং

Dhaka University Institutional Repository

পরোপকারে ব্রতী হওয়া।[৩০] "যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুণ্যফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে, তাহাদের কোন ভয় নাই, এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।"[৩১]

মূলত এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে দূর্গত জরাজীর্ণ মানবতার সেবা করার, আর্তের প্রতি দয়া করার, দরিদ্র-প্রপীড়িত, বন্যা কবলিত, প্রাকৃতিক দূর্যোগে পতিত দূর্দশাগ্রস্ত ইয়াতিম, মিসকিন, অনাথ ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার তাগিদ করা হয়েছে।

মহানবী (স.) মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থার সূত্রাবদ্ধ এমন এক নীতিদর্শন ভিত্তিক জীবনাচরণের পরিমন্ডল গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে স্রষ্টা আল্লাহর আনুগত্যের ভেতর দিয়ে মানুষ ব্যক্তিগত দলগত ও সমাজবদ্ধ জীবনে পূর্ণতর ও সমৃদ্ধ জীবন লাভে সক্ষম হওয়ার সুযোগ পায়। জীবনের প্রথম লগ্নে একজন ইয়াতিম, নিরক্ষর ও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র হয়েও তিনি নিজ চরিত্র গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হন এবং 'হিলফুল ফুজুল' নামক সংস্থা গঠন করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যৌবনের প্রথম পর্যায়ে মক্কায় হারবুল ফুজ্জার বা অন্যায় যুদ্ধ নামক পাঁচ বছরব্যাপী যুদ্ধজনিত বিভীষিকা ও সমকালীন সামাজিক অশান্তিদায়ক অবস্থা দেখে কতিপয় উৎসাহী যুবককে নিয়ে তিনি 'হিলফুল ফুজুল' নামক একটি শান্তি সংঘ গঠন করেন। এ সংস্থাই বস্তুত তার জীবনের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সমাজসেবার উদ্যোগ।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর প্রতিকূল সামাজিক, রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝাময় জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে একটি বিশৃঙ্খল ও মানবিকতাবোধ বিবর্জিত জাতিকে সংঘবদ্ধ করেন, সুখী সমৃদ্ধ সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলেন এবং সামগ্রিক আদর্শ মানুষ হিসেবে সমাজ কল্যাণকর জীবন লাভে সক্ষম করার প্রয়াস চালান আর তাঁর একাজে তিনি বিস্ময়করভাবে সফলতা অর্জন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'মানবজাতির মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ট, যিনি সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করেন।"[৩৩] বক্তব্যটির গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা হল শুধু অপরের অধিকার সংরক্ষণই নয়; অধিকন্তু মঙ্গল সাধন করতে হবে। ইসলামের আদর্শের আলোকেই ৬২২ সালে স্বাধীনতা, সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে মদীনায় প্রতষ্ঠিত হয় সত্যিকার অর্থে প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র, সেখানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা ছিল। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ সর্বযুগের মৌলিক অধিকারের প্রকৃষ্ট দলিল ও সর্বোত্তম দিক-নির্দেশনা। যার প্রথমে তিনি বলেছেন, "তোমাদের এই পবিত্র শহরে, এই পবিত্র মাসে, আজিকার দিনটি যেমন পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ, তোমাদের একের প্রাণ, ধন-সম্পদ অপরের নিকট তদ্রুপ মর্যাদাপূর্ণ।"[৩৪]

তদুপরি তিনি এ অধিকারগুলো শুধু তাঁর জীবদ্দশায় সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা নয়, বরং তাঁর অনুসারী ও ভক্তবৃন্দের জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছেন, কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁর অনুসারীরা তাদের জীবনে সেই মহামূল্য নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বায়তুল মালের মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করে সমাজকল্যাণ তথা সামাজিক ন্যায়বিচারকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী অনুশাসন অনুসরণ করে খুলাফা-এ-রাশেদার যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাকে বিশ্বের প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা-এ-রাশেদার যুগে সমাজকল্যাণের বিকাশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ইন্তিকালের পর সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপের একটি সমৃদ্ধ ধারা রচিত হয় খুলাফা-এ-রাশেদার আমলে। ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই হযরত আবু বকর (রা.) এক নীতি নির্ধারণী ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তি আমার নিকট দূর্বল, আমি তার নিকট থেকে জনগণের অধিকার আদায় করে নেব এবং তোমাদের মধ্যকার দূর্বলতর ব্যক্তি আমার কাছে শক্তিশালী। তার অধিকার আমি অবশ্যই আদায় করে দেব।"[৩৫] খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সমগ্র আরবে ভয়াবহ অভ্যুত্থান ঘটে এবং বেশ কিছু গোত্র ইসলামের আবশ্যকীয় বিধান যাকাত দিতে অস্বীকার করে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র জনগণকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করেছিল তা অচল ও ব্যর্থ হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। ফলে তিনি ঘোষণা করেন, "আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে ওরা যে যাকাত প্রদান করত, তার একটা উটও যদি আমার সময়ে দিতে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।"[৩৬]

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান ব্যবস্থা হযরত আবু বকর (রা.) এর সমগ্র খিলাফত আমলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবিত থাকাকালীন সময়ের মতই অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। তাঁর আমলেই প্রথমে সরকারীভাবে বায়তুলমালের মত একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়, যার মাধ্যমে অসহায়, বিপদগ্রস্ত ও দরিদ্ররা সাহায্য পেত। এমনকি তাঁর সময়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন ইরাক এলাকায় যুদ্ধরত ছিলেন, হীরাবাসী খৃষ্টানদের সাথে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বার্ধক্য, রোগাক্রান্ত ও দারিদ্রক্লিষ্ট লোকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের কথা ঘোষণা করেছিলেন।[৩৭]

হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর হযরত উমর ফারুক (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নিযুক্ত হন। এ সময়ই কায়েস ও রোমানদের সাথে যুদ্ধ চলছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ হয়। তখন হযরত উমর (রা.)-এর নেতৃত্বে ইসলামী সাম্রাজ্য যেমন বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়, তেমনি অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দিক দিয়েও অধিকতর সুষ্ঠুতা ও দৃঢ়তা অর্জিত হয়। খলিফা ওমর (রা.) সর্বপ্রথম বায়তুলমাল ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণের দায়িত্ব সরকারীভাবে গ্রহণ করেন। যাকাতের অর্থ অপর্যাপ্ত হলে বায়তুল মাল হতে জনকল্যাণে ব্যয় করা হত, যাতে কারও মৌলিক চাহিদা অপুরণ না থাকে। জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কল্যাণমুখী ভূমি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ভূমি জরিপ করা হয়। খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুসংখ্যক খাল খনন করা হয়। এসব খাল খনন করে বহু অনাবাদী ভূমি চাষাবাদ যোগ্য করা হয়। বিখ্যাত সুয়েজ কাল হযরত উমর (রা.)-এর সময় খনন করা হয়। এসব ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ও সুসংহত করে।[৩৮]

হযরত উমর (রা.) ২০ হিজরীতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আদম শুমারীর উদ্দেশ্যে 'দিওয়ান' নামক একটা বিশেষ সরকারী বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। এই আদমশুমারীর ভিত্তিতে কয়েক

Dhaka University Institutional Repository

প্রকারের লোকের জন্য বার্ষিক রাষ্ট্রীয় পেনশন নির্ধারিত হত। এরা হচ্ছেন -(ক) বিধবা এবং ইয়াতিমরা (খ) রাসূল (স.) জীবৎকালে ইসলামের সংগ্রামে যারা পুরোভাগে ছিলেন, তাঁরা সকলে, রাসূল (স.) এর বিধবা পত্নীগণ, বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা বেঁচেছিলেন তারা, গোড়ার দিকের মুহাজিরগণ ইত্যাদি এবং (গ) সকল অক্ষম, পঙ্গু, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোকেরা। এই পরিকল্পনা মুতাবিক ন্যূনতম বার্ষিক ভাতার পরিমাণ ছিল দু'শত দিরহাম। এমনকি শিশুরা নিজেদের ভরণ পোষণ করতে অসমর্থ থাকাকালে নীতির ভিত্তিতে জন্ম মুহূর্তে থেকে শুরু করে সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য শিশুদের নিয়মিত ভাতারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর এই ভাতা দেয়া হত তাদের বাপ মা অথবা অভিভাবকদেরকে।[৩৯] হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে এ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অমুসলিম নাগরিকদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। তিনি একদিন এক বৃদ্ধকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখে তার ভিক্ষা করার কারণ জানতে চান। লোকটি জানাল যে, জিযিরার অর্থ যোগাড় ও ঘরের প্রয়োজন পূরণের জন্য এছাড়া আর কোন উপায় নেই বলে। একথা শুনে খলিফা বলে উঠলেন, "আমরা তোমার প্রতি সুবিচার করিনি। তোমার যৌবনকালীন কাজ-কর্মের ফসলতো আমরা সবাই ভোগ করেছি। অতঃপর তোমার বার্ধক্যকালীন জরাজীর্ণ ও অসহায় অবস্থায় তোমাকে ত্যাগ করেছি, যেন তুমি তিলে তিলে ধ্বংস হও।"[৪০]

অতঃপর তিনি লোকটির জন্য মাসিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন এবং তার উপর ধার্যকৃত জিযিয়া রহিত করেন।

হযরত বিলাল (রা.) একবার খলিফার নিকট স্থানীয় প্রশাসক ও সেনা নায়কদের উপেক্ষার দরুন সৃষ্ট দরিদ্র জনগণের অভাব অনটন সম্পর্কে অভিযোগ করলে খলিফা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর নামে শপথ, এ আসন থেকে আমার উঠে যাওয়ার আগেই তোমরা আমার পক্ষ থেকে প্রতিটি অভাবগ্রস্ত নাগরিকের জন্য দুই মুষ্ঠ পরিমান আটা ও সেই অনুপাতে প্রয়োজন পরিমাণ সিরকা ও খাবার তেলের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। জওয়াবে সকলেই বলে উঠলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, আমরা আপনার পক্ষ হতে এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি। আল্লাহ আমাদের বিপুল ও সুপ্রশস্ত সম্পদ দান করেছেন।"[৪১]

বায়তুল মাল সম্পর্কে খলিফা উমর (রা.) ঘোষণা করেছিলেন, "রাষ্ট্রীয় সম্পদে কোন লোকই অপর কারও তুলনায় অধিক পাওয়ার অধিকারী নয়। আমি কারও অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্ন নই। আল্লাহর নামে শপথ, এ সম্পদে প্রত্যেকটি মুসলিমেরই প্রাপ্য অংশ রয়েছে।"[৪২]

খলিফা উমর (রা.) হযরত খালিদকে (রা.) লিখে পাঠিয়েছিলেন, "এই ধনমাল সরকারী ব্যবস্থাধীন। তা একান্তভাবে গরীব জনগণের জন্য এবং তা তাদের জন্য জমা রেখে তাদের জন্যই ব্যয় করতে হবে।"[৬৫] তিনি বলতেন, "সুদূর ফুরাত নদীর তীরেও যদি একটি উট অসহায় অবস্থায় মনে, তবু আমি ভয় পাচ্ছি যে, আল্লাহ তার সম্পর্কেও আমার নিকট কৈফিয়ত চাইবেন।"[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রা.) তাঁর জীবনের শেষ বছরে একাধিকবার বলেছেন, "আল্লাহ যদি আমাকে পরমায়ু দেন আমি দেখব যাতে করে সানা পর্বতমালার নিঃসঙ্গ মেষ পালকও জাতির সম্পদে তার অংশ পায়।" বাস্তব প্রশ্ন বা সমস্যাদির উপলব্ধির যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাঁর ছিল তারই বদৌলতে হযরত উমর (রা.) গড়পরতা একজন মানুষের পুর্ণ স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ন্যুনতম কি পরিমাণ খাদ্য দরকার তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে একবার ত্রিশ জন লোকের একটি দলকে নিয়ে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পর্যন্ত করেছিলেন এবং এ সব পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের পর তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, দেশের প্রত্যেকটি নর এবং নারী (আর্থিক ভাতা ছাড়াও যে ভাতা হয়ত তারা ভোগ করছে) প্রত্যকদিন দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার মত প্রচুর গম মাসিক ভাতা হিসেবে পাবে।"[৪৪] হযরত উমর (রা.) তাঁর সামাজিক নিরাপত্তার মহৎ পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করার আগেই ঘাতকের ছুরিকাঘাতে শাহাদাৎ বরণ করেন।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর সময় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের এ ইসলামী ব্যবস্থা সর্বোতভাবে অব্যাহত ছিল। তাঁর খিলাফত কালে ব্যাপক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং উতাল-পাতাল অবস্থা থাকা সত্বেও বায়তুল মালে যাকাত সাদাকাত জমা হওয়া অব্যাহত থাকে এবং জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। তাঁর সময়ে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকায় যাকাত নেয়ার মত লোক না পাওয়া গেলেও তিনি এ বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার ফরমান জারি করেছিলেন।[৪৫]

একই অবস্থা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)। তাঁর শাসনামলে ইসলামী জগতে রাজনৈতিক দূর্যোগের ঘনঘটা ঘণীভূত হয়ে উঠে। কিন্তু তা সত্বেও জনগণকে প্রদত্ত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পূর্ববতই অব্যাহত থাকে। তিনি মালিক বিন আল হারিস (রা.) কে (আল আশতার) মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত করার সময় লিখিত ফরমানে তাঁকে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন, গোপন ও প্রকাশ্যে আল্লাহর আনুগত্য করে চলার, সর্বক্ষণ আল্লাহর ভয় রেখে কাজ করার, মুসলিমের প্রতি বিনম্র ও ফাসিক ফাজির ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি পূর্ণ ন্যায়বিচার, জালিমের উপর তীব্র কঠিন শাসন চালানোর, সাধারণভাবে মানুষের প্রতি ক্ষমাশীলতা ও যথাসাধ্য কল্যাণমূলক আচরণের বিস্তারিত উপদেশ এবং নসিহত লিখেছিলেন।[৪৬]

ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি কতটুকু সচেতন ছিলেন একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হযরত আলী (রা.) কে লক্ষ্য করে উসমান ইবন হানিফ (রা.) বলেছিলেন, "আপনি বিত্ত সম্পদের সমবন্টন নীতি অনুসরণ করেছেন। এ নীতির মাধ্যমে আপনি সমাজের মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়েছেন, নিগ্রো এবং পারসিয়ানদেরকে আরবদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। আপনি দাস ও মালিককে বায়তুল মাল হতে সমপরিমাণ অংশ দিচ্ছেন, ধনীদেরকে তাদের জায়গীর হতে বঞ্চিত করেছেন, তাদের বিশেষ মর্যাদা লোপ করেছেন। এ নীতি দ্বারা আপনি খিলাফতের ও নিজের কল্যাণের চেয়ে সর্বনাশকেই ডেকে আনছেন। আর এ কারণেই প্রভাবশালী ও

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদশালী আরবগণ আপনাকে পরিত্যাগ করে আমীর মুয়াবিয়ার দলে যোগ দিচ্ছেন। দরিদ্র, অক্ষম লোকজন আপনার কোন উপকারই করতে পারবে না। অসহায়, বিধবা ও দাসগণ আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। খলিফা উত্তরে বললেন, "অসম ধন বন্টনের মাধ্যমে আমি এক বিত্তশালী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে তাদের দ্বারা শোষণের পথ প্রশস্ত করতে পারি না। সমাজের এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর শোষণের কোন পন্থাই আমি মুহূর্তের জন্য অনুমোদন বা বরদাশত করতে পারি না।"[৪৭]

খুলাফা-এ-রাশেদার আমলে উপর্যুক্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় দরিদ্র, অক্ষম ও বিপদগ্রস্তদের প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের স্বীকৃতি রয়েছে, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের পথ নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে সমাজকল্যাণের বিকাশ

খুলাফা-এ-রাশেদার পর উমাইয়া যুগে সমাজকল্যাণের সম্ভাবনাময় দিকসমূহ স্তিমিত হয়ে পড়লে এ সময়ে আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ও দ্বিতীয় উমর রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনগণের মঙ্গলবিধায়ক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সম্রাট দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ানের সমসাময়িক আবদুল মালিক এ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। অধ্যাপক হিট্টির মতে "তাঁর শাসনামলে প্রশাসনের জাতীয়করণ হয়, প্রথম টাকশাল স্থাপন করে আরবীমুদ্রা প্রস্তুত হয়, ডাক বিভাগের উন্নতি হয়।"[৪৮] আরব সাম্রাজ্যের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী খলিফা ওয়ালিদ মসজিদ-মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠায় খ্যাতি অর্জন করেন। অধ্যাপক হিট্টির কথায়, "He was perhaps the first ruler in mediaeval times to build hospitals for persons was diseases and the many bazars house which later in the west followed the Moslem precedent."[৪৯]

উমাইয়া রাজত্বের সময় সমাজ সেবায় সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী হলেন খলিফা দ্বিতীয় উমর। খুলাফা-এ- রাশেদার খলিফাদের মত পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি অনাসক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, সরল এবং কর্তব্যপর এ খলিফাকে বলা যায় সর্বোতভাবে জনকল্যাণে উৎসর্গীত। মাত্র আড়াই বৎসরের শাসনকালে তিনি জনগণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সকল সম্পদ নিয়োজিত করতে দেখা যায় এবং জনগণের মঙ্গলচিন্তার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত পাওয়া যায়।

উমাইয়া যুগের পর আব্বাসীয় আমলের খলিফাগণের মধ্যে আল-মানসুর (৭৪৫-৭৭৫ খ্রী.) ন্যায় বিচারক ও সুশাসক হিসাবে জনগণের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হন। তিনি বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করে "খাদ্য সুষ্ঠ সরবরাহ, জ্ঞানচর্চার ভিত্তি ও ন্যায় বিচারের বাগিচা" হিসেবে তা গড়ে তোলেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে তিনি মৃত্যুশয্যায় উত্তরাধিকারী পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "দান ছাড়া কোন খলিফা গুণী, আনুগত্য ছাড়া কোন নরপতি শক্তিশালী অথবা ন্যায়বিচার ছাড়া কোন জাতির সংস্কার সাধন হতে পারে না।"[৫০] আব্বাসীয় যুগের খলিফা হারুন-আল-রশীদ ন্যায় বিচারক, সদাশয়, মহানুভব, দানবীর, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নরপতি হিসাবে ইতিহাস খ্যাত। অধ্যাপক হিট্টির মতে

Dhaka University Institutional Repository

"বিশ্বের কার্যকলাপ নিয়ামক দু'টি বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরপতির নাম নিয়ে নবম শতাব্দীর সূচনা হয়-পাশ্চাত্যে শার্লিমেন এবং প্রাচ্যে হারুন-আর-রশীদ। এ দু'জনের মধ্যে হারুন সন্দেহাতীতভাবে অধিকতর শক্তিশালী এবং উন্নততর সভ্যতা ও কৃষ্টির অধিকারী।"[৫১] তাঁর গোটা সাম্রাজ্যব্যাপী জনহিতকর কার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্কুল, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী ও কৃষির অগ্রগতির জন্য খাল খনন ইত্যাদি নির্মাণ। তিনি পাগল চিকিৎসার জন্যও একটি আলাদা হাসপাতাল নির্মাণ করেন। খলিফা হারুনের পর ইতিহাসখ্যাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক আল-মামুনের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি মনে করতেন যে, জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। সেজন্য তিনি রাষ্ট্রের কোন খলিফা বা আমির-ওমরাহদের ব্যক্তিগত সাময়িক বদান্যতায় শিক্ষা নির্ভর করুক এর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি এটিকে (শিক্ষাকে) চিরস্থায়ী দান স্বত্ত্বের উপর সাময়িক দান হতে স্বয়ং সম্পন্ন করেছিলেন।[৫২] এ অবস্থার কারণে সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রচুর পরিমাণ লাখেরাজ সম্পত্তি পাওয়া যায় এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাও বহুমুখীন ব্যাপকতায় বিকাশ হয়। ফলে মানবকল্যাণ, সমাজ উন্নয়ন ও সুখী-সমৃদ্ধ জীবন লাভের পথ নির্দেশনা লাভ সহজতর হয়। উইলিয়াম মুর খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় সমকালীন জ্ঞানী-গুণীর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "মধ্যযুগের ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জমান, তখন এ মনীষীবৃন্দের পরিশ্রমের ফলেই লুপ্ত প্রায় গ্রীসীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে তাদের পরিচিত ঘটে।"[৫৩]

তথ্য ও টিকা নির্দেশ

১. আল-কুরআন, ৩:১১০

২. আল-কুরআন, ২:১৪৩

৩. অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও একথা সত্য যে, বদান্যতার সূত্রপাত হয় স্বগৃহে এবং মুসলিম সমাজের বাহিরে যে বিরাট মানব সমাজ রয়েছে সেদিকে মনযোগ দেয়ার পূর্বে মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানগণ যেখানেই সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করুন না কেন, সেখানে মুসলিম-অমুসলিম কোন প্রকার প্রশ্ন জাগবে না; সেখানে মুসলমানদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের সেবা কার্য আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের একটি নির্দেশরূপে ধর্মীয় কর্তব্যেরই একটি অঙ্গ বিশেষ। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর আদেশ এই যে, মুসলমানদের কার্যাবলীর মাধ্যমে শুধু মুসলমানগণই নয়, বরং সমস্ত মানব জাতিই যেন স্বর্গীয় দীপ্তির সন্ধান পায় এবং আল্লাহর দেয়া আইন মেনে চলে। (এ.কে. ব্রহী,'ইসলামী জীবনের আদর্শ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৫৪-৫৫)।

৪. Hammudah Abdalati, Focus in Islam, Al-Ittehad-al-Islami-al-Alami, Jeddah, 1973, P.57.

৫. আল-কুরআন, ৪৯:১৩

৬. Hammudah Abdalati, Opcit, P. 58

৭. আল-কুরআন, ৭:১৮৯, ৪:১

৮. আল-কুরআন, ৫১:৫৭-৫৮

৯. Abul Hashim, the Creed of Islam, Islamic Foundation Banlgadesh, Dhaka-1987, P.21

Dhaka University Institutional Repository

১০. আল-কুরআন, ৩:১০২-১০৪

১১. আল-কুরআন, ২:৩০

১২. আরবী 'রব' শব্দটি থেকেই এসেছে 'রবুবিয়াত'। 'রব' এর অন্তর্নিহিত অর্থে রয়েছে বিশ্বজগতের সৃজন, প্রতিপালন এবং বিবর্তনের কর্তৃত্ব। অতএব 'রব' হচ্ছেন মহাবিশ্বের একক স্রষ্টা, পালক ও বিবর্তক। মানুষ এক অর্থে স্রষ্টা বটে, কিন্তু যেখানে 'কিছুনা' থেকে 'কিছু' সৃষ্টির প্রশ্নে সেখানে তার কোন হাত নেই। সে নিজের জীবন যাপন আত্মরক্ষা এবং আত্ম উন্নয়নের রীতি নির্ধারণ ও উপায় অবলম্বন করতে পারে মাত্র। প্রত্যেকটি জীবন দর্শনই মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্ম উন্নয়নের সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারে নিজ বিশিষ্ট সমাধান দিয়ে থাকে। অবশ্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যা, পৃথিবীর সব মানুষের সাধারণ সমস্যা। বিভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের দর্শনে মতবাদে এবং বিভিন্ন জীবন যাপন পদ্ধতিতে যে বিরোধ বা সংঘাত দেখা দেয়, তা এসব মৌলিক প্রয়োজনের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি নিয়ে নয়, বরং এসব মৌলিক সমস্যার সমাধানের পন্থা নেই। অন্যান্য বিশিষ্ট মতবাদের মত ইসলামেরও এসব জীবন সমস্যা সমাধানের নিজস্ব রীতিনীতি রয়েছে। 'রব' এর পথ পদ্ধতি তথা ইসলাম নীতি বিধান বিশ্ব প্রকৃতির বিকাশ ধারা বিধৃত হয়েছে এবং আল-কুরআন মারফত অবতীর্ণ হয়েছে। (আবুল হাশেম, সমাজ পূনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ,' ইসলামীক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ.৪০।)

১৩. আল-কুরআন, ২:৪০

১৪. আল-কুরআন, ২:২৯

১৫. আল-কুরআন, ১৩:১১

১৬. আল-কুরআন, ২:১৭৭

১৭. আল-কুরআন, ২:২৯

১৮. আল-কুরআন, ৬২:৭

১৯. আল-কুরআন, ৪:১৩৫

২০. সৈয়দ কুতুব, 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার', ইসলামের আহবান, ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৩৪

২১. আল-কুরআন, ১০০:৮

২২. সৈয়দ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

২৩. আল-কুরআন, ৫৯:৭

২৪. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেসন্স, রাজশাহী-১৯৯৬, পৃ. ৪৩-৪৪

২৫. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মহানবীর (স.) অর্থ প্রশাসন, অগ্রপথিক, সিরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা-১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬, পৃ. ২৩০

২৬. আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্যে; ঋণগ্রস্তদের জন্যে; আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসফিরদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।" (৯ঃ৬০)

২৭. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ২৫০

২৮. আল-কুরআন, ২:২৪৫

২৯. আল-কুরআন, ২:২৬২, ৬৫, ৭১, ৬১

৩০. আল-কুরআন, ২

৩১. আল-কুরআন, ২:২৯

৩২. সৈয়দ সুলায়মান নদভী (অনুবাদ আবদুল মান্নান তালিব), 'শাশ্বত নবী' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ৩৩

৩৩. উদ্ধৃতঃ এ কে ব্রোহী,'ইসলামী জীবনের আদর্শ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬,পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩৪
৩৫. মুহম্মদ তাইয়্যেব (অনুবাদ, মাওলানা আলী আকবর হামিদ), মানবতার বৈশিষ্ট্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ .৪
৩৬. আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী, (অনু.) ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ২২২
৩৭. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৪৪
৩৮. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭
৩৯. আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ, 'ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক ও সরকার', ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৮৭
৪০. ইমাম আবু ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৪১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৪২. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৪৩. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৪৪. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৪৫. আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৪৬. তারিখে তাবারীর বরাতে, মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৪৭. হযরত আলী (রা.) "প্রশাসনের মূলনীতি" (অনু. খালেদ চৌধুরী), ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ১৭-৩৫ দ্রষ্টব্য
৪৮. মোহাম্মদ আজরফ, ইসলাম ও মানবতাবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ১১৭
৪৯. P. K. Hitti, History of the Arabs, London, P. 206
৫০. Ibid, P. 208
৫১. Ibid, P. 209
৫২. Ibid, P. 213
৫৩. William Muir, Caliphate, Its Rise, Decline & Fall, Edinburgh-1934, P. 509

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজকল্যাণের বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজকল্যাণের ইতিহাস ঃ

বহুজাতি, ধর্ম ও বর্ণের লোকের আবাসস্থল হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশ এক বৈচিত্রপূর্ণ দেশ। অতীতের ভারতবর্ষের (বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার ও অন্যান্য এলাকা বিস্তৃত) সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিচিত্র ও বহুজাতিক চরিত্রের সমন্বয় ছিল। সুদূর অতীতের ভারতবর্ষের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিবর্তনে সুদূর অতীতের চিন্তাধারা ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। তবে মানবপ্রেম, ধর্মীয় অনুশাসন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাই যে সমাজকল্যাণের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।[১] ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী সময়কে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এ তিন যুগে বিভক্ত করা যায়। এ যুগগুলোতে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এক তাৎপর্যময় স্থান অধিকার করে আছে।

প্রাচীন ভারতের সমাজকল্যাণ ঃ

সুদূর অতীতকাল হতে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে প্রাচীন যুগ বলা হয়। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্য ছিল। ফলে এ সমস্ত ধর্মের অনুশাসন ও প্রেরণা সেখানকার সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার সূচনাকে প্রভাবিত করেছে। মূলত উক্ত ধর্মসমূহের অনুশাসন ভিত্তিক মূল্যবোধ, মানবপ্রীতি ও সহযোগিতামূলক প্রেরণা থেকে সৃষ্ট দানশীলতা, আর্তের সেবা, অন্নহীনে অন্ন দান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান, আশ্রয়হীনে আশ্রয় দান ছিল তখনকার সমাজ কল্যাণের ভিত্তিস্বরূপ। আর এ ধরনের ব্যবস্থা কখনও পরিচালিত হয়েছে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, কখনও বা পরিচালিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।[২] ভারতীয় উপমহাদেশের সুপ্রাচীনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষে দানশীলতার (Charity) মধ্য দিয়ে সমাজকর্মের সূচনা হয়। পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে একে অপরের ভালমন্দে এগিয়ে আসে, প্রাতিষ্ঠানিক কল্যাণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিবারের ভূমিকাই ছিল প্রধান। পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম, বিধবা এদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা পরিবারের মাধ্যমেই সম্পাদিত হত। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা চালু থাকায় এ ধরনের নিরাপত্তা দানে পরিবারের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ছিল। এ ছাড়াও স্বচ্ছল পরিবার তাদের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায়ও ভূমিকা পালন করত। গ্রামের পঞ্চায়েত নামক একটি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানও গ্রামের রুগ্ন, অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্তদের সেবায় কাজ করত। সে সময়কার নিয়মানুযায়ী পরিবার প্রধান, গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরাই নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করত।[৩]

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ধর্মকে আশ্রয় করেই মুখ্যত সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের বিকাশ ঘটে। ধর্ম ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজা, ধনী ব্যক্তি, ভূমিপতি ও ধর্মপ্রাণ মনীষীরা মানবসেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে এবং সমাজবাসী সকলেই পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতায় নিজেদের অভাব পূরণে সচেষ্ট হয়েছে। এ পর্যায়ে সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের ধরন ছিল সন্ন্যাসীর আশ্রম নির্মাণ, জীবনযাত্রা নির্বাহে তাদের ভাতা দান, সন্ন্যাসীর আবাসস্থল নির্মাণ এবং ছত্রছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

অসহায় মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের সাহায্য দান মূলক ব্যবস্থা।[৪] ধর্ম বদান্যতা ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাকে উৎসাহিত করেছে। দুঃস্থদের খাদ্য ও সাহায্য দান একটি ধর্মীয় কর্ম হিসেবে বিবেচিত হত। ধর্ম মন্দির আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিয়েছে। জনসমষ্টির সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অসহায়দের প্রয়োজন মুকাবিলার ব্যবস্থা করত। যৌথ পরিবারের মাধ্যমে পঙ্গু ও মানসিক বিপর্যস্তরা সাহায্য লাভ করত। ব্যক্তিগত সাহায্য লাভের প্রয়োজন পূরণ ছিল বর্ণপ্রথা ও জনসমষ্টি পরিষদের দায়িত্ব। এ সময়ে সামন্তবাদী অর্থ ব্যবস্থায় নিয়োজিত সামন্ত কর্মীদের সামন্ত রীতিতে দেখাশুনা করা হত।[৫] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে গ্রামের জনগণ যৌথভাবে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে যে কোন গঠনমূলক কাজে জড়িত হত। গ্রাম পঞ্চায়েত বালকদের তত্ত্বাবধান এবং বৃদ্ধ ও রুগ্ন এদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিতে জড়িত ছিল।[৬] গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা গ্রামের অভিভাবক ছিল। সামাজিক সংহতি ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণে গ্রামের প্রধান 'গ্রামীন' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতেন। গোত্রীয় ব্যবস্থায় গোত্রপ্রধান গোত্রভুত বিভিন্ন সমস্যাদি নিরাময়ে সচেষ্ট হতেন।

বৈদিক যুগের সমাজ ছিল মুখ্যভাবে পরিবার কেন্দ্রিক। ফলে সমাজের উন্নতি-অবনতি পরিবারের কার্যাবলীর উপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। পরিবার শিশু, বৃদ্ধ, অসহায়, বিধবা, পঙ্গু, অসুস্থ ও অপরাপর নির্ভরশীল লোকজনের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত। অবিবাহিত মেয়েরাও পিতা অথবা তার অবর্তমানে বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকত। বিয়ের সময় মেয়েদের নিরাপত্তা হিসেবে দেয়া হত উপঢৌকন বা যৌতুক। সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিধানে পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত গ্রামসমূহের একটি ভূমিকা ছিল।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে সমাজসেবার একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হত। হিন্দুশাস্ত্র মতে দানশীলতা হল তিন রকম। তাহল- অর্থদান, অভয়দান ও বিদ্যাদান। এসব দানের মধ্যে বিদ্যা দান হল সর্বোৎকৃষ্ট। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণদের অবৈতনিক বিদ্যাদান (Free education) কে সমাজকর্মের গুরুত্বপুর্ণ ধরন হিসেবে বিবেচনা করা হত। ব্রাহ্মণ বা বিজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ বিদ্যাদানকে ধনী-গরীব সকলে অনুপ্রেরণা যোগাতো। ধনীরা এবং কোন কোন শিক্ষাগুরু সেজন্য শিক্ষাদানের আশ্রম বা মঠ নির্মাণ করত।[৭] সে সময়েই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাগুরুরা তক্ষশীলা, বানারসী ও নালান্দা প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এসব কেন্দ্রসমূহে তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীরা শিক্ষা দান করতেন। এর মধ্যে একমাত্র তক্ষশীলাতেই চতুর্থ শতাব্দীর ব্যাকরণ বিশারদ পাণিনি, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ কৌটিল্য, মধ্যযুগীয় ভারতের বিজ্ঞান বিশারদ চন্দুরকার প্রমুখের মত জ্ঞানী-গুণীদের বসবাস ছিল।

প্রাচীন ভারতের সমাজ সেবামূলক তৎপরতার উন্মেষ-বিকাশে ধর্ম প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। ধর্মগ্রন্থ বেদ ছিল জ্ঞান অর্জনের মুখ্য উৎস। ফলে বেদান্ত নির্দেশনা মানবীয় চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণকে কল্যাণমুখী ধারায় প্রবাহিত করেছে। ভারতের সমাজকল্যাণের ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বদান্যতা নির্ভর সেবা দানের কেন্দ্র হিসেবে মঠ ও আশ্রম সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এসব কেন্দ্র ছিল একদিকে শিক্ষা দানের এবং অপরদিকে মানবতার সেবায় উৎসর্গিত। মধ্যযুগীয় পর্যায়ে এসে অনেক মঠই বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে এবং হিন্দু দর্শন, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়সমূহ পড়ানোর ব্যবস্থা নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হিসেবে সমাজসেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নজিরও প্রাচীন ভারতে লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক পন্ডিত কৌটিল্য লিখিত অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, 'প্রজাদের সুখই রাজার সুখ, তাদের কল্যাণই তার কল্যাণ এবং রাজা এতিম, বৃদ্ধ, অক্ষম, ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন।[৮] রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাজ সেবামূলক তৎপরতায় প্রকৃষ্ট নিদর্শন মিলে অশোক ও হর্ষবর্ধণের রাজত্বকালে। বৌদ্ধধর্মের পাকাপোক্ত অনুসারী মানবপ্রেমিক অশোক প্রজাদের মঙ্গল নিয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। তিনি তার সাম্রাজ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। পথিকদের বিশ্রামের জন্য বড় বড় বৃক্ষরোপন ও বিশ্রামাগার স্থাপন করেন এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্য অসংখ্য কুপ খনন করেন।[৯] প্রাচীন যুগে সমাজবোর ইতিহাসে বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য সম্রাট হর্ষবর্ধনের নাম অবিস্মরণীয়। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, হর্ষবর্ধন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সর্বাত্মক সচেষ্ট ছিলেন। তিনি প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য ছদ্মবেশে রাজ্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর আমলে করভার ছিল লঘু এবং প্রজাসাধারণও বসবাস করত সুখে শান্তিতে। হর্ষবর্ধন পাঁচ বছর পর পর যাবতীয় উদ্বৃত্ত সম্পত্তি আনুষ্ঠানিকভাবে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে দান করে দিতেন। তাঁর সময়ে রাজ্যের সর্বত্র চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১০] হর্ষবর্ধনের পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদের আগমন পর্যন্ত সমাজসেবার তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। বরং সে সময় হতে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব সমাজ জীবনে ব্যাপক হয়ে উঠলে বর্ণভেদ প্রথার বেড়াজালে সামাজিক জীবনযাত্রা আরও জটিল হয়ে উঠে।

উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাবঃ

আরবদেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়াতে এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যের চাবিকাঠি ছিল আরবদের হাতে। ভারতীয় উপকূলীয় বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। যে সকল ভারতীয় বন্দরে আরবদের যাতায়াত ছিল সৈয়দ সুলায়মান আলী নদভী তার একটি জোরালো বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে "আরবরা কাশাবাতে আসত পারস্য উপসাগারের পারস্য উপকূল ধরে এবং তারপর তায়েয নামক বেলুচিস্তানের একটি বন্দরে প্রবেশ করত। তারপর তারা সিন্ধুর বন্দর থাথ এ আসত, তারপর গুজরাট ও কাথিয়াবারের বন্দর সমূহে ভিড়ত। যথাঃ খানা, খামরায়াত, সানবারা, চেমূর, বাহারোচ, ভারহুত, গান্ধার, ঘোঘা, সুরাট; অতঃপর যেত মাদ্রাজ প্রদেশের বন্দরসমূহে, যথাঃ মালাবার করোমন্ডল (মালাবার) কেপকেমোরিন (কুমার), ত্রাভাঙ্কুর (কুলুম), ম্যাঙ্গালোর, চালইয়াট, পিন্ডারাণী, চান্দ্রাপুর, হানুর, দেফাতান, কালিকট ও মাদ্রাজা এবং তারপরে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করত। এখানে তাদের কেন্দ্র ছিল সিলেট। একে তারা বলত সিলাহাত। তারপর তারা যেত চট্টগ্রাম, একে বলত সাদজাম, এখান থেকে শ্যাম হয়ে জীন সাগরে প্রবেশ করত। তাদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল গুজরাট ও সিন্ধু। বাহরোচ থেকে তারা লাক্ষা ও নীল নিত। মাদ্রাজে তৈরী তোষক তারা মিশরে গিয়ে বিক্রি করত। পারস্য উপসাগরের একটি প্রাচীন বন্দরের নাম

Dhaka University Institutional Repository

ছিল 'ওবুল্লা' এটি ছিল পারস্যের নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র। এই বন্দর থেকে মালামাল ও বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে জাহাজ হিন্দুস্তান ও চীনে যেত।[১১]

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যাবহিত সময় পর্যন্ত সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারত এবং পশ্চিম এশিয়ার (আরবসহ) মধ্যে সম্পর্ক অব্যাহত ছিল বলে আর্থারজেফারীও মন্তব্য করেন। এরূপ ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সময়ও ভারতবর্ষে আরবদের গমনাগমন অব্যাহত ছিল। কে.এস.লালের মতে, "With the rise of Islam Persians and Arabs (now turned) Muslim maritines entered into the inhabitance of their predecessors."[১২]

এসময় ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক বিষয়টি সম্পর্কের ক্ষেত্র নির্ধারিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তবে মহানবী (স.)-এর আমলে আরব মুসলমানগণ ভারত অভিযান প্রেরণ করেছিলেন কিনা এমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তার বক্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ভারত বর্ষ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি 'হিন্দ' বা 'সিন্ধ' এর কথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন- ভারতের আদর্শিক বিজয় সম্পর্কে সাহাবী হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (স.) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে দুটি সেনাদলকে আল্লাহতাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দিবেন। তার মধ্যে একটি হিন্দ অভিযানকারী সেনাদল। আরেকটি মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা (আ.) এর সহযোগী সেনাদল।"[১৩] হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছেঃ "রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। তাই সে সময় যদি আমি জীবিত থাকি তবে অবশ্যই আমার ধন-সম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হব না। সেখানে আমি নিহত হলে শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করব আর যদি মঙ্গল মত ফিরে আসি তবে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি পাব।"[১৪]

এছাড়া এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, মহানবী (স.) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য লাভ করেছেন এবং ভারতীয় কুঞ্জের রাজা শরবতক তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন।[১৫] কে.এ. নিযামী বলেছেন-"হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের আগেই ভারত ও আরব উভয় অঞ্চলে পরস্পরের উপনীবেশ বসতি গড়ে উঠেছিল। দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ থেকে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছে। এ যোগাযোগ ও সম্পর্কের কারণেই হযরত মুহাম্মদ (স.) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য পেয়েছিলেন এবং একজন ভারতীয় রাজা তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন বলেও জানা যায়।"[১৬] এমনকি মহানবী (স.)-এর পত্নী হযরত আয়িশা (রা.) চিকিৎসার জন্য ভারতীয় চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে ইমাম বোখারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, হিন্দ শব্দটি আরবদের দেয়া। ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন সিরাজ 'বরহিন্দ' বলতে উত্তর বাংলাকে বুঝিয়েছেন।[১৭] তিনি বলেছেন, "বিশাল সাগর মহাসাগরে আরবগণ জাহাজে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে যখনই এই দেশের লাল মাটি লক্ষ্য করত তখন, 'বরহিন্দ' বা 'বরহিন্দি' বলে চিৎকার করে উঠত। তখন থেকেই এ নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। আরবীয় বররি শব্দের অর্থ স্থল ভূমি।"[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

ড. তারা চাঁদ আরব, ফিলিস্তিন ও মিসর প্রভৃতি পশ্চিমী দেশ সমূহের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটি প্রাচীন পটভূমি তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন-"সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব এবং একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অধীনে তাদের ঐক্য ইসলাম পূর্বকাল থেকে সূচিত সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া তীব্র গতি সঞ্চার করে। মুসলিম বাহিনী দ্রুত সিরিয়া ও পারস্য দখল করে এবং ভারত সীমান্তে অভিযান শুরু করে। মুসলিম বণিকরা অনতি বিলম্বে পারসিকদের নৌ-বাণিজ্যের উত্তরাধিকারে প্রবেশ করেন এবং আরব নৌ-বহর ভারত সাগরে দ্রুত ধাবিত হয়। আরব নৌ-বহর লোহিত সাগরের উপকূল থেকে অথবা দক্ষিণের উপকূলে যাত্রা শুরু করত। তাদের লক্ষ্য থাকত সিন্ধুর নদের মুখে ও উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে ক্যাম্বে উপসাগরের অথবা মালাবার উপকূলে মাল খালাস করা, যাতে কৌলমসহ সরাসরি অন্যান্য বন্দরে পৌঁছে যাবার জন্য মৌসুমী বায়ুর সহায়তা পেত। পারস্য উপসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে বাণিজ্য জাহাজগুলো মৌসুমী বায়ুর সাহায্যে একই পথে কৌলম, মালয় উপদ্বীপ, পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনে পৌঁছে যেত। খলিফা উমর (রা.) এর শাসনামলে ৬৩৬ খ্রী. মুসলিম নৌ-বহর ভারতীয় পানি এলাকায় উপনীত হয়, তখন বাহরায়েন ও ওমানের শাসক (গভর্নর) ছিলেন উসমান শফিকী। তিনি সমুদ্র পথে তানাতে সৈন্য প্রেরণ করে খলিফা কর্তৃক তিরস্কৃত হন।"[১৯]

খলিফা উমর (রা.) এর শাসনামলে ভারত অভিমুখী স্থল পথে আবিস্কারের বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা শেষ পর্যন্ত অষ্টম শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। এসময় নৌ-বাণিজ্য অব্যাহতভাবে চলছে। মুসলমানগণ ভারতের দক্ষিণ উপকূলের তিনটি শহর ও সিংহলে তাদের বসতি স্থাপন সম্পন্ন করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর পরে পারসিক ও আরবীয় বণিকগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে বিপুল সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেন এবং স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে শুরু করেন। এ ধরনের বসতি স্থাপন মালাবার উপকূলেই খুব ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য। মনে হয় বন্দর এলাকায় বিদেশী বণিকদের বসতি স্থাপনের উৎসাহ দানের নীতি অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। যেমনঃ সিংহলের রাজা উপহার স্বরূপ হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে কতিপয় মুসলিম বালিকা প্রেরণ করেন যারা তাঁর দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিল। এসব অনাথ বালিকা ছিল সেখানকার মৃত মুসলিম বণিকদের কন্যা।"[২০] আরবীয় নৌ-বহর অষ্টম শতাব্দীর ব্রোচ ও কাথিওয়ার উপকূল বন্দর আক্রমন করে। তাঁদের বাণিজ্য ও বসতি স্থাপন ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। বসতি স্থাপনের পরেই তাঁরা ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদের প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকে। নবম শতাব্দী শেষ হবার আগেই তাঁরা ভারতের পশ্চিম উপকূলের সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হন।

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের মধ্যে সংঘাত চলছিল। নব হিন্দু মতবাদ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিকভাবেও সেটা ছিল স্থিতিহীনতা ও উত্থান পতনের যুগ। চের রাজ বংশ ক্ষমতা হারাচ্ছিল, আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছিল নতুন রাজবংশ। স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণের মানসিক অবস্থা তখন অস্থির ছিল। নতুন ধারণা গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মানসিকতা ছিল উন্মুখ। এ সময় দৃশ্যপটে আসে ইসলাম, তার সরল বিশ্বাস, অনাবিল আদর্শ ও মানবতার মুক্তির সওগাত নিয়ে। ফলে এর প্রভাব হয় অতিবিস্ময়কর। চেরুমল পেরুমল বংশীয় শেষ রাজা নবধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন। জানা যায় যে, তিনি এক স্বপ্ন দেখে এই নবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন- যেন চাঁদ দুই খন্ড হয়ে যাচ্ছে। এর অব্যাবহিত পরেই সিংহল থেকে প্রত্যাগত একটি মুসলিম ধর্ম প্রচারক দলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দলের নেতা শায়খ সিককে উদ্দীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। তিনি রাজাকে ইসলামের দীক্ষা দেন এবং তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান সামরী। দীক্ষা গ্রহণের পর রাজা মালাবার ত্যাগ করে আরবের শহরে উপনীত হন এবং চার বছর পর সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখান থেকে মালিক বিন দীনার, শরীফ ইবনে মালিক, মালিক ইবনে হাব্বি ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে চিঠি দিয়ে মালাবার প্রেরণ করেন। সেই চিঠিতে তিনি তাঁর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ও মুসলমানদেরকে কিভাবে সংবর্ধনা দিতে হবে তার নির্দেশ দেন।[২১] উপরন্ত আলী রাজা নামের একটি মুসলিম পরিবার কোলাত্তিরি রাজাদের মন্ত্রী ও নৌ সেনাপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তী শতাব্দী সমূহে ইসলামের প্রভাব অপ্রতিহতগতিতে বৃদ্ধি পায়। মাসুদী, সুলায়মান, আবুল ফিদা, ইবনে বতুতা প্রমুখ মুসলিম পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনায় তা পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলের মুসলমানগণ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের আগমন অষ্টম শতকের প্রথম দিকেই ঘটেছে। দশম শতাব্দীতে পূর্ব উপকূল এবং তুলনামূলকভাবে অতি অল্পসময়ে সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। একদিকে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় শাসকদের মন্ত্রী, নৌ-সেনাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রদূত ও রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদার হন, অন্যদিকে তারা অনেক লোককে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন। নিজেদের ধর্মমত প্রচার করেন। মসজিদ ও সমাধি স্তম্ব নির্মাণ করেন যেগুলি পরবর্তীতে দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকদের কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায়ই সমুদ্র পথে আগত বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম ভারত উপমহাদেশে পৌঁছে এবং তাঁর জীবদ্দশায় ইসলাম আরবের বাইরে বিস্তার লাভ করেনি- এমন ধারণাও পোষণ করার মত অবকাশ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

জলপথের ন্যায় স্থলপথেও এ উপমহাদেশে মুসলিম প্রচারকদের আগমন ঘটে। স্থল পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে তারা এদেশে আগমন করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে হিজরী ১৪/৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিক বালাজুরীর 'ফুতুহুলবুলদান' গ্রন্থের সূত্র ধরে আব্দুল গফুর বলেছেন "উসমান ইবন আবুল আবী সাকাফী তাঁর ভ্রাতা মুগিয়া সাকাফী, হারেস বিন মুররি আবদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধুর সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন। ৪৪ হিজরীতে (৬৬৬ খ্রী.) মুআবিয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবন আবূ সুফুরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী 'বানা' ও 'আহওয়াজ' নামক স্থানে পৌঁছেন। মুহাল্লাবের পরে আব্দুল্লাহ ইবনে সাওয়ার, রাশেদ ইবনে আমর জাদীদী, সিনান ইবনে সালামাহ্, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুনজির ইবন জারুদ আবদী কয়েকবার সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন।"[২২] অবশেষে খলিফা ওয়ালিদের সময় ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তরুণ ও সুদক্ষ যোদ্ধা মুহাম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে একটি অভিযানের আয়োজন করেন। তিনি সমুদয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সিন্ধু জয় করেন এবং মুলতান ও সিন্ধুকে সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর অভিযান সমাপ্ত করেন। এ অভিযানে তিনি চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যের সাহায্য পান। তিনি যখন পুরণো ব্রাহ্মণ্যবাদ জয় করেন তখন তাঁর পক্ষে 'সারওয়ান্দার' মুসলিম অধিবাসীগণ যোগ দিয়েছিলেন।[২৩] মুহাম্মদ বিন কাশিম নতুন জনপদ জয় করে সেখানে একজন শাসক নিয়োগ করেন। তিনি দেবল (করাচী) জয় করে মসজিদ নির্মাণ করেন, সেখানে চার হাজার মুসলমানের বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের অনেককে জায়গীরও দান করেন।[২৪]

আবার মুসলিম সেনারা যেখানেই অভিযান পরিচালনা করেছেন কিংবা মুসলিম বণিকরা যেখানেই বসতি নির্মাণ করেছেন সেখানেই মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ উপস্থিত হয়েছে। আবূ হিফাম বিন সাহিব আল আদাবী আল বসরী সিন্ধু আসেন এবং সেখানেই ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মনসুর হাল্লাজ নৌ-পথে ভারতে আসেন দশম হিজরীতে। তিনি স্থলপথে উত্তর ভারত ও তুর্কিস্তান হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। একাদশ শতাব্দীতে সহযাত্রী একদল দরবেশ নিয়ে বাবা রিহান বাগদান হতে ব্রোচে আসেন। নূর আলদীন বা নূর সতাগর (১০৯৪-১১৪৩ খ্রী.) গুজরাটের কুনবী, খাবভাস ও কোরীদের ইসলামে দীক্ষিত করেন। 'কাশফুল মাহযুব' গ্রন্থের প্রণেতা আলী বিন উমান হুজরী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ ভ্রমণ করে লাহোর চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। একাদশ শতাব্দীতে আসেন শায়খ ইসমাইল বোখারী। দ্বাদশ শতাব্দীতে আসেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুনতিক-উত-তায়ির' ও 'তাযকিরাতুল আউলিয়া'র লেখক ফরিদ উদ্দিন আত্তার। খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী আজমীরে আসেন ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১২৩৪ খ্রী. সেখানেই ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম অবধারিতরূপে একটি প্রচারমূলক ধর্ম মত। আর বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি মুসলমান এক একজন প্রচারক। তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়ায় ইসলাম প্রচার করে সকল প্রকার অংশীবাদী পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করা এবং মানব সমাজকে ইসলামের মূলনীতি তাওহীদের আওতায় এক অবিচ্ছিন্ন ভাতৃ সমাজে পরিণত করা। মূলত এ আদর্শের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই আরব মুসলমানগণ নবীর (স.) ইন্তি কালের পরপরই নিজেরদের আবাস ভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন বিশ্বের নানা অঞ্চলে বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে। তাঁদের একান্ত প্রচেষ্টার ফলেই উপমহাদেশে ইসলাম বিজয়ী একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

মধ্যযুগে বা মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের সমাজকল্যাণ ঃ

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এক নবতর অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রকট বর্ণভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও এর আক্রমণাত্মক প্রভাব প্রভৃতি কারণে বৌদ্ধ ও নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায় সিন্ধু আক্রমণকারী আরবদের (৭১২ খ্রী.) স্বাগত জানায় এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ ইসলামের সুমহান আদর্শ, সহজ-সরল রীতি-নীতি, সহিষ্ণুতা ও উন্নত সমাজব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আরব বণিক, ধর্মপ্রচারক, পীর-দরবেশ, শাসকবর্গ প্রমুখ উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় সুদীর্ঘ ৮শ' বছর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে। মধ্যযুগে সুলতানী (তুর্কী আফগান) ও মুঘল এ দু'ধরায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং এতে ইসলামী মূল্যবোধের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[২৫]

মধ্যযুগে সরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে যাদের অবদান অবিস্মরণীয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬-১০ খ্রী.)। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নিঃস্বার্থভাবে সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত হন। হাসান-উন-নিজামী বলেন, "He dispensed evenhanded justice to the people and exerted hismelf to promote the peace and prosperity of the strain.[২৬]

মধ্যযুগে সরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-৩৬ খ্রী.)। সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রাজপ্রসাদে ঘন্টা স্থাপন, শিক্ষা ও শিক্ষিতদের পৃষ্ঠপোষকতা, দিল্লীতে কলেজ নির্মাণ ও নাসিরিয়া মাদ্রাসা স্থাপন, বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও বন-জঙ্গল অপসারণ।[২৭]

মধ্যযুগে সরকারি সমাজ সেবার ক্ষেত্রে নাসিরউদ্দিনি মাহমুদও (১২৪৬-৬৬) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাঁর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, মসজিদ,

Dhaka University Institutional Repository

সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। গিয়াসউদ্দিন বলবনের (১২৬৬-৮৭) অবদানসমূহ হচ্ছে- সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দূর্নীতি ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ইসলামী শরিয়াত প্রবর্তন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি।[২৮]

মধ্যযুগের সরকারী সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন আলাউদ্দীন খিলযী (১২৯৬-১৩১৩)। সমাজকল্যাণে তাঁর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে ভূমি জরিপের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য যেমন- গম, যব, ধান, ডাল, চিনি, মাছ, মাংস, তেল, লবণ, পশু প্রভৃতির মূল্য নির্ধারণ, সরবরাহ ও পরিবহন এবং খামার ও বাজার প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্যোগের সময় পণ্যের বরাদ্দ নির্ধারণ (rationing) যা প্রতিভাবান শাসকের সমাজকর্মে এক অভিনব উদ্ভাবন। খাদ্য ঘাটতি মুকাবিলায় গুদাম নির্মাণ ও খাজনার পরিবর্তে শস্য সংগ্রহ, চোরাচালান রোধ, মদ্যপান, মাদকদ্রব্য, পতিতাবৃত্তি, ব্যাভিচার প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ কঠোরভাবে দমন, শিল্প সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার সম্প্রসারণ, মসজিদ, প্রসাদ, সরাইখানা, বাঁধ, মিনার প্রভৃতি নির্মাণ ও পুরাতন স্থাপত্যের সংস্কার সাধন।[২৯]

মধ্যযুগের সরকারী সমাজ সেবায় গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-২৫ খ্রী.) ও মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-৫১) উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। সমাজকর্মে তাঁদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হল- কৃষি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থা, খাল-খনন, পতিত জমি আবাদকরণ ও ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন, রাজস্ব সংস্কার ও জায়গীরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আনয়ন, দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা মওকুফকরণ, রাজপথ, সেতু ও বাগান নির্মাণ, দরিদ্রদের জন্য বৃত্তি প্রদান, জনবিরোধী প্রথা ও আইন-কানূন বিলোপ সাধন এবং মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ, পুলিশ বিভাগ সংস্কার ও দুর্বৃত্তদের থেকে জনগণকে রক্ষাকল্পে দূর্গ নির্মাণ, ইয়াতিম, অসহায়, দুস্থ প্রভৃতি শ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ, জনগণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান, কৃষি উন্নয়নে 'দিওয়ান-ই-কোহি' নামে পৃথক বিভাগ সৃষ্টি, পতিত জমি আবাদকরণ, কৃষকদের 'তাকাভী' ঋণদান, দুর্ভিক্ষকালে দুস্থদের সাহায্য দান প্রভৃতি পদক্ষেপ নেয়া হয়।[৩০]

সরকারী সমাজসেবায় ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮ খ্রী.) এর অবদানও কম নয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রদক্ষেপসমূহ হল কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সেচের ব্যবস্থাকরণ, সুদীর্ঘ ৪টি খাল ও ১৫০টি কুপ খনন, পতিত ও অনাবাদি জমি আবাদকরণ, কৃষি ঋণ ও অন্যান্য কৃষি সহায়তা প্রদান, ২৩ প্রকার কর রহিতকরণ ও অনেক পীড়াদায়ক কর থেকে অব্যাহতি প্রদান, কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক মাত্র ৪ প্রকার করারোপ খারাজ, খুমুস, জিজিয়া ও যাকাত, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণে আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক প্রত্যাহার, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, রাজপথ ও সেতু নির্মাণ, বেকার সমস্যা সমাধানে 'চাকরি দপ্তর' (Employment Bureau) প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র কন্যাদের বিবাহ এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণ-পোষণে 'দিওয়ান-ই-খয়রাত' বিভাগ স্থাপন, চিকিৎসালয় (দারুস সাফা), হাসপাতাল নির্মাণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান, শিক্ষা বিস্তারে ৩০টি কলেজ, বহু মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় স্থাপন, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা, ৩০০ সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ, বিচার ব্যবস্থা সংস্কার ও অঙ্গহানি রহিতকরণ। শাস্তি প্রদানের চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেন, যা আধুনিক সমাজকর্মের 'অপরাধ সংশোধন' কার্যক্রমের সাথে তুলনীয়, পর্যটকের জন্য ২০০ সরাইখানা এবং ১০টি স্নানাগার নির্মাণ ও খাবারের সুব্যবস্থা, চিত্তবিনোদনের জন্য ১,২০০ বাগান নির্মাণ ও ৩০টি বাগান সংস্কার, সৈনিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ, ফিরোজবাদ, জৌনপুর, ফাতেহাবাদ প্রভৃতি বহু শহর প্রতিষ্ঠা, প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও সংস্কার এবং পূর্ত বিভাগ স্থাপন এবং ক্রীতদাসদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'দেওয়ান-ই-বন্দেগাণ' বিভাগ স্থাপন, ১,৮০,০০০ দাসদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে কারিগর, পাহারাদার প্রভৃতি কাজে নিয়োগ ইত্যাদি।[৩১]

সুলতানী আমলের অবসানের প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মুঘল সম্রাটগণ সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেননি। তবে সম্রাটগণ ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করায় সকল ধর্ম ও বর্ণের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। জনকল্যাণে শেরশাহের অবদান অসমান্য। তিনি মাত্র পাঁচ বছর শাসন করে মধ্যযুগে ভারতের সমাজসেবার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্বল ভূমিকা পালন করে গেছেন। শেরশাহ বলতেন, "The essence of royal protection consists in protecting the life and property of the subjects. they (kings) should use the principles of justice and equality in all their dealings with all classes of people. He patronised art and letters and help the poor and the need."[৩২]

শেরশাহ প্রজাদের নিরাপত্তা, তাদের নৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করাই প্রধান রাজ কর্তব্য বলে মনে করতেন। সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যকে ৪৭টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। শেরশাহ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো-ভূমি জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণ ও প্রজাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন, প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় রাজস্ব মওকুফ ও সরকারী ঋণ কবুলিয়ত (কৃষকদের থেকে) ও পাট্টা (কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার করে সরকার) প্রথার প্রচলন, অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ বাহিনী গঠন এবং অপরাধ দমনে স্থানীয় দায়িত্ব নীতি অবলম্বন, নৈতিক উন্নতি বিধান ও অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে 'মুহতাসিব বিভাগ প্রতিষ্ঠা', আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তন ও নিরাপত্তা বিধান, যাতায়াত ব্যবস্থা সম্প্রসারণে বাংলায় সোনারগাঁও থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত ১,৫০০ ক্রোশ বিস্তৃত গ্রান্ড ট্রাংক রোডসহ অন্যান্য দীর্ঘ ও প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ, রাস্তার পাশে ফলবান ও ছায়াবৃক্ষ রোপণ এবং সরাইখানা ও মসজিদ নির্মাণ ও কুপ খনন। প্রায় ১,৭০০ সরাইখানায় হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক ব্যবস্থা ছিল, যোগাযোগের সুবিধার্থে ডাক ব্যবস্থার সংস্কার, দুস্থ ও নিঃস্বদের জন্য 'লেংরে ফুকায়া' স্থাপন। প্রতিটি লঙ্গরখানায় বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ৮০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা (আশরাফী), আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক রহিত করে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তারে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও মাদ্রাসা) স্থাপন ও ছাত্রদের বৃত্তিদান, স্থানীয় শাসনের জন্য পঞ্চায়েত গঠন, সর্বজনীন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সুচিকিৎসার্থে হাসপাতাল স্থাপন, সামরিক সংস্কার ও অশ্ব চিহ্নিতকরণ এবং ঘোড়ার ডাক প্রথা প্রচলন, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ সাধন প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

শেরশাহ প্রবর্তিত শাসন ও সংস্কার ব্যবস্থা ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ঐতিহাসিক Keene বলেন, "No Government, not even the British Government has shown so much wisdom in administration as this Pathan."[৩৩] ড. কে. কে. দত্ত বলেন, "He (Sher Shah) wanted to build his greatness on the happiness and contents of his subjects."[৩৪]

শেরশাহের পর পুনরায় ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুঘল শাসক আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রজা সাধারণের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৩৫] সম্রাট আকবর সমাজ সেবায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন, যেমন- কৃষি উন্নয়নে জায়গীর প্রথা বিলোপ সাধন করে সমস্ত জায়গীর খাস করেন, হিন্দুদের তীর্থ ও জিজিয়া কর রহিত করেন। এছাড়াও তিনি বহুবিধ কর ও ফি রহিত করেন। যুদ্ধবন্দীদের দাস করার পূর্ব রীতি নিষিদ্ধ ও বিজিত সৈনিকের পরিবারের প্রতি নির্যাতন বন্ধের আদেশ দেন। জমির উৎপাদন ক্ষমতানুযায়ী কর নির্ধারণ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কর হ্রাস বা মওকুফ করেন। সকল জাতি ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণীকে একইসূত্রে গ্রোথিত করার প্রচেষ্টা চালান।

সমাজকল্যাণে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর সমাজ সেবায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুঃস্থ ও দরিদ্রদের জন্য দান খয়রাত ইত্যাদি। পত্নী নুরজাহান কর্তৃক শিশু ও নারীকল্যাণ পদক্ষেপ গ্রহণ, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, বন্দীদের ক্ষমা প্রদর্শন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সমাজ সেবায় তার অবদান হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি বিধানে বহু স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন, নিরাপত্তা, শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংগীত ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা, স্থাপত্য শিল্পে চরম উৎকর্ষতা সাধন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-(ক) আগ্রার তাজমহল (খ) মতি মসজিদ (গ) শাহজাহানাবাদ রাজধানী (ঘ) লালকেল্লা দিল্লী জামে মসজিদ (ঙ) ময়ুর সিংহাসন প্রভৃতি।

আওরঙ্গজেব সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তার গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপসমূহ- প্রজাদের কল্যাণে ৮০ প্রকার কর ও শুল্ক বিলোপ সাধন, উচ্চ কর্মচারীর মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি রাজকোষে জমার বিধান বন্ধকরণ, মদ, জুয়া, প্রাতঃকালে সম্রাটের মুখদর্শন, গুণকীর্তন প্রভৃতি অনৈসলামিক কার্যকলাপ রহিতকরণ, কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে বহু রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ হিন্দুদের অধিক পরিমাণে নিয়োগ ও সতীদাহ প্রথা বেআইনী ঘোষণা ইত্যাদি।

বাংলায় সমাজকল্যাণ ঃ

মধ্যযুগে বাংলার শাসকগণও সমাজকল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন। বখতিয়ার খলজী (১২০১) বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, খানকাহ্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৬] শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। সিকান্দার শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় আদিনা বড় মসজিদ নির্মিত হয়।[৩৭] গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বহির্বাণিজ্য, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সুসম্পর্ক,

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধিত হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রজাহিতৈষী ও জনদরদী ছিলেন। তিনি রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, লঙ্গরখানা প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে জাতীয়তাবাদী চেতনা (বাংলা) ও বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। রামায়ন, গীতা, মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্য বাংলায় অনূদিত হয়। ঐতিহাসিকরা তাঁর আমলকে 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দেন।[৩৮]

মুঘল আমলে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুবেদারগণও বিভিন্ন জনকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইসলাম খাঁ, মীর জুমলা, শায়েস্তা খাঁ প্রমুখ এদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, উপাসনালয়, রাস্তাঘাট, স্থাপত্য, সেতু, কুপ, খাল প্রভৃতি নির্মাণ ও খনন করেন। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মন চাউল পাওয়া যেত। তখন মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাস করত।

সুতরাং মুসলিম শাসনামলে সমাজকল্যাণে ব্যাপক ও বিস্তৃত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। মোহাম্মদ খালিদ এ প্রসঙ্গে বলেন, "It can safely stated that the Muslim rulers took all possible measures for the material and moral development of the people."[৩৯] মুঘল ও পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে পরিব্রাজকদের বর্ণনায় অনেক ঘটনা জানা যায়। কর্ণেল স্লিম্যান (Col. Sleeman) শেখ সাদী'র একটি বক্তব্য তাঁর 'Rambles and Recollection' গ্রন্থে উপস্থাপন করে বলেন, "the man who has left behind him great works in temples, bridges, reservoirs, and caravansaries for the public good, not die. And this does apply to the Mughals."[৪০]

সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বণিক, ধর্ম প্রচারক, পীর-আউলিয়া ও দরবেশগণের আগমনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অনন্য আদর্শ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সাম্যের উদার বাণী, মানবতাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন প্রভৃতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে দুস্থ, অসহায়, ইয়াতিম, বিধবা, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানে বেসরকারী পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়।

ধর্ম প্রচারক ও সূফী-দরবেশগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে খানকাহ, দরগা বা আস্তানা নির্মাণ করেন এবং এর পাশেই মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, শিক্ষালয়, বিশ্রামাগার, লঙ্গরখানা, ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, বাসস্থান প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাছাড়া, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর, দিঘি, কুপ ও খাল খনন, বৃক্ষ রোপনসহ দরিদ্র ও নির্যাতিতদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। ইসলামী প্রথা প্রতিষ্ঠান-যাকাত, দান, সদ্‌কা, ফিতরা, ওয়াক্‌ফ, ওশর প্রভৃতিও এক্ষেত্রে পভাব বিস্তার করে।[৪১] সূফী ও দরবেশদের মধ্যে বিক্রমপুরের বাবা আদম শহীদ, বদরপুরের শাহ মুহাম্মদ রুমী, মহাস্থানের শাহ সুলতান শাহী, আজমীরের খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি, পাণ্ডুয়ার শায়খ জালাল উদ্দিন তিবরিজী, দিল্লীর নিজাম উদ্দিন আওলিয়া, সিলেটের শাহজালাল (র.), বিহারের মাখদুম-উল-মুলক, খুলনার খান জাহান আলীর নাম বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। এঁদের জনকল্যাণের গৌরবগাঁথা আজও জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। শায়খ জালাল উদ্দিন তিবরিজী (র.) ভারত উপমহাদেশের সমাজসেবার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি সর্বপ্রথম পান্ডুয়ায় একটি স্কুল ও একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করে দরিদ্র ও অত্যাচারিত জনগণের সেবার ব্যবস্থা করেন।[৪২] হযরত আলাউল হক (র.) পান্ডুয়াতে লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁরই পুত্র হযরত কুতুব-উল-আলম সেখানে একটি কলেজ ও একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন।[৪৩]

হযরত খান জাহান আলী (র.) ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে বাগেরহাটে খেলাফতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে কল্যাণরাষ্ট্রের (Welfare state) সূচনা করেন। তিনি জনগণের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পুকুর ও দিঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন মসজিদগুলো জনকল্যাণের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হত। তাঁর অন্যতম ব্যতিক্রমী মসজিদগুলো জনকল্যাণের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হত। তাঁর অন্যতম ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ছিল সুন্দরবনকে মানুষ বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলা।[৪৪] হযরত শাহ জালাল (র.) সিলেটে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন উপায়ে জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল তৎকালীন জমিদারদের হাত থেকে অত্যাচারিত মুসলমানদের রক্ষা করা।[৪৫] হযরত শাহ আদম (র.) শান্তাহারে একটি বিরাট দিঘি খনন করেন। আদমদিঘি নামে পরিচিত সেই দিঘি আজও শান্তাহারের অন্যতম কীর্তি। নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) এবং খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) এর সমাজসেবা কার্যাবলী এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪৬] এখনও খাজা বাবার নামে সমাজসেবা পরিচালিত হয়ে থাকে।

মধ্যযুগীয় সমাজসেবায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মানবপ্রেমিকের অবদানও স্বীকৃত। তাঁরাও ধর্মীয় প্রেরণঅয় উদ্বুদ্ধ হয়ে মঠ, মন্দির, চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ, দিঘি খনন প্রভৃতির মাধ্যমে জনকল্যাণ কার্য পরিচালনা করেছেন। মূলত ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সমাজসেবা কার্যক্রমে একটি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। অস্থায়ী সাহায্য নির্ভর ব্যবস্থার চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়ী সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ঐতিহ্যগত ধারার সমাজসেবা (Traditional Social Service) বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং বিভিন্ন সামাজিক আইন প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে সমাজকল্যাণে এক নতুন অধ্যায় সূচীত হয়। দানশীলতার (Charity) পাশাপাশি মুক্ত যুক্তিবাদী ভাবধারা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সমাজকল্যাণের পটভূমি গড়ে তোলে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে। তাই ব্রিটিশ শাসিত সময়কেই আধুনিক সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের সূচনাকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্নে খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক হিসেবে খ্রীস্টান মিশনারীগণ তাদের সেবা কার্যক্রম শুরু করেন। ১৭৮০ সালে বাংলার শ্রীরামপুরে খ্রীস্টান মিশনারীরা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ধর্মীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি তাঁরা বর্ণভেদ প্রথার বিরোধিতা, নারী অধিকার রক্ষা ও চিন্তা-চেতনায় আধুনিকতার জাগরণ ঘটানোর প্রচেষ্টা চালান। তাদের প্রচেষ্টায় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম শুরু করে। সরকারের পাশাপাশি নব্য জমিদার শ্রেণীরাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, কুপ ও দিঘি খনন, রাস্তা নির্মাণ, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[৪৭]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পৃথক যুক্তিবাদী মানবতাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটলে সে প্রেক্ষিতে বিভিন্নমুখী সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এক্ষেত্রে সে সমস্ত মনীষীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আব্দুল লতিফ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন। নারীর নিরাপত্তায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করে নারী সমাজকে জঘন্য সামাজিক কুপ্রথার হাত থেকে রক্ষা করেন। রামমোহন রায় আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠায়ও কাজ করেন। তৎকালীন সময়ে আর্য সমাজ যুক্তিবাদি আলোচনার আয়োজন, দুর্ভিক্ষে ত্রাণ সাহায্য প্রদান, নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও দান সংগঠনে সাহসী ভূমিকা নেয়। এ সময়ে অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন, নওয়াব আব্দুল লতিফের মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক ঋণ মুক্তি আন্দোলন পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত, শোষিতদের শিক্ষা, জাতীয় জাগরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে।

সমাজ সংস্কারক হিসেবে মহিয়সী বেগম রোকেয়ার নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল। তৎকালীন সময়ে নারী শিক্ষায় তিনি বিশেষ অবদান রাখেন এবং সাখাওয়াত গার্লস হাই স্কুল, কলকাতার মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ঐ সময়ে সমাজকর্মমূলক তৎপরতা হিসেবে হাজী শরিয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন ইত্যাদি ব্যাপকতর ভূমিকা পালন করে।[৪৮]

ব্রিটিশ আমলে সরকারী পর্যায়ে জনসন্তুষ্টি নীতি এবং হিন্দু-মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর যৌথ প্রচেষ্টা সমাজকর্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় নারী, শিশু কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শিক্ষার উন্নয়ন, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজ সংস্কার এবং নারীকল্যাণে রাজা রামমোহন রায় ও লর্ড বেন্টিংকের উদ্যোগে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লর্ড ডালহৌসির সরকারী সমর্থনে ১৮৮৫ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হয়। উল্লেখ্য এ দু'টি আইন ছাড়াও ১৮৫০ সালের শিক্ষানরিশ আইন, ১৮৯৭ সালের রিফরমেটরী স্কুল আইন, ১৯২২ সালের বঙ্গীয় শিশু আইন, ১৯৩৩ সালের কারখানা আইন, ১৯৩৩ সালের পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ আইন নারী ও শিশু কল্যাণে অবদান রাখে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ড বেন্টিংক এবং লর্ড ডালহৌসির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩ সালের প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন, ১৯৩৪ সালের কারখানা আইন, ১৯৪১ সালের মাতৃকল্যাণ আইন উল্লেখযোগ্য।[২] এ আইনগুলো শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, বৃদ্ধকালীন নিরাপত্তা বিধান, মাতৃত্ব সুবিধা প্রদানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন, ১৭৮২ সালে হিন্দু সংস্কৃত চর্চার জন্য বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা, এশিয়াটিক সোসাইটি গঠন করেন। লর্ড ওয়েলসলি ইউরোপীয়দের শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন যা ভাষা শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিংক কলকাতায় মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাইয়ে এলফিনস্টোন ইনষ্টিটিউট গঠন করেন। ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসির প্রচেষ্টায় একটি পৃথক শিক্ষা বিভাগ চালু করা হয় ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন কলকাতা বেথুন কলেজ। এছাড়াও সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নয়নে অনেক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড ক্যানিং ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিফোর্ড ম্যানশার্ডের উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে দক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে সমাজকর্মের প্রয়াসে, দক্ষ সমাজকর্মী প্রতিষ্ঠার জন্য Tata Graduate School of Social Work প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬৬ সাল থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এবং সমাজকর্মের অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

==========

তথ্য ও টিকা নির্দেশ

১. রেজাউল করিম, সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ২৫৫

২. রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৩. সম্পাদাস, সমাজকর্ম ঃ প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েস, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৩৫৯

৪. R. C. Mojumdar, "Social Work in Ancient and Mediaval India", in History and Philosophy of Social Work in India, (Wadia ed.), 1961, P. 22

৫. M. S. Gore and I. E. Soares, "Historical Background of Social Work in India", in Social Welfare in India,
Planning Commission of India, New Delhi, 1955, P. 2

৬. G. R. Madan, "Indian Social Problems" Vo-2, New Delhi, 1980, P. 66

৭. Ibid, P. 66

৮. M.I. Gazdar, Charities their Past, Present & Future in socialwelfare in India, Pci, New Delhi-1955, Page-190

৯. ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল, বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের ইতিহাস, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা-১৯৭৪, পৃ. ৫৩

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১ – ৭২

১১. সৈয়দ সুলায়মান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১২. K.S. Lal , Early Muslim in India, New Delhi, 1984, P.1

১৩. নাসায়ী শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, মুসনাদ-ই -আহমাদ।

১৪. নাসায়ী শরীফ, প্রাগুক্ত

১৫. Mohammad Nurul Haq, Arab Relation with Bangladesh, 1980, Ph.D thesis, DU.

১৬. K.A. Nizami (ed). Md. Zaki. Arab accounts of India, Introduction.

১৭. K.A. Nizami (ed). Md. Zaki. Arab accounts of India, Introduction.

১৮. মুফাখারুল ইসলাম, উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃ. ৭১৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯. ড. তারাচাঁদ, অনুদিত এস.মুজিব উল্লাহ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ২৯
২০. ড. তারাচাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২১. ড. তারাচাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২২. আব্দুল গফুর, মহানবীর যুগে উপমহাদেশ, অগ্রপথিক, সিরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৯-৫৫
২৩. খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হোসায়ন অনুদিত ইবনে বতুতার সফরনামার উর্দু অনুবাদ, আজাইবুল আসফার, ২য় খন্ড, দিল্লী-১৯১৩, পৃ. ৫২
২৪. খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হোসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
২৫. মোঃ নুরুল ইসলাম, সমাজকর্মঃ ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ২৮৯
২৬. সম্পাদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪
২৭. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৯৪
২৮. দ্রষ্টব্য. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭
২৯. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২
৩০. সম্পাদাস, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৬৫
৩১. ড.মোহাম্মদ গোলাম রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭
৩২. Ishwari Prasad, A Short History of India, P. 219
৩৩. উদ্ধৃতঃ ড. মোহাম্মদ রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৩৪. উদ্ধৃতঃ সম্পাদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
৩৫. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
৩৬. মিনহাজ-ই-সিরাজ, তাবকাত-ই-নাসিরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৬৫
৩৭. আসকার ইবনে শায়খ, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৮
৩৮. দ্রষ্টব্য, আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৩৯. Mohammad Khalid, Welfare Statet A case study of Pakistan, Royal Book Co. Karachi, 1968, P. 78
৪০. উদ্ধৃতঃ মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
৪১. উদ্ধৃতঃ মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
৪২. ড.মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৩৩৫ বাং, পৃ. ৯৮
৪৩. আবদুল হক দেহলভী, আখবারুল আখিবার, দিল্লী, ১৩৩২ হিঃ, পৃঃ ১৪৩, ১৫২
৪৪. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তাল, ঢাকা-১৯৬১, পৃ. ২০৩
৪৫. দেওয়ান মুহাম্মদ নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহজালাল (রহঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭, দ্রষ্টব্য।
৪৬. Sayed Athar Abbass Resvi, A History of Sufism in India, Vol-2, New Delhi, 1983, P. 279
৪৭. সম্পা দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯, (অনু. হুমায়ুন খান), আরব নৌবহর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২
৪৮. Narendra Krishna Sinha (ed.), the History of Bengal (1757–1905), Vol-2, Calcutta University of Calcutta, 1967, Page. 585
৪৯. Ibid, Page. 586

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজকল্যাণে উপমহাদেশের আলিমগণের অবদান
(১৯০১ — ১৯৫০)

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণে উপমহাদেশের আলিমগণের অবদান

একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত কিংবা সামগ্রিক কাজ তাৎক্ষণিক জাতীয়ভাবে স্বীকৃত নাও পেতে পারে। তার কাজকর্ম সমাজেরকল্যাণের জন্য হয়ে থাকলে তা সামাজিকভাবে স্বীকৃতির প্রয়োজনে তিনি নাও করে থাকতে পারেন। আমাদের জাতিসত্তার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। মানব জাতির বৃন্তচ্যুত অংশ না হয়েও আমরা কিছুটা আলাদা। পাশাপাশি অবস্থানের পরও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকা সম্ভব। ধর্মের সর্বজনীন পরিচিতির পরও জাতি রাষ্ট্রের ধারণা অমূলক নয়। এ কারণেই নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয় ও রাষ্ট্রীয় চিন্তার নাগরিক ভাবনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা সামনের দিকে এগিয়ে নেন তারাই জাতীয় নেতা। নেতৃত্বের মাঝে নানা ধরনের বিভাজন হতে পারে। যেমনঃ ধর্মীয় নেতৃত্ব, সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব।

ইতিহাসে আমাদের জাতীয় জীবনের নানা শাখায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তারা সবাই জাতীয়, কিন্তু তাদেরকে আলাদা করে ভাবতে হয়, চিনতে হয়, নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। এর মাধ্যমে কাউকে ছোট করা হয়না। বরং ইতিহাসের তারা অন্যদের অর্জনগুলো বহন করেছেন বলেই আলাদা করে ভাবার প্রশ্ন ওঠে। যেমন- নবাব পরিবারকে বাদ দিয়ে ঢাকার ইতিহাস হয়না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিলে অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায়। ৬০০ বৎসর ধরে যারা এদেশ শাসন করেছেন, ৩০০ বৎসর ধরে যারা লাগাতার স্বাধীনতার লড়াই করেছেন, কৃতজ্ঞ উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের সবাইকে আমরা মানবজাতির কল্যাণকামী ভাবতে চাই। হাজার বছর ধরে যারা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবন পূর্ণগঠনে অমূল্য অবদান রেখেছেন, তাদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করার পরও সময়ের এ বাঁকে রেশ কিছু বিশেষ আলিম এ দ্বীন-এর সমাজকল্যাণমুখী কাজ নিয়ে একসঙ্গে ভাবা সম্ভব হলে, জাতিকে ইতিহাসের অনেক যোগসূত্রের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত করতে পারি।

শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দীকি (র.) ও সমাজকল্যাণে তাঁর অবদান

(১৮৪৬ – ১৯৩৯)

জন্মঃ

কুতবুল ইরশাদ শাহ্ সূফী সৈয়দ ফতেহ আলীর[১] (র.) (মৃত. ১৮৮৬ খৃ.) প্রধান খলীফা, শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হুগলী জেলার জঙ্গীপাড়া থানাধীন ফুরফুরা নামক গ্রামে ১২৬৩ হি./১৮৪৬ খ্রী./১২৫৩ বাংলা ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর পিতার নাম মওলানা হাজী আবদুল মুক্তাদির এবং মায়ের নাম মুহাব্বাতুন্ নেসা। ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর ৩০ তম উর্ধ্বতন পুরুষ বলে ফুরফুরার শায়খকে 'সিদ্দীকি' বলা হয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ১৬শ অধস্তন পুরুষ মনসুর বাগদাদী (র.) ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে

Dhaka University Institutional Repository

(১২৯৬-১৩২৬ খ্রী.) বাগদাদ হতে ইসলাম প্রচারের জন্য বঙ্গদেশে আসেন এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মনসুর বাগদাদীর অধঃস্তন পুরুষ হাজী মুস্তফা মাদানী (র.) ও বাদশাহ আলমগীর (র.), মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.)-এর (১০২৪/১৬১৫) তৃতীয় পুত্র মাসুম রব্বানী (র)-এর (মৃ. ১০৩৪/১৬২৪) হাতে দিল্লীর জামে মসজিদে একত্রে বায়আত গ্রহণ করেন।[৩]

বাল্যকাল ঃ

আবূ বকর সিদ্দীকী (রা.)-এর বয়স যখন মাত্র নয় মাস, তখন তাঁর পিতা মওলানা আলহাজ্ব আব্দুল মুক্তাদির (র.) ১২৫৩/১৮৪৭ সনে কার্তিক মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি তদানিন্তন একজন বিশিষ্ট ওলী এবং স্বনামধন্য আলিম ছিলেন।[৪] পিতার ইন্তেকালের পর শিশু আবূ বকরের লালন পালনের দায়িত্ব তাঁর মহীয়সী মা মুহাব্বাতুন নেসার উপর অর্পিত হয়। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ধৈর্যশীলা উন্নত হৃদয়ের বিদূষী মহিলা। গভীর মমতা ও যত্নের সাথে তিনি ইয়াতীম শিশুকে লালন পালন করেন।

তাঁর মা আবূ বকর সিদ্দীকীকে যথাসময়ে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করেন। মক্তবে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি সীতাপুর মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন।[৫] সেখান থেকে তিনি হুগলী মুহসিনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্রাসা হতে জমাতে উলা (বর্তমান ফাযিল) পরীক্ষায় (১৮৬৩ খ্রী.) কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।[৬] অতঃপর তিনি কলকাতা যান। সেখানে সিন্দুরিয়া পট্টির মসজিদে হাফিয মওলানা জামাল উদ্দীন (র.) এর (মৃ. ১৩০৩/১৮৮৪) নিকট হাদীস, তাফসীর, ফিকহ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে ইজাযত (সনদ) লাভ করেন (১৮৬৮ খ্রী.)। তারপর তিনি কলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম মওলানা বিলায়েত হুসাইন (র.)-এর নিকট মানতিক, হিকমত ইত্যাদি বিষয় শিক্ষালাভ করেন। এভাবে তিনি ২৩ বছর বয়সে বিবিধ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। এরপর তাঁর শিক্ষার তৃষ্ণা নিবারিত না হওয়ায় তিনি ১৩১০/১৯০৩ খ্রী. হজ্জ পালন ও যিয়ারত উপলক্ষে মক্কা মুআয্যমা ও মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন। সেখানে তিনি রওযা পাকের সংরক্ষক মুহাদ্দিস শায়খুদ দালাইল সৈয়দ আমীন রিযওয়ানের কাছে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে সনদ লাভ করেন-(১) সহীহ বুখারী (২) সহীহ মুসলিম (৩) সুনান আবি দাউদ (৪) জামি তিরমিযী (৫) সুনান নাসায়ী (৬) সুনান ইব্ন মাজা (৭) মুআত্তা ইমাম মালিক (৮) মুসনাদ ইমাম আবি হানীফা (৯) মুসনাদ ইমাম শাফিয়ী (১০) মুসনাদ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (১১) মুসনাদ দারিমী (১২) মুসনাদ আবি দাউদ তায়ালিসী (১৩) মুসনাদ আবদ ইবন হুমাইদ (১৪) মুসনাদ হারিস ইবন উসামা (১৫) মুসনাদ বাযযার (১৬) মুসনাদ আবূয়'লি মুসিলী (১৭) সহীহ ইবন হিব্বান (১৮) সহীহ ইবন খুযায়মা (১৯) মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক (২০) মিশকাতুল আনওয়ার লি শায়খিল আকবর (২১) সুনান বায়হাকীয়ে কুবরা (২২) মুসনাদ সাঈদ ইবন মনসুর (২৩) মুসহাফ ইবন আবী শায়বা (২৪) সুনান বায়হাকীয়ে কুবরা (২৫) তারীখ ইবন আসাকীর (২৬) তারীখ ইয়াহইয়া ইবন মঈন (২৭) শিফা কাযী ইয়ায (২৮)

Dhaka University Institutional Repository

শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাভী (২৯) আযুহদ ওয়াদ্দাকায়েক লি ইবন মুবারক (৩০) নাওয়াদিরুল উসূললিল হাকিম আততিরমিযী (৩১) কিতাবাতুদ্দুআ লি তবরানী (৩২) আমসালুল ইলম ওয়াল আমাল লিল খতীব (৩৩) মুস্তাখরিয ইসমাঈল আলা সহীহিল বুখারী (৩৪)মুস্তাদরিক লিল হাকিম (৩৫) আল ফারায বাদাশ শিদ্দাহ লি ইবন আবিদ্দুনইয়া (৩৬) মুস্তাখরিয আবী ইয়ালা আলা সহীহ মুসলিম (৩৭) হুলিয়া লি আবী নঈম (৩৮)জিয়াদুল মিসালিস সালাত লি জালালুদ্দীন সুয়ূতি (৩৯) আযযুররিয়াতুত্তাসিরী (৪০) আমামুল ইয়াওম ওয়াল লাইল লি আবিস সুন্নী।[৭]

অতঃপর শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ১৩১০ বাংলা/১৯০৩ খ্রী. দেশে ফিরে আসেন এবং বহু দূর্লভ কিতাব সংগ্রহ করে একাধিক্রমে ১৮ বছর যাবত ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। এভাবে ৪২ বছর বয়স পর্যন্ত বহুবিধ জ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জন করে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণেও নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। তখন শাহ্ সূফী সৈয়দ ফতহ্ আলী (র.) কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর সান্নিধ্যে যান এবং তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন এবং ১৫ বছর সাধনার পর কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকায় কামালিয়াত অর্জন করে খিলাফত ও ইজাযত লাভ করেন।

বৈবাহিক জীবন ঃ

শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) নজিরা খাতুনকে বিয়ে করেন। তারপর সুফিয়া নুরজাহান খাতুনকে বিয়ে করেন। স্ত্রীদের তিনি সমান চোখে দেখতেন এবং তাদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার করতেন। কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে তা তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। এ নিরিখে বলা যায়, তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল। তিনি বহু সন্তান-সন্ততির পিতা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু মৃত্যুকালে পাঁচজন পুত্র সন্তান ও পাঁচজন কন্যা সন্তান জীবিত রেখে যান।

আধ্যাত্মিক অনুশীলন ঃ

ফুরফুরার শায়খের দরবারে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় মুরাকাবা, মুশাহাদা, যিক্‌র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শিক্ষার অনুশীলন হত। তাঁর অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ এত নিঁখুত, যুগোপযোগী ও কার্যকরী ছিল যে অল্পদিনের মধ্যেই মানুষ এর প্রভাবে গোঁমরাহী পথ পরিত্যাগ করে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করত। ফলে তাঁরা ঈমান ও আমলে পরিপক্ক হয়ে অনেকে খিলাফত প্রাপ্ত এবং সমাজের পথিকৃৎ হতেন-(১) মওলানা নিসার উদ্দীন আহমদ (র.), বরিশাল (মৃ. ১৯৫২) (২) মওলানা রুহুল আমীন (র.), চব্বিশ পরগণা (মৃ. ১৯৪৫ খ্রী.) (৩) মওলানা তাজাম্মুল হোসেন সিদ্দীকী (র.), নদীয়া (৪) মওলানা সদর উদ্দীন (র.),

Dhaka University Institutional Repository

যশোর (মৃত. ১৯৪০) (৫) মওলানা হাফিয আবুল বাশার উদ্দীন (র.), ঢাকা (মৃ. ১৯৮৭ খ্রী.), (৬) মওলানা হাতিফ আলী (র.), নোয়াখালী (মৃ. ১৯৭৬ খ্রী.), (৭) মওলানা আবদুর রহমান (র.), মালাকান্দা, কুমিল্লা (মৃ. ১৯৬৪) (৮) শাহ্ সূফী মুমিন (র.), চট্টগ্রাম, (মৃ. ১৯২৪) (৯) মওলানা ময়েয্যুদ্দীন হামিদী (র.), খুলনা (মৃত. ১৯৭১ খ্রী.) প্রমুখ অন্যতম।

এছাড়াও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক পন্ডিত ব্যক্তি তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করে খিলাফতপ্রাপ্ত হন। তাঁদের মধ্যে-(১) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (র.), ঢাকা (মৃ. ১৯৬৯) (২) প্রফেসর আবদুল খালিক (র.) হতুরা, কুমিল্লা (মৃ. ১৯৫৫) (৩) কবি মুজাম্মিল হক (র.), ভোলা, বরিশাল, (৪) মুন্সী জমীর উদ্দীন (র.), (মৃ. ১৯৩০ খ্রী.) প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপমহাদেশ ছাড়াও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মুরীদ ও খলীফাগণ। তাঁদের মধ্যে মওলানা মুআযযিম হুসাইন মক্কী (র.), মওলানা বদরুদ্দীন মিসফালা, মওলানা আবদুল মজীদ পেশওয়ারী (র.), হাজী মীর মুহাম্মদ গয়া (র.), মৌলভী আবদুল মজীদ দারভাঙ্গা (র.) বিহার প্রমুখ হিজায ও মধ্য এশিয়ার এবং শাহ্ সূফী আবদুল মুমিন (র.) ও শাহ্ সূফী সদরুদ্দীন (র.) (মৃ. ১৯৪০) চীন, জাপান ও বার্মার লোকজনকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করেন।

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) চব্বিশ বছর বয়সে ১৩১০/১৯০৩ খ্রী. প্রথম বার এবং ষাট বছর বয়সে ১৩৩০/১৯২৩ সনে দ্বিতীয় বার হজ্জ সম্পাদন করেন।[৮] দ্বিতীয় বার হজ্জ সফরে তাঁর সাথে ১৩০০ মুরীদ ও অনুসারী সাথী হন। হজ্জের কাজ শেষ করে তিনি মক্কা শরীফের সাওলাতিয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং এ মাদ্রাসায় এক হাজার টাকা দান করেন।[৯]

ইসলাম প্রচার ও সমাজকল্যাণে তাঁর অবদান ঃ

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যহারা ও ধর্মহারা মুসলিমদের ইসলামের মৌলিক বিধানে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের বাস্তব ও সুদূরপ্রসারী ইসলামী মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। বাংলা ও আসামের শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে অগণিত ধর্মীয় সভায় ওয়ায-নসীহত করেন এবং বিদআতপন্থী, বেশরা পীর-ফকীরদের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে তিনি মৌখিক ও কলমের মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম করেন। এজন্য তাঁর উপাধি দেয়া হয় 'মাহিয়্যে বিদাআত'[১০] ও 'মুহিয়ে সুন্নাত'।[১১]

মাতৃভাষা বাংলায় চর্চা গবেষণাঃ

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তৎকালীন সময়ে আলিমগণ সাধারণত বাংলা ভাষা চর্চা করতেন না এবং এ ক্ষেত্রে সাহিত্য রচনায়ও আগ্রহী ছিলেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন,

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষা বাংলায় কিছু না লিখলে ইসলাম প্রচার সহজসাধ্য ও সুদূর প্রসারী হবে না। তাই তিনি ইসলামী বিধিমালার উপর বই-পুস্তক রচনা করতে তাঁর আলিম ও ইংরেজী শিক্ষিত মুরীদগণকে উৎসাহিত করেন, যার ফলে মওলানা রুহুল আমীন (র.) (মৃ. ১৯৪৫), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (র.), বিখ্যাত তাফসীরকারক আবদুল হাকীম (র.), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (র.) (মৃ. ১৯৬৯ খ্রী.), প্রফেসর এ. খালিক (র.) (মৃ. ১৯৫৫) প্রমুখ. ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বই-পুস্তক রচনা করেন। এ ছাড়া আরও অনেকে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নির্দেশ ও অনুমোদনে লিখিত এ ধরনের বইয়ের সংখ্যা সহস্রাধিক হবে। তাঁর বিশিষ্ট মুরীদ ও খলীফা মওলানা রুহুল আমীন (র.) একাই প্রায় ১৩৫ খানা পুস্তকের রচয়িতা। তাঁর নির্দেশে লিখিত ও অনুমোদন প্রাপ্ত কয়েকখানা বইয়ের নাম এখানে উদ্বৃত হলঃ (১) আকাঈদে ইসলাম (২) ইলমে তাসাওউফ (৩) সিরাজুস সালেকীন (৪) পীরমুরীদ তত্ত্ব (৫) বাতিল দলের মতামত (৬) নসীহতে সিদ্দীকিয়্যা (৭) ফাতাওয়ায়ে সিদ্দীকিয়া (৮) তালীমে তরীকত (৯) ইরশাদে সিদ্দীকিয়া।

মওলানা রুহুল আমীন লিখিত 'তরীকত দর্পণ বা তাসাউফ তত্ত্ব" বইটি শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীর সংকলন। তিনি নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ, লিখিত ভাষণ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লিখিত উর্দুতে 'তারীখুল ইসলাম', 'কাওলুল হক্ক' এবং বাংলায় 'অসীয়ত নামা' প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'আল আদিল্লাতুল মুহাম্মদীয়া' নামে আরবীতে পাণ্ডুলিপি রচনা করেন; কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি।[১২]

শিক্ষা বিস্তার ঃ

বাংলার মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শায়খে ফুরফুরা আবূ বকর সিদ্দীকী (র.)-এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মাদ্রাসায় পাঠ্য তালিকা সংস্কার করে মুসলিমদের আদর্শ ঐতিহ্য সম্বলিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের অভাবে সমাজ পেছনে পড়ে যায়-এ কথা তিনি মর্মে মর্মে অনুধাবন করে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলতেন 'ইংরেজী একটি বিদ্যা।'

শিশু শিক্ষা ঃ

শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। তিনি সেদিকে লক্ষ্য রেখে মুসলিম বালক-বালিকাদের ইসলামের রীতি-নীতি ও ইসলামী পরিবেশে শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এ উদ্দেশ্যে 'বালক-নূর' ও 'বালিকা-নূর' বই তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়।[১৩]

নারী শিক্ষা ঃ

মায়েরা সচ্চরিত্র ও আদর্শবতী না হলে ছেলে-মেয়েরা আদর্শবান ও চরিত্রবান হবে না- এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে আবূ বকর সিদ্দীকী নারী শিক্ষাকে জরুরী বলে ঘোষণা করেন; তবে তা পর্দার সাথে হতে হবে। মেয়েদের জন্য বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পৃথকভাবে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি উপদেশ দেন।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাঃ

শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার মানসে বিদ্যোৎসাহী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৮০০ মাদ্রাসা ও ১১০০ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ গ্রাম ফুরফুরায় তিনি একটি ওল্ডস্কীম, একটি নিউস্কীম মাদ্রাসা এবং একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার গভর্নিং বডির অন্যতম সদস্য (১৯২৮ খ্রী.) ছিলেন।[১৫]

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঃ

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) সংস্কার ও ইসলাম প্রচারকে বাংলায় সীমাবদ্ধ রাখেননি। ১৩৪১ হিজরীতে তিনি দিল্লী ও আজমীরে গিয়ে অনেক মাযার যিয়ারত করেন ও আজমীরে খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (র.)-এর মৃত (৬৩৩ হিজরী) মাযারে বিরাজিত বিদআত বন্ধ করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরে সিরহিন্দ গিয়ে আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) (মৃ. ১৬৫৮ খ্রী.) মাযারে ১০/১২ দিন অবস্থান করেন ও ওয়ায নসীহত করেন। সেখান থেকে বিদায়কালে তাঁকে মুজাদ্দিদী টুপী ও পাগড়ী পরিয়ে দেয়া হয়। ১৩৫১ হিজরী সনে সউদী আরবের বাদশাহ আবদুল আযীয ইবন সউদের নিকট তিনি প্রাচীন কীর্তিগুলো ভেঙে না ফেলার ও প্রকাশ্যে সুন্নতের পরিপন্থী কার্যাবলী না করার পরামর্শ দিয়ে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং বাদশাহ্র পক্ষ থেকে এর প্রত্যুত্তর পান।[১৬]

সংবাদপত্র প্রকাশনা ঃ

সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যম হিসেবে সব সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শায়খে ফুরফুরা আবূ বকর সিদ্দীকী এ কথা উপলব্ধি করে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শুধু তাই নয়, আর্থিক সংকটে নিপতিত অনেক পত্রিকাকে তিনি নিজ তহবিল হতে বা চাঁদা সংগ্রহ করে সাহায্য করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ঃ যেমন- মিহির ও সুধাকর, নবনূর, মোহাম্মদী, সোলতান, মুসলিম হিতৈষী, শরীঅতে ইসলাম, সুন্নত অল জামাত, হানাফী, ইসলাম দর্শন ইত্যাদি।

সমাজসেবা ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক ও আধ্যাত্মিক বিদ্যার পারদর্শিতা লাভের পর শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মুসলিম সমাজ হতে শিরক, বিদআত ও অনৈসলামী কার্যকলাপ দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩১৭/১৯১১ সনে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েযীনে বাংলা ও আসাম' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজকে হিদায়েতের জন্য ওয়ায-নসীহতের ব্যবস্থা করা, খৃস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতিরোধ প্রতিবিধান করা ও অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা। এ আঞ্জুমানের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু সংখ্যক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ।[১৭] ইন্তেকাল-পূর্ব পর্যন্ত তিনি আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি ঃ

অবিভক্ত স্বাধীন ভারতের সমর্থক নিখিল ভারত কংগ্রেসের অঙ্গ সংগঠন 'জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ' ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ। মুসলিম লীগের একটি শাখা ফুরফুরার শায়খের তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে 'জমইয়তে উলামায়ে বাঙ্গালা ও আসাম' নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সনে। মওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। জমইয়তের এক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন-শরীঅত, তরীকত, হাকীকত ও মা'রিফাত পূর্ণরূপে আমল করে দেশ ও জাতির খেদমতের জন্য আলিমগণের রাজীনিত, সমাজনীতি প্রভৃতিতে যোগ দেয়া আবশ্যক।[১৭] তিনি আরও বলেন, রাজনীতি থেকে আলিমগণের দূরে থাকার কারণে আজ মুসলিম সমাজে নাবাবিধ অন্যায় ও শরীয়ত বিরোধী কাজ হচ্ছে।[১৮]

অসহযোগ আন্দোলন বয়কট ঃ

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জমইয়তের হিন্দের বার্ষিক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি এর বিরোধিতা করেন।[১৯] তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, "আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট ও মহাক্ষতি সাধিত হচ্ছে। স্বরাজ-স্বাধীনতা সকলের কাম্য; ইহা লাভ করার জন্য পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক, অন্যথা তার ফল হবে ভয়ংকর ও বিস্ময়কর। ভারতের মুসলমানগণ এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। তারা সামাজিক সংগঠনে ও শিক্ষায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ। সুতরাং তাদের শিক্ষা, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি সাধন করতে হবে নতুবা মহাসর্বনাশ অনিবার্য। আইন অমান্য আন্দোলন থেকে তাদের সম্পূর্ণ পৃথক থাকা বিশেষ প্রয়োজন।"[২০] ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি তাঁর মুরীদ, মুতাকিদীন ও সাধারণ মুসলিমদের পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেন।

ইন্তেকাল ঃ

এ মহান ওলীয়ে কামিল মুজাদ্দিদ ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ হতে বহু মূত্র রোগে ভুগতে থাকেন। ১৯৩৮ খ্রী. তাঁর আরও কিছু নতুন রোগ দেখা দেয়। তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা পাঠানো হয়। সেখানে তিনি কিছু দিন অবস্থান করেন। ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বরে তিনি ফুরফুরায় ফিরে আসেন এবং ১৯৩৯ সনের ২১, ২২ ও ২৩ ফাল্গুন ফুরফুরার ইসালে সওয়াবের মাহফিলে সমবেত হাজার হাজার মুরীদ ভক্তদের সাথে তিনি নিয়ম মাফিক দেখা সাক্ষাত করেন ও মুরীদদের যথারীতি তা'লীম দেন। তিনি মাহফিলের আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন। তারপর ২৫ মুহররম ১৩৫৮ হিজরী ৩ চৈত্র ১৩৪৬ বাংলা ১৭ মার্চ ১৯৩৯ খ্রী. শুক্রবার প্রত্যুষে ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' ফুরফুরার মিয়াপাড়া মহল্লায় পারিবারিক গোরস্তানে তাঁকে দাফন

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। এখনও প্রতি বছর ২১, ২২ ও ২৩ ফাল্গুন ফুরফুরায় তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ও ঐতিহ্যবাহী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।[২১] অগণিত লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে ইসলামী প্রেরণা ও শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শিক্ষা বিস্তারঃ

শিক্ষাহীনতা ও তৎকালীন রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী না জানার জন্য এককালের শাসক মুসলিম জাতি শোষিত বঞ্চিত হয়েছিল। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার বলেনঃ "ভারত সরকারের দেশ রক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মি. বেইলি বলেছেন, আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা উপস্থিত করেছি, তা আমাদের বিবেচনায় যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, মুসলমান সমাজ সযত্নে তা হতে দূরে অবস্থান করছে। এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই, কেননা এ শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা তাদের নীতি নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মান রক্ষা হতে পারে না।[২২]

১৮৩৭ খ্রী. রাষ্ট্রভাসা ফারসী উঠিয়ে দিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ইংরেজি। ফলে চাকরি ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানগণ সম্পূর্ণভাবে হয় বঞ্চিত। বাংলায় প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা যা চাকরি প্রার্থীর যোগ্যতা মাপকাঠি বলে বিবেচিত হতো, উইলিয়াম হান্টারের ভাষায় তা ছিল, "A system exclusively adapted to the Hindus." অর্থাৎ এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যা কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্যই উপযুক্ত। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের চাকরি থেকে দূরে রাখার জন্য গর্ভনমেন্ট গেজেটে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকতো যে এসব চাকরি থেকে দূরে রাখার জন্য গর্ভনমেন্ট গেজেটে প্রাকাশ্য বিজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকতো যে এসব চাকরি হিন্দু ছাড়া অপর কাউকে দেয়া হবে না।[২৩] বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষিতের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ছিল-

বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪,৬৫,৪৪৮৭০ জন। এর মধ্যে ৪৪,৮৭০ জন খ্রীষ্টান, ২,১০,০০,০০০ জন হিন্দু, ২,৫৫,০০,০০০ জন মুসলমান। ১৯২৬-২৭ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষার হার নিম্ন প্রাইমারীতে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৪২ জন এবং মুসলমান শতকরা ৫৭ জন; উচ্চ প্রাইমারীতে হিন্দু শতকরা প্রায় ৬২ জন আর মুসলমান শতকরা ২০ জন। হাই স্কুলে হিন্দু শতকরা ৮৬ জন আর মুসলমান ১৪ জন। টেকনিক্যাল কলেজে হিন্দু শতকরা ৮৫ জন, মুসলমান ১০ জন এবং অন্য জাতি শতকরা ৫ জন। মেডিকেল কলেজে হিন্দু শতকরা ৮৯ জন এবং মুসলমান ৯ জন আর অন্যান্য জাতি ২ জন।

অপরপক্ষে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা নিম্ন প্রাইমারীতে শতকরা ৩৮ জন। উচ্চ প্রাইমারীতে শতকরা ৬২.৫ জন এবং মুসলমান ছাত্রী শতকরা ৩৭.৫ জন। মধ্য শিক্ষায় হিন্দু ছাত্রী শতকরা ৬৪.৫ জন এবং মুসলমান ছাত্রী শতকরা ৫ জন। হাইস্কুলে হিন্দু ছাত্রী শতকরা ৯৬.৫ জন আর মুসলমান ছাত্রী ৩.৫ জন। আর্ট কলেজে হিন্দু ছাত্রী শতকরা ৯৮ জন এবং মুসলমান ছাত্রী ২ জন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় মিলে সেকালে বাংলায় পুরুষ শিক্ষিতের হার

Dhaka University Institutional Repository

ছিল শতকরা ৯ জন আর মহিলা শিক্ষিতের হার শতকরা পৌনে ২ জন।[২৪] শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এরূপ শোচনীয়পশ্চাদপদতার যুগে শাহ্ সুফী আবূ বকর সিদ্দীকি (র.)-এর প্রচেষ্টা প্রায় ৮০০ ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা এবং ১১০০ মসজিদ স্থাপিত হয়।

প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাদ্রাসাঃ

ফুরফুরার মাদ্রাসা, দোঁক মাদ্রাসা, সীতাপুর মাদ্রাসা, মোল্লা শিমলা মাদ্রাসা, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত মাদ্রাসা (বরিশাল), ছায়ানী মাদ্রাসা, ইসলামী মাদ্রাসা, চৌধুরাণী ফাতহিয়া মাদ্রাসা, জোড়া মাদ্রাসা (পাবনা), মরইল মাদ্রাসা, মোস্তফাবিয়া মাদ্রাসা (বগুড়া), হাদল মাদ্রাসা, ধলেশ্বর মাদ্রাসা, ধূলাউড়া মাদ্রাসা, তাবারোউয়া মাদ্রাসা, সেনাতুনিয়া মাদ্রাসা, গোবিন্দপুর মাদ্রাসা, গোপগ্রাম মাদ্রাসা, লাহড়িয়া মাদ্রাসা, বাকুল মাদ্রাসা, মাগুড়া মাদ্রাসা, তেকুয়া মাদ্রাসা, কাহালু মাদ্রাসা, পদ্যবিলা মাদ্রাসা, ইসলামাবাদ মাদ্রাসা, মহিরান পীর সাহেবের মাদ্রাসা, ছনপুর আসার নগর মাদ্রাসা, দোগাছিয়া মাদ্রাসা ইত্যাদি।[২৫] এসব মাদ্রাসা আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে তাঁর অমর কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ফুরফুরায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.)- এর উর্ধতন পুরুষ মওলানা মুস্তফা মাদানী (র.)-এর পীর ভাই আওরঙ্গজেব আলমগীর তাঁর রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী.) কোন এক সময় ফুরফুরায় শুভ পদার্পণ করেন বলে কিংবদন্তী রয়েছে। উভয়ের শায়খ ছিলেন মাসুম রাব্বানী (র.) ই মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) (মৃ. ১৬৫৮ খ্রী.)। সে সময়েই ফুরফুরায় ইসলামী শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাদশাহ আলমগীর আয়মা ছাড়াও বহু সম্পত্তি বন্দোবস্ত করে দেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচের জন্য। ১০৭৭/১৬৬৬ হিজরীতে প্রদত্ত বাদশাহী সনদপত্র এখনও ফুরফুরার আবূ জাফর সিদ্দীকির নিকট গচ্ছিত আছে।[৩৯]

ফুরফুরা ফতেহিয়া মাদ্রাসাঃ

শায়খে ফুরফুরা মুসলিম বালক-বালিকাদের বিশুদ্ধভাবে কুরআনুল করীম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুযোগ্য হাফিয ও কারীর তত্ত্বাবধানে তাঁর শায়খের নামের স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য ফতেহিয়া মাদ্রাসা নামে ১৮৯৮ খ্রী. প্রথমে একটি কিরাতিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তাজবীদ শিক্ষাদানের সাথে সাথে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্ভবত বঙ্গ ও আসামে এটাই প্রথম আবাসিক বেসরকারী দরসে নিযামিয়া (ওল্ড স্কীম) মাদ্রাসা। তিনি আধুনিক শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে মাদ্রাসার সন্নিকটে স্বতন্ত্রভাবে প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। তাতে প্রতিদিন বহু কোমলমতি বালক-বালিকা শিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

অতঃপর ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে উক্ত মাদ্রাসার পাঠদান পদ্ধতি যথারীতি আলিয়া মাদ্রাসার নিসাব অনুসরণ করতে থাকে। কালক্রমে এ মাদ্রাসা ফুরফুরা ফতেহিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। উক্ত ওল্ডস্কীম সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যায়ক্রমে কামিল মাদ্রাসায় উন্নীত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এজন্য শায়খে ফুরফুরা ৩৮ হাত দীর্ঘ একখানা দালান তৈরি করেন। এ মাদ্রাসা ১৯০৮ খ্রী. সরকার কর্তৃক মঞ্জুরী লাভ করে এবং অনুদান প্রাপ্ত হয়। এ প্রতিষ্ঠান হতে অগণিত আলিমে হক্কানী বের হয়ে দেশ ও জাতির খেদমতে নিয়োজিত হন। প্রতি বছর ফুরফুরায় অনুষ্ঠিত ২১, ২২ ও ২৫ ফাল্গুন বার্ষিক মাহফিলে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মওলানাদের মাথায় তিনি নিজ হাতে পাগড়ী বেঁধে দিতেন। কামিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ মওলানাদের তিনি 'ফখরুল মুহাদ্দিসীন' এবং দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের 'কামারুল মুহাদ্দিসীন' উপাধিতে ভূষিত করতেন।

শায়খে ফুরফুরার ইন্তেকালের পর অনিবার্য কারণবশতঃ দাওরা (কামিল) হাদীসের ক্লাসের অবলুপ্তি ঘটে; কিন্তু বর্তমান শায়খগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আবার কামিল ক্লাস চালু হয়ে সুনামের সাথে চলে আসছে।[৪০]

নিউস্কীম মাদ্রাসাঃ

তিনি ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষামন্ত্রীর সহায়তায় নিউস্কীম জুনিয়র মাদ্রাসা ফুরফুরা স্থাপন করেন এবং এর মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করেন। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে এ মাদ্রাসা হাই মাদ্রাসায় পরিণত হলে সরকার হতে মাসিক ১৫০ টাকা করে অনুদান পায়। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ১৫০ হাত দীর্ঘ একটি পাকা গৃহ নির্মাণ করা হয়। এতে শায়খে ফুরফুরা ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা দান করেন এবং সরকার ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা সাহায্য করেন। ছাড়া তিনি তাঁর ২৮০০০ (আটাশ হাজার) টাকার সম্পত্তি মাদ্রাসায় ওয়াক্‌ফ করে দেন।[২৮] মাদ্রাসার সার্বিক খরচের ঘাটতিও তাঁর তহবিল হতে পুরণ করা হয়। দরিদ্র, অসহায় ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থে মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস (লিল্লাহ বোডিং) প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি হাসপাতালসহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন।

গ্রন্থাগারঃ

ফুরফুরার শায়খ কেবল মাদ্রাসাই প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং এর উৎস ও প্রাণ বই-পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য তিনি প্রথমে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ব্যয়ে ফুরফুরায় একখানা কুতুবখানা বা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ লাইব্রেরীর জন্য দুষ্প্রাপ্য তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস, মানতিক (তর্কবিদ্যা), হিকমত ও ফালসাফা (বিজ্ঞান ও দর্শন) এবং ওলী-আল্লাহগণের জীবনীগ্রন্থ প্রভৃতি সংগ্রহ করেন।

শিক্ষা সংস্কার ঃ

আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস সংস্কার -

ইংরেজ শাসনামলে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম জাতির ধ্বংসস্তুপের উপর কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস (১৭৭২-১৭৮৬) আলিয়া পদ্ধতির প্রবর্তক।[২৯] এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআনুল করীমের বিজ্ঞান দর্শন, নবী (স.)-এর বৈপ্লবিক জীবনাদর্শ, রাজনীতি, অর্থনীতি, জিহাদ প্রভৃতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীকের প্রাচীনপন্থী মানতিক, নাস্তিক্যবাদী যুগের অচল হিকমত ইত্যাদি মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত করা হয়, ইসলামী সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে তাদের মন-মানসিকতার ছাত্র তৈরির লক্ষে।

তদানীন্তন আলিয়ার সিলেবাসের যে ত্রুটিপূর্ণ চিত্র ছিল, তা উইলিয়াম হান্টারের ভাষায় এ ধরণের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সাত বছরকাল শিক্ষা লাভ করে ছাত্রগণ যে বিদ্যা নিয়ে বের হয়ে থাকে, সে বিদ্যার আর যে কোন ক্ষমতাই থাকুক না কেন, তার দ্বারা জীবনের দূর্দশা বৃদ্ধি ছাড়া লাঘবের কোন বিষয়বস্তু যে তাতে থাকতে পারে না, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।[৩০] এজন্য ফুরফুরার শায়খ ১৩৪০/১৯৩৩ সালে জমইয়তের তুলাবায়ে আরাবিয়া আসাম এর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে ভাষণ দান করেন এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে সিলেবাস সংস্কারের জন্য সরকারের নিকট দাবি পেশ করেন। এখানে উক্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত হলঃ

"আমার মতে কোন বিষয়ের শিক্ষাকে বাদ না দিয়ে যে যে ভাষা বাংলা ও আসামে প্রচলিত আছে সেসব ভাষায়ই শিক্ষা জরুরী। আমাদের এমন শিক্ষা পেতে হবে যাতে আমরা রাজদরবারে কাজ করতে পারি, স্বাধীনভাবে পার্থিব উন্নতি করতে পারি বেং সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করতে পারি। ইংরেজী ও আরবী উভয় শিক্ষায় ত্রুটির জন্য ছাত্রগণ জীবনের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না। ফলে চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীর চেয়ে অযোগ্য প্রাথী অধিক হয়ে যায়। আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলিম প্রার্থী না থাকায় অমুসলিম প্রাথী দিয়ে সে পদ পুরণ করতে হয়। এজন্য আমাদের চার দলে বিভক্ত হতে হবেঃ

একদল শাহী দপ্তরে কাজ করবে; দ্বিতীয় দল কৃষি ও শিল্পে; তৃতীয় দল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, চতুর্থ দল কুরআন হাদীসের নির্দেশানুসারে ইসলাম প্রচারে মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকবে। এরূপ হাদীসগণই (পথপ্রদর্শক) প্রকত শায়খ ও পথপ্রদর্শক। দুনিয়া ও আখেরাতের কর্তব্য সম্পাদনে স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, এজন্য কেউ ডাক্তারী পড়বে, কেউ কবিরাজী। আবার বর্তমান কলকারখানার যুগে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যা একান্ত আবশ্যক। এজন্য ওল্ডস্কীম ও নিউস্কীম উভয় পদ্ধতির মাদ্রাসা ও স্কুল কলেজ প্রয়োজন। স্কুল-কলেজে আরবী দ্বিতীয় ভাসা হিসেবে থাকবে।

বর্তমান নিউস্কীম ও ওল্ডস্কীম উভয় প্রকার সিলেবাস ছাত্রদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে তালীম ভাল হয়না। অবশেষে আরবীতে পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে হিন্দুস্তানে যেতে হয়। তা ছাড়া আজকালকার এই সিলেবাসে পাস করা মৌলভীগণ দীনি আকাঈদে, রূহানী জোশে ও কর্মশক্তিতে সব দিক দিয়ে অদক্ষ থেকে যায়। নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাসমূহের যথাশীঘ্র মাদ্রাসা সিলেবাসের সংস্কার এবং ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাসমূহে যথাশীঘ্র হাকিকী (প্রকৃত) শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ঃ

(১) বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট বঙ্গব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন বিষয়ক যে বিল সিন্ডিকেট কমিটিতে পেশ করেছেন, উক্ত বিল আইনে পরিণত করে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ সুগম করতে এ সভা সদাশয় গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করছে।

(২) বঙ্গদেশের হাইস্কুল সমূহের বিশেষ সাহায্য হেতু গর্ভণমেন্ট বেশির ভাগে আট লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন; কিন্তু মাদ্রাসা সমূহের বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করেননি। ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, মাদ্রাসাসমূহের সাহায্য বাবদ গর্ভণমেন্ট মোট ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। তারপর বিশ হাজার, তারপর সতের হাজারের কথা প্রকাশ পায়। এ সবের মূল কোনটি সত্য তা জনসাধারণ জানতে পারেনি। এ সভা মাদ্রাসার প্রতি এরূপ উদাসীনভার তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং মাদ্রাসাসমূহের যথাযোগ্য সাহায্য মঞ্জুরের জন্য গর্ভণমেন্টকে অনুরোধ করছে।

(৩) জুনিয়র মাদ্রাসার উর্ধ্বতন ক্লাসে অন্তত ২০ জন ছাত্র না হলে উক্ত মাদ্রাসাকে ডিপার্টমেন্ট মঞ্জুরী দেবে না এবং তাতে সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হবে না বলে বিভাগ কর্তৃক যে ঘোষণা করা হয়েছে, এ সভা উক্ত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং তা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করছে।

উপরোক্ত ভাষণ ও প্রস্তাবাবলী হতে সহজেই অনুমেয় যে, যুগ সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারক সাধন করে জাতিকে উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে কতটুকু সচেতন ছিলেন। ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার বিপক্ষে ১৯০৫ সনে প্রতিবাদ উঠে।[৩১] এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আবূ নসর ওহীদ[৩২] 'রিফর্মড মাদ্রাসা স্কীম' নামে বৃটিশ ভারত সরকারের নিকট এক প্রতিবেদন পেশ করার মাধ্যমে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা উঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। পরবর্তীকালেও এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ওল্ড স্কীম ও নিউস্কীম উভয় শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হন এবং তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় তাদের অভিমত পরিবেশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় পত্রিকার অভিমত তুলে ধরা হল-

'শিখা'য় 'শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়, "আমাদের শিক্ষার আদর্শানুযায়ী মুসলিম শিক্ষা প্রণালীর সংশোধন করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষায় আরবী, ফার্সী, উর্দু বিজাতীয় ভাষা একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে এবং নতুন পুরাতন সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। কেউ কেউ বলেন যে, আমরা দরিদ্র মুসলমান; স্কুল-কলেজের খরচ চলে না। মাদ্রাসা শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সুলভ। অতএব, অশিক্ষিত থাকার চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাই ভাল। কিন্তু আমার মনে হয়, মাদ্রাসার কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষাই ভাল, কারণ তাতে জাতীয় শক্তির অপচয় হয়না।"[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

সওগাত-এ 'মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক সম্পাদকীয়ে বলা হয়, "আমাদের প্রস্তাব মোটামুটি এই প্রাচীন ধরণের মক্তব মাদ্রাসা সমূহকে সোজাসুজি আধুনিক ধরণের স্কুলে পরিণত করতে হবে।"[৩৪]

সওগাত-এ 'ইসলাম ও মুসলমান' নিবন্ধে বলা হয়, 'আরবী, ফারসী, উর্দু বা মাদ্রাসা-মক্তবের মোহে পড়ে মুসলমানদের যে কি অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। এ শিক্ষাতে বুদ্ধি কোনরূপ প্রসার লাভ করতে পারে না। এতে অযথা সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়।"[৩৫]

এ অবস্থায় ফুরফুরার শায়খ শহরে, গ্রামে-গঞ্জে বক্তৃতা ও পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমদের ধর্ম শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে থাকেন। শুধু বক্তৃতার স্থায়ী কাজ হবেনা, এজন্য বঙ্গ আসামের গ্রামে, শহরে-নগরে ঘুরে ঘুরে নিজ হাতে অগণিত মাদ্রাসা স্থাপন করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি ১৩১৯ সালে পাবনায় হাদল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্বে এ জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন মাদ্রাসা ছিল না।[৩৬]

বঙ্গ বিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী (১২০৩ খ্রী.) উত্তর বঙ্গের রংপুরে প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৭] এর শত শত বছর পর বিশ শতকের গোড়ার দিকে শায়খে ফুরফুরা মহাস্থানগড়ে ওয়াজ করতে আসেন এবং শাহ্ সুলতান মাহী সাওয়ার (র.)-এর মাযার যিয়ারত করেন। পরে সেখানে আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং সেখানকার খাদিম সৈয়দ আলী (র.)- কে জনগণের হিতার্থে ইলম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তখন পর্যন্ত বগুড়া শহরে কোন মাদ্রাসা স্থাপিত হয়নি।

১৯৩৭ সালে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি আসামে হিদায়েত তথা ইসলামী শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ছুটে গিয়েছিলেন। সে দিন তিনি আসামের মহেন্দ্রগঞ্জে যে মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন, সে মাদ্রাসা সগৌরবে আজও তাঁর অমর স্মৃতি বহন করছে। এ সময় আবূ নসর ওহীদ দেশের ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাগুলো উঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা করলে ফুরফুরার শায়খের প্রবল প্রতিবাদের ফলে তাঁর চেষ্টা বিফল হয়ে যায়।[৩৮]

আধুনিক শিক্ষা ঃ

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) যে কেবল ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছেন, তা নয় বরং যুগের চাহিদার প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেন। অথচ ফারায়েযী আন্দোলনের প্রবর্তক হাজী শরীয়ত উল্লাহ অমুসলিম শাসক ইংরেজদের ভাষা শিক্ষাকে অবৈধ বলে ফতওয়া দেন।[৩৯] ফলে ইংরেজদের প্রতি জনগণের অনীহা জন্মে। এ সম্পর্কে মীর মোশাররফ হোসেন (মৃ. ১৯১২) বলেন, "আত্মীয় স্বজন, গুরুজনের ধারণা যে ইংরেজী পত্রিকা পড়লেই একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। ১৯২০ ও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, ধর্ম ভয়ে প্রাচীন ব্যক্তিরা তাদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা দেবার বিরোধী ছিলেন। 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৯ খ্রী.) পত্রিকায় ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতার কথা উল্লেখ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তৎকালীন এক শ্রেণীর মৌলভী আরবী ফার্সী ছাড়া অন্য ভাষা শিক্ষা করা অবৈধ বলে ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীকী তাঁর ভাষণে বলেন, "দুনিয়াবী প্রয়োজনের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা ইসলামে নাজায়েয নয়। নবী করীম (স.) তাঁর সাহাবী যায়েদ (রা.) কে ইবরানী (হিব্রু) ভাষা শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[৪০]

বই পুস্তক প্রকাশ ঃ

বইপুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার সাধন ও চিন্তাধারা প্রচার সহজতর হয়, একতা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু ফুরফুরার শায়খের আর্বিভাবের প্রাককালে অবিভক্ত বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষা বাংলায় ধর্মশিক্ষা করার প্রবণতা ও বই-পুস্তকের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। একথার স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ তদানীন্তন কালের একটি পত্রিকায় মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য-

"বর্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের পবিত্র ধর্মের বিমল জ্যোতি বঙ্গদেশীয় মুসলমানদের দ্বারা হীনপ্রভ ঃ হয়ে পড়েছে। আমাদের সমাজে ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মগ্রন্থের অভাবই এর একমাত্র কারণ। ধর্ম গ্রন্থের অভাব বলতে বাংলা ভাষায় ধর্মগ্রন্থের অভাব বলতে হবে। নচেৎ আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষায় আমাদের ধর্ম-গ্রন্থ এত অধিক পরিমাণ বিদ্যমান আছে যে, পৃথিবীর অন্য সমুদয় জাতির ধর্মগ্রন্থ একত্র করলেও আমাদের ধর্মগ্রন্থ সমূহের সমান হবে না বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু সে সব মহাগ্রন্থের মর্ম বুঝতে সক্ষম লোক খুবই বিরল।"[৪১] ফুরফুরার শায়খের পূর্বে লেখা ও বিবৃতির মাধ্যমে বাংলায় ইসলাম প্রচার ও কুসংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রে মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) মৃত্যু ১৮৬০ খ্রী. এর খেদমত ও অবদান অতুলনীয়। তাঁর রচিত ৪১-৪৬টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। আজও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর কিছু সংখ্যক পুস্তক সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সবগুলো গ্রন্থই উর্দু ভাষায় লিখিত বলে বাংলাভাষী জনসাধারণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। অপরপক্ষে ফুরফুরার শায়খের মিশন ও সংগঠনের পক্ষ হতে তাঁর আদেশ ও আপ্রাণ চেষ্টায় যে সমস্ত পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যা দু'হাজারের অধিক। উক্ত পুস্তকসমূহের মধ্যে কিছু ছিল প্রতিবাদমূলক, যা তৎকালীন বিদআতী বেশরা কথিত পীর, কাদিয়ানী, মিশনারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল এবং এমন কিছুসংখ্যক পুস্তক ছিল যার দ্বারা সাধারণ জনগণ মাতৃভাষা বাংলায় সহজে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যুগ সংস্কারক শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী (র.)-এর পূর্বে মাতৃভাষা বাংলায় এত অধিক সংখ্যক বই পুস্তক আহলে সুন্নত আল জামাআতের পক্ষ হতে প্রকাশিত হওয়ার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যাঁরা শতাধিক পুস্তকের লেখক তাঁরা হলেন ঃ যথাক্রমে বাংলার শীর্ষস্থানীয় মওলানা রুহুল আমীন (র.) মৃতু ১৯৪৫। ফুরফুরার শায়খের নির্দেশে তাঁর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা ১৩৫ খানা। অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শায়খ নিসারুদ্দীন আহমদ (র.) মৃত্যু ১৯৫২ ফুরফুরার শায়খের আদেশে তিনি যে সমস্ত পুস্তক রচনা করেন তার সংখ্যা অর্ধশতাধিক। প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক জমীর উদ্দীন বিদ্যাবিনোদন (র.) মৃত্যু ১৯৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

ফুরফুরার শায়খের মেজো সাহেবজাদা আবূ জাফর সিদ্দীকী, মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী (র.), আল্লামা ইবরাহীম জয়নগরী (২৪ পরগনা) মওলানা ময়েযুদ্দীন হামিদী (র.) মৃত ১৯৭১, মওলানা আফসার উদ্দীন (র.), মওলানা সূফী তাজাম্মুল হুসাইন সিদ্দীকী (র.), সূফী সদরউদ্দীন (র.) মৃত্যু ১৯৪০ মওলানা ইবরাহীম (হাদল, বাংলাদেশ), আল্লামা ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (র.) মৃত্যু ১৯৬৯, প্রফেসর মওলানা আব্দুল খালিম (র.) মৃত্যু ১৯৬৭, কবি মুজাম্মেল হক, মৌলভী মুনশী রিয়ায উদ্দীন, মোসলেম হিতৈষীর সম্পাদক মুনশী শেখ আব্দুর রহীম, মৌলভী আব্দুল হাকিম, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (মৃত. ১৯৫০) প্রমুখ। এরূপ আরও অগণিত ব্যক্তি তাঁর আদেশ ও যত্নে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। এছাড়াও ফুফুরার শায়খের সুহৃদ ভক্ত ও অনুগামী মুনশী মোঃ মেহেরুল্লাহ (র.) মৃত্যু ১৯০৭ খৃস্টান চক্রান্তের বিরুদ্ধে বই-পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে ফুরফুরার শায়খের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করেন।[৪২]

ফুরফুরা শায়খের নির্দেশ ও সহযোগিতায় প্রকাশিত পুস্তক ঃ

(১) ইসলাম এন্ড মোহামেডান ল (২) ইসলাম ও পর্দা (৩) ইসলাম ও সঙ্গীত (৪) ইসলাম ও বিজ্ঞান (৫) পীর মুরিদী তত্ত্ব (৬) কুরআন প্রসঙ্গ (৭) ইসলাম প্রসঙ্গ (৮) বাংলাদেশে বাতিল ফেরকাহ (৯) বালক নূর বা বাল্যশিক্ষা (১০) ছেলেদের নূরনবী (১১) কৃষকের উন্নতি ও দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার (১২) ধূমপানের অপকারিতা (১৩) তালীমে ইসলাম ও নামায শিক্ষা (১৪) হাদীস শিক্ষা (১৫) সরল অযীফা শিক্ষা (১৬) বৃহৎ নামায শিক্ষা (১৭) জাতীয় কল্যাণ (১৮) নূরুল হিদায়েত বা বিদআতী ফকীরের ধোঁকভঞ্জন (১৯) খিলাফত আন্দোলন পদ্ধতি (২০) সমাজ উন্নতি (২১) হুক্কা বিনাশ (২২) রদ্দে কাদিয়ানী (২৩) কাদিয়ানী রহস্য (২৪) কাদিয়ানী রদ (মোট ৬ খন্ড) (২৫) রদ্দে বিদআত (চার খন্ড) (২৬) যুলযাতে ওহহাবিয়া (২৭) রদ্দে শি'আ (২৮) ইসলাম ও মুহাররম (২৯) মুহাররম তাযীয়ায় ফাতাওয়া (৩০) গ্রামে জুম'আ বা হিন্দুস্থানের একটি ফাতওয়া রদ (৩১) গ্রামে জুমআ সম্বন্ধে মক্কা শরীফ ও হিন্দুস্থানের ফাতাওয়া (৩২) আল জুমআ (৩৩) গ্রামে জুমআর নামায পড়িলাম কেন? (৩৪) জুমআর দ্বিধা ভঞ্জন (৩৫) জুমআ বিরোধী আপত্তি (৩৬) গ্রামে জুমাআ (৩৭) জরুরী মাসায়েল (মোট ৩ খন্ড) (৩৮) ওয়ায শিক্ষা (মোট আট খন্ড) (৩৯) ফাতাওয়ায়ে আমীনিয়া (মোট ৭ খন্ড) (৪০) হানাফী ফিকহ তত্ত্ব বা মাসায়েল ভান্ডার (৪১) নাসরুল মুজতাহিদীন বা মাসায়েল খন্ড (মোট ৩ খন্ড) (৪২) বঙ্গানুবাদ মিশকাত শরীফ (মোট ৩ খন্ড) (৪৩) কুরআন শরীফের তাফসীর (৪৪) যাকাত ফিতরার বিস্তারিত মাসআলা (৪৫) খাঁ সাহেবের তাফসীরের প্রতিবাদ (৪৬) খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ (৪৭) খোন্দকারের ধোকা ভঞ্জন (৪৮) কিরাত শিক্ষা (৪৯) কামিউল মুবতাদিয়ীন (মোট ৩ খন্ড) (৫০) কিয়ামুল মুজতাহিদীন (৫১) মাসায়েলে সালাসা (৫২) মাযহাব ও তাকলীদ

Dhaka University Institutional Repository

(৫৩) ফাতাওয়ায়ে সিদ্দীকীয়া (৫ম খন্ড) (৫৪) হাকিকাতে মারিফাতি রব্বানীয়া (৫৫) তারীখুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস) (৫৬) বুরহানুল মুকাল্লিদীন বা মাযহাব মীমাংসা (৫৭) তরীকত দর্পণ (৫৮) ঈদ ও নারী (৫৯) দল্লীন ও যল্লীন মীমাংসা (৬০) দাফিউল মুফসিদীন (৬১) মসজিদ স্থানান্তরিত করার রদ (৬২) মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রতিবাদ (৬৩) নিকাহ ও জানাযা তত্ত্ব (৬৪) বীমা সম্বন্ধে আযাদের বাতিল ফাতাওয়া (৬৫) দাফন-কাফনের মাসআলা (৬৬) নিকাহ ও জানাযা তত্ত্ব (৬৭) আলাকাবুল মুসলিমীন (৬৮) ফিরকাতুন্নাজীন (৬৯) শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও পাদরীর ধোকা ভঞ্জন (৭০) ইসলামী বক্তৃতা (৭১) ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ (স.) (৭২) খ্রী. রদ (৭৩) আকায়েদে ইসলাম (৭৪) ইলমে তাসাওউফ (৭৫) ওযীফা শিক্ষা বা ইরশাদে সিদ্দীকীয়া (৭৬) মারিফাত দর্পণ (৭৭) রাহনোমায়ে আবরার (৭৮) মাইজ ভান্ডারের বাহাছ (৭৯) রদ্দে আযানগাছি (৮০) বাগমারী বাহাছ (৮১) দাফেয়ে যুলমাত ও দ্বীন ও দুনিয়ার শান্তি (৮২) হজ্জের মাসায়েল ও দুআ (৮৩) যাকাত-ফিতরার বিস্তারিত মাসায়েল (৮৪) জাল হাদীস (আল মওযুওয়াতের বঙ্গানুবাদ) (৮৫) মৌলুদ ও কিয়ামের ফাতাওয়া (৮৬) কামিল পরীরের আলামত (৮৭) যবেহ ও কুরবানীর মাসায়েল (৮৮) সংক্ষিপ্ত সহজ নামায শিক্ষা (৮৯) হযরত বড়পীর সাহেব (র.)-এর জীবনচরিত্র (৯০) সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.)-এর জীবন চরিত (৯১) ফারায়েয শিক্ষা (৯২) আফতাবে হিদায়েত ফী রদ্দে মাহতাবে জালালাত (৯৩) তাযকিরাতুস সালিহাত (৯৪) মাওলানা পরিচয় (৯৫) আখিরাতের সম্বল (৯৬) সুদ সমস্যা (৯৭) স্বভাব দর্পণ (৯৮) হুজ্জাতুল ইসলাম (৯৯) বঙ্গ আসামের পীর আউলীয়া কাহিনী (১০০) আখিরী যুহর (১০১) উমদাতুল ইসলাম (১০২) আমাদের সমস্যা (১০৩) তাযকিরাতুল ইযাম (১০৪) বিবি শওহারের মাসআলা (১০৬) শেরখানীর ফাতাওয়া (১০৭) সাইয়েদুল মুরসালীন (১০৮) রত্নখানি (১০৯) আমার প্রিয় রসূল (স.) (১১০) আমপারা তাফসীর (১১১) ইযহারুল হক বা কদমবুসীর ফাতাওয়া (১১২) নসীহতে সিদ্দীকীয়া (১১৩) কারামতে সিদ্দীকীয়া (১১৪) ইকামাতুস সুন্নত বা বিদআত খন্ডন (১১৫) দুদর্শার প্রতিকার (১১৬) প্রজাস্বত্ব আইন (১১৭) মহাজনী আইন (১১৮) ভোট ও ভোটার (১১৯) সরল টোটকা চিকিৎসা (১২০) গো- কোরবানী (১২১) তাবিযের কিতাব (১২২) স্ত্রীলোকের পর্দা সম্বন্ধে ফাতাওয়া (১২৩) ইরশাদে সিদ্দীকীয়া ফাইযাতে ফাতাহিয়া (১২৪) ইসালে সাওয়াবের ফাতাওয়া (উর্দু) (১২৫) শরীঅতের হুকুম জ্ঞানের অনুকূল (১২৬) রদ্দে বদগুমান (১২৭) নাজাতে আখিরাত (১২৮) মাসআয়েলে আরবাআ (১২৯) ওয়াযে ইসলাম (১৩০) বাতিল মতবাদ (১৩১) অমর কাব্য (১৩২) যবেহ কুরবানীর ফাতাওয়া (১৩৩) বাউল ধ্বংসের ফাতাওয়া (১৩৪) ভন্ড ফকীর (১৩৫) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন চরিত ও ধর্মনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ঃ

ইসলামী ভাবধারা ও সাহিত্য সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করতে, সরকার ও জনসাধারণকে বক্তব্য জানাতে এবং মুসলিম সমাজের অভাব অভিযোগ তুলে ধরতে ফুরফুরায় শায়খ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ জন্য তাঁর অনুগামীদের সম্পাদনায় ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব পত্রিকা বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়, তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) ইসলাম প্রচারক (১৮৯১), সম্পাদক মোঃ রিয়ায উদ্দীন (২) মিহির ও সুধাকর (১৮১৫), সম্পাদক আবদুর রহীম ও রিয়ায উদ্দীন (৩) হাফেজ (১৮৯৭), সম্পাদক আবদুর রহীম (৪) সুলতান (১৯০২), সম্পাদক রিয়ায উদ্দীন আহমদ (৫) নবনূর (১৯০৩), সম্পাদক সৈয়দ ইমদাদ আলী (৬) মোহাম্মদী (১৯০৩), সম্পাদক মাওলানা আকরম খাঁ[৪৩] (৭) মোসলেম হিতৈষী (১৯১১), সম্পাদক শেখ আবদুর রহীম (৮) আল-এসলাম (১৯১৫), সম্পাদক- মাওলানা আকরম খাঁ, পরে মনিরুজ্জামান (৯) বঙ্গনূর (১৯১৯), সম্পাদক- শেখ হাবীবুর রহমান (১০) ইসলাম দর্শন (১৯২০), সম্পাদক আব্দুল হাকিম (১১) ইসলাম জগত (১৯২৩), সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ইদ্রীস (১২) রওশনে হিদায়েতে (১৯২৪), সম্পাদক মোঃ ইবরাহীম (১৩) শরীঅতে ইসলাম (১৯২৪), সম্পাদক আহমদ আলী এনায়েতপুর (১৪) হানাফী (১৯২৬), সম্পাদক- মাওলানা রুহুল আমীন (১৫) হানাফী জামাআত (১৯২৬), সম্পাদক- শেখ হাবীবুর রহমান (১৬) আল-মুসলিম (১৯২৮), সম্পাদক- ফজলুল হক শেলবর্ষী (১৭) তরুণের ঝান্ডা, ইসলামের ডান্ডা (১৯৩০), সম্পাদক-অজ্ঞাত (১৮) সুন্নত আল জামাআত (১৩৩৯/১৯৩২), সম্পাদক- মাওলানা রুহুল আমীন (১৯) মোসলেম (২০) হিদায়েত ইত্যাদি।

==========

তথ্য ও টিকা নির্দেশ

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ই.ফা.বা. পত্রিকা, ১৯৯৮-৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২. আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দীকী, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১ম সং-১৯৮০, পৃ. ৯

৩. সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-১৯৭৬, পৃ. ৪৩

৪. মওলানা এম. ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬

৫. এস.এ. জাহাঙ্গীর, সৈয়দ আবদুল মতিন জাহাঙ্গীর, গাওসে যমান শাহ সূফী ফতহ আলী, ১ম সং, রবি আর্ট প্রেস, কলকাতা-১৩৮০ (১৯৭৩), পৃ. ১০৩-১০৪

৬. হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্করক ও সাধক, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ১০৩

৭. সৈয়দ মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন ও শেখ মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, A great religious and social reformer, ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দীকি (র.), ১ম সং, নাগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা-১৯৯০, পৃ. ১৪-১৫

৮. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পরিশিষ্ট, পৃ.২২২

৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

১০. ইসলামে অমূলক নতুন পথ ও মতের উচ্ছেদকারী ও বিলুপ্তকারী।

Dhaka University Institutional Repository

১১. রাসূল (স.) এর সুন্নাত জীবিতকারী।
১২. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পরিশিষ্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৬. দেওয়ান-ই-ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৫
১৭. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৯, পৃ. ১২৫
১৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-১
১৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫-৬
২০. শরীয়তে ইসলাম, ৫ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা, পৃ. ১৪২-৪৩
২১. এ মাহফিল বিদআত বর্জিত এবং সুন্নতে নববীর উপর প্রতিষ্ঠিত।
২২. উদ্ধৃত, তর্কবাগীশ, হাকীকতে ইনসানিয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
২৩. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্, অনু: এম.আনিসুজ্জামন, নতুন সং, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১৫৩-১৫৪
২৪. শরীয়তে ইসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৩৩৬/১৯২৯
২৫. Dr. Muhammad Enamul Haq, A History of Sufism in Bengal, 1st Ed Asiatic Society, Dhaka, Bangladesh, 1975.
২৬. এম. রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫
২৭. আবূ জাফর সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯ - ১৪
২৮. মওলানা রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, ২৭৬
২৯. Dr. A.K.M. Ayub Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, Down to AD 1980, 1st ed. Dhaka-1983
৩০. তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৩১. বাহাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
৩২. সৈয়দ মুর্তজা আলী, মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, এ.বি.বুক ষ্টোর, নিউমার্কেট, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ১৩৬-১৩৭
৩৩. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৭, পৃ. ১৫, শিখা পত্রিকা, ১ম বর্ষ, চৈত্র-১৩৩৩/১৯২৬
৩৪. সওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৩৫/১৯২৮
৩৫. সওগাত, ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৩৬/১৯২৯
৩৬. রওশন হেদায়েত, ৩য় বর্ষ, দশম সংখ্যা-১৩৩৩
৩৭. Ghulam Hussain Salim, Riyazu-S-Salatin (A history of Bengal), Tr. Abdus Salam, 1st Ed. Delhi, 1903, P. 594
৩৮. রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৩৯. ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ. ৪৫
৪০. তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; আবূ ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
৪১. বাহাউদ্দীন; প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩
৪২. বাহাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯
৪৩. বাহাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ও সমাজকল্যাণে তাঁর অবদান

(১৮৬৩ – ১৯৪৩)

জন্ম ও বংশ পরিচিতিঃ

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ১৮৬৩ খ্রী. এর ৫ই রবিউস সানী বুধবার ভারত ভারত উপমহাদেশের উত্তর প্রদেশের থানাভবন নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[১] এলাকাটি মুসলমানদের দ্বারা আবাদ হওয়ার পূর্বে রাজাভীম নামক এক ব্যক্তি আবাদ করেছিলেন। ফলে উহার নাম "থানাভীম" রাখা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে অধিক ব্যবহারের কারণে তা পরিবর্তিত হয়ে থানাভবনে পরিণত হয়।[২]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) জন্মের পর পিতৃকুল হতে তার নাম আবদুল গনী রাখা হয়। কিন্তু মাতৃকুল হতে নাম রাখা হয় আশরাফ আলী। তিনি একটি উচ্চ ও ধর্মীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা পরিপূর্ণ ছিল।

আশরাফ আলী এর বাল্যকালেই তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন। মাতার ইন্তেকালের পর তাঁর চাচী আম্মা নিজ পুত্রবৎ মনে করে লালন-পালন করতেন। বালক আশরাফ আলী পরিচিত ও অপরিচিতজনদের নিকট হতে বাল্যকালেই স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতা মুন্সী আঃ হক কঠিন প্রকৃতির ব্যক্তি হওয়া সত্বেও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তদ্রুপ তাঁর চাচী আম্মাও তাকে অন্যান্য ভাইদের তুলনায় অধিক ভালবাসতেন। তার জন্য বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। তিনি কখনো কোন শিক্ষক কর্তৃক প্রহৃত বা লাঞ্ছিত হননি। কারণ তিনি সর্বদা উস্তাদের কথা ভক্তি সহকারে পালন করতেন। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অপরের নিকটও তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন।

"আল্লাহর অসীম কৃপায় আমি যখন যেখানে অবস্থান করেছি সেখানে পরিচিত ও অপরিচিত সকলেরই প্রিয়জন ছিলাম।"[৩]

শিক্ষা জীবন ঃ

আশরাফ আলী থানভী তাঁর ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন বয়ঃক্রমকালে সর্বপ্রথম পিতা মুন্সী আঃ হকের নিকট লেখাপড়ার সূচনা করেন। তারপর তিনি মীরাটের অধিবাসী আখুনজী সাহেবের নিকট কুরআন পাঠ আরম্ভ করেন। থানা ভবনে ফিরে এসে মৌলভী ফতেহ মুহাম্মদের নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা শুরু করেন। ফার্সী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদের নিকট হতে। পরে স্বীয় মামা ওয়াজেদ আলী নিকট থেকে ফারসী ভাষার উচ্চস্তরের গ্রন্থ "আবুল ফজল" পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। হিজরী ১২৯৫/১৮৭৮ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দেওবন্দে' ভর্তি হন। সেখানকার দূরদর্শী ও বিজ্ঞ শিক্ষকগণ থানভীর বিচক্ষণতা ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখে অনুমান করেছিলেন যে, পরবর্তীকালে সে একজন যোগ্য আলিম ও জাতির পথপ্রদর্শক হতে পারবেন। যে কারণে তাঁকে প্রথম হতেই 'ইযযত ও সম্মানের সাথে দেখতে আরম্ভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে শিক্ষকগণের শুভ দৃষ্টি, অপরদিকে শিক্ষার প্রতি পরম আগ্রহে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ছাড়াও মানতিক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যুক্তি বিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রে এই ধীশক্তি সম্পন্ন ছাত্র অতি অল্পদিনের মধ্যেই যথার্থ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। যুক্তি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের ব্যাপারে তিনি নিজে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলেন, "বুযুর্গ ও মুরব্বীজনদের জুতা সোজা করে দেওয়ার বদৌলতে আমি মানতিক শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছি। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনি 'মছনবী যীর ও বম' দ্বারা তাঁর গ্রন্থ রচনার দ্বার উন্মোচন করেন।

তদানীন্তন কালের সর্বজন স্বীকৃত ক্বারী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মুহাজির মক্কীর নিকটে তিনি ইলমে ক্বিরাআত শিক্ষা করেন। যেহেতু তিনি বিষয়ের যথার্থতা পছন্দ করতেন এবং লৌকিকতা বিবর্জিত ছিলেন তাই আল্লাহও তাঁকে এমন সব উস্তাদের নিকট হতে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন, যারা কখনো লৌকিকতা পছন্দ করতেন না। মাওলানা থানভী তৎকালীন গ্রীক দর্শন শাস্ত্র ও অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ঐ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। আর এই দর্শন তাঁর নিকট শুধুমাত্র দর্শন শাস্ত্র হিসেবেই বিদ্যমান ছিলনা, বরং ইহাকে তিনি দীনিয়াত ও ইসলামিয়াত অনুধাবন করার কাজেও ব্যবহার করেছিলেন।[৪]

মাওলানা থানভীর ইলমী খিদমত ঃ

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম, ফকীহ, মুজতাহিদ, উপদেশদাতা, সংস্কারক, সূফী এবং 'ইলমী জগতের উজ্জ্বল চন্দ্র বলা যায়। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী, যা জনসাধারণের জন্য এত ব্যপ্ত ছিল, তার কিছু আলোচনা করা হল।

শিক্ষা ও সংস্কারের ক্ষেত্রে মাওলানা থানভী বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন। ধর্মীয় এমন কোন বিষয় নাই, যার প্রতি থানভীর চিন্তা কাজ করেনি। তিনি তাঁর বর্ণিত গোপন তত্ত্ব ও তথ্য এবং শরীয়ত ও হাদীসের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি যথাযথ বিশ্লেষণ করতে কার্পণ্য করেননি। তিনি ফিকহী মাসায়িল এবং তার যথার্থ সমাধান, খুতবা, বক্তৃতা, ইসলামী দর্শনের উপর সূক্ষ্ম চিন্তাধারা, তাসাউফ ও ধর্মীয় আচরণের গূঢ় রহস্য বিস্তারিত আলোচনা করে সমাধান দিয়েছেন এবং যা বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলি তৎকালীন ও বর্তমানকালের সুধীজনের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এ শুধু মাযহাব ও দ্বীনের অমূল্য সম্পদ নয় বরং উর্দু ভাষার উৎকর্ষতা সাধনে যথেষ্ট সহায়ক।

মাওলানা থানভী ব্যক্তিগতভাবে উর্দু ভাষার একটি বিশ্বকোষ। তিনি শুধু গ্রন্থ রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং অনেক সাহিত্যিক এবং সুধীজন তৈরী করেছিলেন, যারা পরবর্তীকালে উর্দু সাহিত্যের উপরে অনেক মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী ঃ

আনুমানিক (৯০০) নয় শতের অধিক গ্রন্থ তিনি উর্দু ভাষায় রচনা করেছিলেন। আব্দুর রহমান খান মুন্সীর ভাষায়-

"১৩৫৪ হিজরী/১৯৩৬ সনে মৌলভী আব্দুল হক ফতেহপুরী হযরত থানভীর গ্রন্থের একটি তালিকা ৮৬ পৃষ্ঠায় 'তা'লীপাতে আশরাফিয়া' নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার হিসাব অনুযায়ী থানভীর ছোট বড় গ্রন্থ ও পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় আটশত। যদি তাহার সাথে ঐ সকল গ্রন্থাবলীকে একত্রিত করা হয়, যাহা তাঁহার অনুসারীরা সহজীকরণ অথবা বিষয় অনুযায়ী একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে উহার সংখ্যা নয় শতের অধিক হবে।"[৫]

'তাজবীদুল কুরআন' ও 'মসনবী যীর ও বম' ভিন্ন সকল গ্রন্থ গদ্যে রচনা করেছেন। মাত্র ১৩/১৪ খানা পুস্তিকা আরবী ভাষায় এবং তিন খানা ফার্সী ভাষায়, বাকী সবই উর্দু ভাষায় রচনা করেছিলেন।

পুস্তিকা ও পত্রিকা ঃ

উর্দু ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা যেমনঃ আল-ইবক্বা, আন-নূর, আল-মুবাল্লিগ, আল-হাদী, আল-বালাগ, আল ইমদাদ, আশরাফুল উলুম, আল-আশরাফ ইত্যাদি উর্দু ভাষায় থানা ভবনের খানকা হতে ও তাঁর অনুসারীরা বিভিন্ন শহর হতে ছাপিয়ে নিয়মিত প্রচার করতেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন নতুন মকতব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা মাওলানা থানভীর চিন্তা ও ভাবধারা নিয়মিত প্রসার ও প্রচারে সহায়তা করত।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর সংস্কার ঃ

পৃথিবীর যে কোন দেশে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যাবলীতে বিভিন্ন উপায়ে অবক্ষয় সৃষ্টি হতে পারে। কখনো ইহা দেশীয় বা জাতীয় আচার অনুষ্ঠানের আকৃতিতে অনুপ্রবেশ করে, যা শরীয়তের বিধানে রূপ লাভ করে। আবার কখনো ইহা অন্য দেশ ও সংস্কৃতির বিধান হিসাবে প্রবেশ করে। কখনো ইহা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপ লাভ করিয়া আবার কখনো শরীআতের বিধান বর্হিভূত আন্দোলন হিসাবে মানুষের মন মগজে প্রবেশ করে তাকে কলুষিত করে দেয়। কখনো উপযুক্ত নেতার অভাব আবার কখনো ধর্মীয় কৃষ্টি-সভ্যতার অজ্ঞতার কারণে একটি সমাজ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই সকল বেদ্বীনী কার্যকলাপ ও আচার অনুষ্ঠান ধর্মীয় কাজে বাড়াবাড়ির সৃষ্টি করে বিদআতী কার্যকলাপের অনুপ্রবেশ সহজতর করে দেয়। মাওলানা থানভীর ইসলাহ ও সংস্কারমূলক কার্যকলাপ মুসলমানদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পূর্ণ সহায়তা করে। তার বক্তৃতামালা, বাণী যা হাজার হাজার বিষয় সম্বলিত, মানবের অপসংস্কৃতি, বিদআত, কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাধারা এবং আচার অনুষ্ঠানের বিপদ হতে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। তার এই লেখনী ও আন্তরিক প্রচেষ্টা তৎকালীন মানব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল।[৬]

ধর্মীয় আচারের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনঃ

মাওলানা থানভীর নিকটে ধর্মই মানুষের জীবন এবং মুমিনের প্রধান অবলম্বন। তিনি উম্মতে মুসলিমার সকল দোষ-ত্রুটি বুঝিতে পারতেন। দ্বীন যা মানুষের প্রধান সম্পদ, তা রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ জ্ঞানও আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। দীন-দুনিয়ার মধ্যে বৈপরীত্য দূরীভূত করে তার আসল প্রতিচ্ছবি জনসমক্ষে প্রকাশিত হউক, এই ছিল তার একান্ত কাম্য। 'মুমিনের প্রত্যেকটি কাজই ইবাদতের শামিল।' জীবন-যাপন, রুযী- রোযগার, জ্ঞানার্জন, আল্লাহর নির্দেশনাবলী যথার্থ পালন, এক কথায় জীবনের প্রত্যেকটি কাজ দীনের নির্দেশাবলীর বাহিরে নয়, তাসাওউফ ও তরীকত হতেও পৃথক নয়। বরং শরীঅতের বিধি বিধান অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করাই আসল তাসাউফ এবং তরীকতের মূল। উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহার সলুকের উৎস। ধর্ম এবং ইসলাম শুধু কতগুলি 'ইবাদত ও 'আকাইদের সমষ্টির নাম নয় বরং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অংশও। মানুষের মনে দুঃখ-কষ্ট দেয়া, উপকার করে তা বলে বেড়ান, অন্যকে ছোট এবং নীচ মনে করা, অপরের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া, আত্মম্ভরিতা, আত্মগর্ব, অসম্মান ও অসযোগিতা করাই ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থী।

আউলিয়া ও সংস্কারকদের প্রধান কাজই ছিল জাতি তথা সমাজের চেহারাকে নির্মল রাখা। যদি সমাজের মানুষেরা ধর্মীয় বিধানগুলি যথার্থ পালন না করে অথবা হৃদয়ঙ্গম না করতে পারে, তা হলে তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন দেখা দিবে। আর যে সকল মাসআলা-মাসায়িল জীবন চলার পথের মূলমন্ত্র, উহাই ঈমান ও আকাঈদ সংরক্ষণের চাবিকাঠি। সর্বপ্রথম মাওলানা থানভী দ্বীনি মাসআলা-মাসায়িলের সংরক্ষনের যথার্থ প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "যে সকল শিক্ষালয়ে পার্থিব জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে সেই বিষয়ের গ্রন্থাদি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতা সেই বিষয়ের বিজ্ঞজন কর্তৃক লিখিত এবং তাঁহাকে সেই বিষয়ের শিক্ষক দ্বারা পড়াইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহা হইলে দ্বীনি শিক্ষায় যাহার সম্পর্ক পারলৌকিক জীবনের সাথে, তাহাতে এইরূপ দুর্বলতা কেন করা হয়?" কোন বিষয় ও কাজের সূচনাদি যদি যথার্থ ভাবে চিহ্নিত করা না যায়, তাহা হইলে উহা শুদ্ধ হয় না। কেননা কোন কাজের সূচনা উহার ভিত্তির স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। যাহার বুনিয়াদ নড়বড়ে উহার উপর শর্ত কারুকার্য খচিত অট্টালিকা নির্মাণ করিলেও উহার কোন মূল্য নাই। বস্তুতঃ মাওলানা থানভী তাহার সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজ দ্বারা একজন প্রকৃত মুমিন হওয়ার বিধান তৈরী করিয়াছিলেন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ইলমুল কুরআন ঃ

(১) আদাবুল কুরআন (২) আহসানুল আছাছ (৩) আত্তাকসীর ফীত্তাফসীর (৪) আল হাদী লিল হায়য়ান (৫) আত্তারতীবুল লতীফ ফী কিসসাতিল কালীম ওয়াল হানীফ (৬) ইয়াদগারে হক্কে কুরআন (৭) ইসলাহে তরজমা-ই দেহলভীয়া (৮) ইসলাহে তরজমা-ই-হায়রাত (৯) আত্তাওয়ারুজাহ মা'ইয়াআল্লাফু বিত্তাশাব্বুহ (১০) উযুহুল মাছানী (১১) ছিবকুল গায়অত যিয়াদাত (১২) জামালুল কুরআন (১৩) তরজমা-ই-কুরআন পাক (১৪) তাফসীরে বয়ানুল কুরআন ১২ খন্ড (১৫) তাজবীদুল কুরআন (১৬) যহুরুল কুরআন (১৭) তাসবীরুল মুকাত্তাআত (১৮) তানসীতুত্তাবা (১৯) তাকরীর লি বাদিল বানাত (২০) তামহীদুল ফারাশ (২১) তাবসীরুজ জুজায (২২) তাকদীসুল কুরআনুন মুনীর (২৩) আন তাদলীসেত্তাসাবীর (২৪) নুকতাতুল উনওয়ান ফী আয়াতায় সুরাতুল ইমতিহান (২৫) মুতাশাবিহাতুল কুরআন (২৬) মাসায়িলুস সুলুক মিন কালামিল মুলূক (২৭) মাসাহাতুল বায়ান ফী ফাসাহাতিল কুরআন (২৮) যিয়াদাত আলার রিওয়ায়াত (২৯) রফইল খিলাফ ফী হুকমিল আওকাফ (৩০) রফইল বিনা।[৯]

ইলমুল হাদীস ঃ

(১) আল-মিসকুয যাকী (২) আছ ছওয়াবুল উলা (৩) ইতফাউল ফিতান (৪) আল ইদরাক ওয়াত্তাওয়াছছুল ইলা হাকীকাতিল ইশতিয়াকি ওয়াত্তাওয়াসসুল (৫) ইলাউস সুনান (২১ খণ্ড), (৬) আত্তাশাররুফ বি মারিফাতিত্তাসাওউফ (৪ খন্ড) (৭) আছছালাহীন (বিশিকলি জদূল) (৮) জামিউল আছার (৯) তাবীউল আ-ছা-র (১০) যাদুস সা'য়ীদ (১১) মুআখখিরাতুয যুনুন (১২) হিফযি আরবাঈন (১৩) হাকীকাতুত্তারীকাতি মিনাস সুন্নাতিল আনীক্বাহ (১৪) তাকমিলাতুত্তাসাররুফ (১৫) তাসহীলিত্তাশাররুফ (১৬) হায়াতুল মুসলিমীন (১৭) শওকে ওয়াতান।[১০]

ইলমুল ফিকহ ঃ

(১) আকমালুল আদয়ান (২) আল ফি'লুল মুহাররম (৩) আল কওলুল আহলী (ফী ওয়াকফি জামি মসজিদ দেহলভী) (৪) আ'দাউল জান্নাহ (৫) আল হীলাতুন নাজিযাহ লিল হালীলাতিল আজিযাহ (৬) আল কওলুস ছাওয়াব (৭) আতত্বক্বা (ফী আহকামির রুক্বা) (৮) আল হককুস সিয়াম (ফী তাহকীকে উজরাতুন নিকাহ) (৯) আত্তাত্তবী আল ফাসাদিত্তাওযীহ (চাঁদা সম্পর্কে) (১০) আসসাআত লিত্তাআত (১১) আসসাকাতুল মুনকার আদাবুল মাসাজিদ (১২) আল কওলুল আহকাম ফী তাহকীকে মালা ইউলযাম (১৩) আদাবুল মাসাজিদ (১৪) আগলাতুল আওয়াম (১৫) আল ইকতিলাফ লিল ইতিরাফ (১৬) আল মাকালাতুল মুতামালিকাহ ফী তাসাওউবিল হালীলাতিল হালিকাহ (১৭) আত্তাহরীস আলা সালিহিত্তারীজ (১৮) আল কওলুল বদী ফী ইশতিরাতিল মিসরি লিত্তাজমী (১৯) আল খুতুবুল মাযীযাতু লিল কাওলিল মুনীবাহ (২০) আল ইকতিসাদ ফিত্তাকলীদ ওয়াল ইজতিহাদ (২১)

Dhaka University Institutional Repository

আননাসরু লিল আশার (২২) আহকামুল ঈক্কান লিল আকসামিল ইতমিনান (২৩) ইমদাদুল ফাতাওয়া (২৪) ইলকাউস সাকানাহ (২৫) খিতাবুন নুদওয়াহ (২৬) কাশফুল কাসওয়াহ (আন ওয়াজহির রিশওয়াহ) কালিমাতুল ক্বাউম ফী কলিমাতিস সাওম (২৭) ছিবাতিস সতুর (২৮) জযূলুল কালাম (ফি'আবলিল ইমাম) (২৯) জালাউল আবনা (৩০) তাহযীরুল ইখওয়ান (আনির রিযকিল হিন্দুস্থান) (৩১) তাহকীকুত্তাশাব্বুহ বি আহলিস সাকাম (৩২) তাদীল আহলিদ দাহার (৩৩) তাতিম্মাতি ইমদাদুল ফাতাওয়া (৩৪) ফতোয়া-ই-আশরাফিয়া (৩ খন্ড) (৩৫) বেহেশতী যেওর (১১ খন্ড) বেহেশতী গওহর (৩৬) মাসায়িলি আহলির খালা (৩৭) কাহরাতুল আযওয়ায (৩৮) যাকাতুল আরদি ফী সিবাতিল আরদি (৩৯) রফউল ইরতিবাত (৪০) রিসালা বস্তে মাসাইল (৪১) রদ্দিত্তাওয়াহহুদ (ফী তালাকি যাত্তিআদ্দুদ) (৪২) রাফিউদ দানাক আল মানাফিইল বিনক (৪৩) রফউল লজ্জ ফী শানাআত কালামিল হজ্জ(৪৪) সাফাইয়ে মুআমালাত (৪৫) সায়িবুল কালাম ফী হুকমি মানাসিকিল কালাম (৪৬) আত্তারজীহুর রাজিহ।[১১]

ইলমুল আকায়িদ ঃ

(১) আকসীর ফী ইহবাতিত্তক্বদীর (২) আহকামুত্তাজাল্লী (৩) আহকামুল ঈক্কান (৪) আল হুকমুল হক্কানী ফী হিযবিদ্দাগাফানী (৫) আল কাসুরুল মাশীদ লিল আসরিল জাদীদ (৬) আল হুজ্জাতুল ইনতিহায়িয়াহ আলাল হুজ্জাতিল বাহায়িয়া (৭) উবুরুল বারারী ফী সুরুরিয যারীর (৮) কাসরাতুল আযওয়াজ লি সাহিবিল মিরাজ (৯) তাযয়ীলি সরহি আকায়িদ (১০) খুলুদুল কুফফার ফিন্নারি জাযায়ান আলাল ইসরার (১১) জাযাউল আমাল (১২) জুহুরুল আদমি বিনূরিল ক্বাদামি (১৩) তুলুউল বাদরি ফী সুতুহিল কাদ্বরী (১৪) তানভীরুস সিরাজি ফী লায়লাতিল মিরাজ (১৫) নমুজায বাজি মুতাকিদাতি ইবলিল আরাজ (১৬) নাফিউল ইশারাহ ইলা মানাফিইল ইসতিখারাহ (১৭) তাগয়ীরিল উনওয়ান ফী বাদি ইবরাতি হিফযিল ঈমান (১৮) বাসতুল বানান (১৯) শাককুল যায়ের ফী হাক্কিল গায়িব (২০) হিফযুল ঈমান।[১২]

ইলমুল কালাম ঃ

(১) আল ইনতিবাহাতুল মুফীদাহ 'আন শুবহাতিল জাদীদাহ (২) আল মাসালিহুল আক্বলিয়া (৩) আল খিতাবুল মালীহ্ ফী তাহকীকিল মাহদী ওয়াল মাসীহ (৪) আল কউলুল ফাদিল বাইনাল হাক্কি ওয়াল বাতিল (৫) আত্তাদীবু লিমান লায়সা লাহু ফিল ইলমি ওয়াল আদাবি নসীব (৬) আত্তানবীহুত তুরাবী ফী তাযইহী ইবনিল আরাবী (৭) আল ফতহু ফী মা ইয়াতাওয়া বিররূহ (৮) আল হক্ক (৯) আন্নাঈমু ফিল জাহীম (১০) আল কালিমাতুত্তাম্মাতু ফিন্নবুওয়াতিল আম্মাহ (১১) আল কওলুল আনকা ফী তাহকীকি ইমকানুল আবদা (১২) ইকামাতুত্তামাহ আলা যাযমি বাকায়িল নবুয়্যাতিল হাকীকাতিল আম্মাহ (১৩) ইরসালুল হুবুর ইলা ইরসালির হুনুদ (১৪) ইমারাতুল আলামি বি-ইমারাতিল আদমি (১৫) কায়িদে কাদিয়ান

Dhaka University Institutional Repository

(১৬) তালীমুদ্দীন মাআ তাকমীলুল ইয়াক্বীন (১৭) তাকতীফুস সামারাত ফী তাহকীকিস সাফারাত (১৮) তাকদীসুল কুদুসি আনিত্তাদলীস (১৯) তাদবীরুল ফালাক ফী তাতহীরিল মালাক (২০) নিহায়াতুল ইদরাফ ফী আকসামিল ইশরাক (২১) নিমাল আউন ফী তাহকীকি তাওবাতি ফিরআউন (২২) বুলূগুল গায়াহ ফী তাহকীকি খাতিমিল ওলায়াহ (২৩) রফয়ির রহমাহ আনমানা ওয়াসইর রাহমাহ (২৪) হিফযুল হুদুদ লিহুকুকিল যদূদ।

উসুল আল ফিক্হ মা'আনী, হিকমত, মানকিতঃ

(১) আল মাদার (২) দিরায়াতুল ইসমাত (৩) আশারাহ উরূস (৪) মিয়াতু দুরূস (৫) তালখীসুল মানা (৬) তাসহীলুল মা'আলী (৭) তালখীসুস শরীকাহ (৮) তালখীসু হিদায়াতিল হিকমত (৯) তালখীসুল বিদায়াহ (১০) তাইসীরুল মানতিক (১১) তালখীসুল মিরকাত।[১৩]

তাসাওউফ ঃ

(১) আত্তাকাশশুফ (২) আমাছিলুল আকওয়াল লি আফাদ্দলির রিজাল (৩) আছসুন্নাতুল জালিয়্যাহ (৪) আনওয়ারুল মুহসিনীন (৫) আমওয়াজে তলব (৬) আহকামুত্তাজাল্লী (৭) আর রফীক ফী সাওয়ায়িত্তারীক (৮) আননুকাতুদ দাকীকাহ (৯) আনওয়ারুল উজূদ ফী আওয়ারিশ শুহুদ (১০) আত্তাজাল্লীউল আজীম ফী আহসানি তাকবীম (১১) আল ইবতিলা লি আহলির ইসতিফা (১২) আল জালাওয়াস সাওফ ফির রিজা ওয়াল খাওফ (১৩) আরদুল আকওয়াল (১৪) আল ইয়াম্ম ফীস সাম্ম (১৫) আলতাম ফী ইসমী (১৬) আলবাসায়ির ফিদদাওয়ায়ির (১৭) আত্তাহরীদ আলা সালিহিত্তারীদ (১৮) আল ইরশাদ ইলা মাসআলাতিল ইসতিদাদ (১৯) আল হাসীসাহ ফী হুকমিল ওয়াসওয়াসাহ (২০) আল-ইতিদাল (ফী মুত্তাবাআতির রিজাল) (২১) আল-কওলুল ফাসল (ফী বাদি আছারিল ওয়াসল) (২২) ইসলাহুল মিরাজ (২৩) আত্তাশবীহুত তুরাবী ফী তানযীহি ইবনিল আরাবী (২৪) আল কওলুস সহীহ ফী তাহকীকে বাদি আজযাই দোয়াযদাহ তাসবীহ (২৫) ইসলাহুল মিজায বি ইসলাহী ইলাজ (২৬) আল উযুরু ওয়াল নুযূর (২৭) আল ইসতিহবার লিল ইহতিযার ফী তাকাল্লিয়াতিল আতওয়ার (২৮) আল মা'লুমাতুল আলা হুকমিদ দ্বাল্লাহ (৩০) আর রিফকুল মানছুর (৩১) আত্তাখফীক ফিল ইখতিয়ারিদ দায়ীফ (৩২) আদ্দালালাতু লি আহলিদ দালালাহ (৩৩) আস সাহীফাতুল ফাদিলাতু ফী ইসলাহিল ওয়াছিলাতি ওয়াল আজিলাহ (৩৪) ইরফানি হাফিয (৩৫) কালীদে মসনবী (৮ম খন্ড) (৩৬) কাসদুস সাবীল (৩৭) খাতিমাতুল খায়র (৩৮) খুসুসুল ইকাম ফী খুসুমিল হিকাম (৩৯) খাইরুদ্দাল্লাহ (৪) ছাদ্দুল গালাত ওয়াল মাকাসিদ (৪১) তালীমুদ্দিন (মুকাম্মাল) (৪২) তালীমুত্তালিব (৪৩) তারবিয়াতুস সালিক (মুকাম্মাল) (৪৪) তাকমীলুত্তাসাররুফ (৪৫) তায়ীদুল হাকীকাহ (৪৬) তামীযুল ইশক আনিল ফিসক (৪৭) তানবীহাতে ওসিয়ত (৪৮) তাসবীয়াতুস সাতহ (৪৯) তাসহীলুত্তারীখ (৫০) দুখুল ও খুরূজ বর বর নুযুল ও উরূজ (৫১) নিমাল মানারা (ফী সহীহিল মুনাদা) (৫২) বিনাউল কুব্বাহ আলা বিনাইল জুব্বাহ (৫৩) বুলূগুল গায়াহ ফী

Dhaka University Institutional Repository

তাহকীকে খাতিমিল ওলায়াহ (৫৪) বাওয়াদিরুননাওয়াদির (৫৫) মাআরিফুল আওয়ারিফ (২ খন্ড) (৫৬) মাসায়িলুস সুলুক (৫৬) মুলাখখাসুল আনওয়ার ওয়াজাজ্জাল্লী (৫৭) সামায়িলে মসনবী (৫৮) মাআরিফুল মা'আরিফ (৫৯) মসনবী যীর ও বম (৬০) মাকতুবি মাহবুবিল কুলুব (৬১) রফইশ শুকুক (৬২) রফয়িদ দায়ক আন আহলিত্তারীফ (৬৩) রো নোমায়ে মসনবী (৬৪) রফয়িল গালাত লি দফয়িশ শাত্বাত (৬৫) রিসালা সায়্যিদুল হাইয়াহ ফী হদ্দিল বাইয়াহ (৬৬) রবত দর ওজুদে খালক ও ওজুদে হক (৬৭) লামিই আলামতে আউলিয়া (৬৮) শামসুল ফাদায়িল লি তাসমির রাযায়িল (৬৯) শাজারাতুল মুরাদ (৭০) হক্কুস সিমা (৭১) হাকীকুত্তারীকাহ (৭২) হুসনুল ইলাজ লিসুয়িল মিজায (৭৩) হালুল ইশকাল আলা জরুরাতিশ শায়খ মা'আ উজুদিল ইখতিয়ার ফিল আমাল।[১৪]

ইসলাহিয়াত ঃ

(১) আত্তাহকীকুল ফারীদ ফী হুকমি আলাতি তাকরীরিস সওয়াবিল বায়ীদ (২) ইসলাহিল মা'তুহ ফী তারীফিল হারামি ওয়াল মাকরূহ (৩) আদাবুল আখয়ার (৫) আখবার বীনী (৬) আফকার বীনী (৭) আল মাওয়াহিব (৮) আগলাতুল আওয়াম (৯) আখবারুয যালযালা (১০) ইসলাহুর রুসুম (১১) ইসলাহুল খিয়াল (১২) ইসলাহি ইনকিলাব (১ম ও ২য় খন্ড) (১৩) ইলাজুল খিয়াল (১৪) ইসলাহুন নিসা (১৫) ইলাজুল কাহতি ওয়াল ওবা (১৬) তাসহীহুল ইলমি ফী তাকবীহিল ফিলমি (১৭) তাহকীক তালীমে আংরেজী (১৮) তাফসীলুল কালাম ফী হুকমি তাকলীলুল কালাম (১৯) তাসহীহুত তারীফ (২০) নসীব নামা বা জওয়াবে ওসিয়তনামা (২১) ফায়সালা হাফতে মাসআলা (২২) সাজারাতুল হিকাম (২৩) হক্কুস সিমা।[১৫]

আযকার ঃ

(১) আল কওলুস সহীহ ফী তাহকীকে দোয়াযদাহ তাসবীহ (২) আওরাদে রহমানী (৩) আল ইসতিবসার ফী ফাদলিল ইসতিগফার (৪) আমওয়াজে তলব (৫) কুরুবাতিল ইনদাল্লাহ ওয়া সালাওয়াতির রাসূল (৬) খাইরুদ্দাল্লাহ (৭) যাদুস সায়ীদ ফীস সালাতি আলান্নাবিয়্যি (৮) তাতিম্মায়ে কুরুবাতিন ইনদাল্লাহ (৯) তরীকা-ই মউলুদ শরীফ।

তাযকার ঃ

(১) তাত্তারতীবুল্লাতীফ ফী কিসমাতিল কালীম ওয়াল হানীফ (২) আসসুন্নাতুল জালীয়্যাহ ফিল চিশতিয়াতিল আলীয়াহ (৩) আনওয়ারুল মুহসিনীন (৪) আহসানুত্তাহহীন লি মাকূলা সায়্যিদিনা ইবরাহীম (৫) আল বয়ানুল মতীন ফী বাদি আহওয়ালিশ শায়খ শামসুদ্দীন (৬) ইয়াদে ইয়ারান (৭) ইয়াদগার দরবারে পুর আনোয়ার হযরত খাজা আজমীরী (রহ.) (৮) খাওয়ানে খালীল (৯) তালীমুত্তালিব (১০) তাহসীন-ই-নারুল উলুম তাযয়ীনে আনওয়ারুল নুজুম (১১) নসরুতত্বিব ফী যিকরিন্নাবিয়্যাল হাবীব (১২) যিকরি মাহমুদ (১৩) শাম্মুতত্বীব (১৪) সায়্যিদিনা ইউসুফ (১৫) শরীফুদ দিরায়াত (১৬) হিকায়াতে মওইযত।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

সিয়াসিয়াত ঃ

(১) আর রওজাতুল মুনাযারাহ (২) আস সুহুফুল মানশুরাহ ফী ফাদায়িলিল মিয়াতি আনশুরাহ (৩) আল মাহফুযুল কবীর লিল হাদিয়্যি সাগীর (৪) আহকারকে মাসলাক কে সারাহ (৫) আহকামি ইবতলাফে ফী আহকামিল ইখতিলাফ (৬) আশ শুকরু ওয়াদ দু'আউন নাসরি ওয়া বিন্নাস ইয়াউমুল লিক্বা (৭) কন্দে দেওবন্দ (৮) তালবীসুল আরায়েফ ফী তাসবিহীনা ইন্ট্রাইক (৯) তানজীমুল মুসলিমীন (১০) তাফহীমুল মুসলিমীন (১১) দাম্মি শারুদ্দাবাল ফী যম্মে শারুদ্দাবাল (১২) দাওয়াতুদ্দাঈ (১৩) দাওয়াতুল হক (১৪) দফই বাদুস সুবহাত আলাস সিয়াসিয়াত মিনাল আয়াত (১৫) মুআমালাতুল মুসলিমীন (১৬) সিয়ানাতুল মুসলিমীন (১৭) শাক্কুল গাইন ফী হক্কি আলী ও হুসাইন (১৮) হিকায়াতুশ শিকায়াত।[১৭]

মুতাফাররিকাতঃ

(১০ আত্তারায়িফ ওয়ায যারায়িফ (২) আল-কওলুল আহকাম (৩) আশরাবে আসরাব (৪) আননুখাবু মিনাল খুতাব (৫) আলকালিমুদ্দাল্লাহ (৬) আররিকক্বুল মানসুর (৭) আল কালিমুত্তায়্যিব (৮) আল্লাতায়িফ লিত্তায়িফ (৯) আমাছিলুল আকওয়াল লি আফাদিলির রিযাল (১০) আশশাওয়ারিফু ফিল খাওয়ারিকি (১১) আল ইনছিদাদ বি ফিতনাতিল ইরতিদাদ (১২) আল ইসতিবসার ফী ফাদলিল ইসতিগফার (১৩) আত্তাআররুফ ফী তাহকীকেত্তাসাররুফ (১৪) আমালে কুরআনী (১৫) আছার (১৬) আওরাদে রহমানী (১৭) আল খুতাবুল মাছুরা ফীল আছারিল মাশহুরাহ (১৮) আরদুল আকওয়াল ফী আরদিল আমাল (১৯) আল মাসালিহুল আকলিয়া লিল আহকামিন নকলীয়্যাহ (৩ খন্ড) (২০) ইমদাদুল মুশতাক (২১) ইলাজুল কাহতি ওয়াল ওবা (২২) কারামাতে ইমদাদিয়া (২৩) কামালাতে ইমদাদিয়া (২৪) খাত্তাম্মে ফোরকানী (২৫) খাতিমাতুল খায়র (২৬) চার জুয়ে বেহেশত (২৭) গারায়িবুর রাগায়িব (২৮) ছাকায়াতুস সায়ির (২৯) জমায়িস সুকুক ফী কমহিশ শুকুক (৩০) তাদীলুত্তাকভীম (৩১) তারজীহুর রাজিহ (৩২) তানশীদুল আসমা (৩৩) তাহসীনে দারুল উলুম (৩৪) তাফসীলুল হুনুরীয়াত (৩৫) তাহকীকে তালীমে আংরেজী (৩৬) দরজা ই উদু (৩৭) নায়লুশ শিফা ওয়া ইয়ালআনিল মুস্তফা (৩৮) নুসহিল ইখওয়ান ফী হুরুফিযযামান (৩৯) নফীরী বাশার ওয়া কালামি নফীরী (৪০) মাওয়ারিদুল আওয়ায়িদ (৪১) মিয়াতু দরূস (৪২) যাওয়ালুস সুন্নাতি ফী আমালিসসুন্নাতি (৪৩) যিয়াউল আফহাম মিন উলুমিল বাযিল আলাম (৪৪) রফয়িল আগলাত (৪৫) লওহুল আলওয়াহ (৪৬) সাফাতুল মুনকারি লি আ-ফা-তিল মুনকারি (৪৭) সাওয়াদে খুবী (৪৮) সিদকুর রুয়া (৪৯) সাবই সায়্যারাহ (৫০) সাযারাতুল হুকমিল মাওয়াহিব।

Dhaka University Institutional Repository

মাকতুবাত ঃ

(১) আল মালুমাতুল ইমদাদিয়াহ (২) আল মিফতাহুল মানুবী (৩) আল মাহফুযুল কবীর (৪) ইবাদাতুর রহমান (৫) খিতাবুন নুদওয়া (৬) খুতুতি খুবী (৭) জিয়াউল আফহাম (৮) মাকতুবাতে ইমদাদীয়াহ (৯) মাকতুবি মাহবুবুল কুলূব (১০) মাকতুবাতে খায়রাত (১১) রিয়াযুল ফাওয়ায়িদ।

সফরনামা ঃ

(১) খায়রুল হুযুর ফিল কানপুর (২) খায়রুল উবূর ফী সফরি গোরলক্ষ্মপুর (৩) খায়রুল হুদুদ ফী সফরিস সালিসি ইলা গোরক্ষপুর (৪) সফল নামা-ই-পানিপথ (৫) সফরনামা-ই- দেওবন্দ ও মুরাদাবাদ (৬) সফরনামা-ই- কোয়েটা (৭) সফরনামা-ই-গঙ্গোহ (৮) সফরনামা-ই-লাহোর, লক্ষ্মৌ।[১৮]

মৃত্যুঃ

ইনতিকালের ৫ বৎসর পূর্ব হতে তাঁর পাকস্থলী যথার্থ কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলিয়াছিল। যে কারণে শারীরিক দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু তিনি গ্রন্থরচনা ও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান এবং ওয়ায নসীহতের কাজও সাধ্যানুযায়ী করেছেন। দুর্বলতার কারণে অনেক সময় তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। যখন তিনি সচেতন হতেন, তখন সাথী-সঙ্গীদের আধ্যাত্মিক বক্তব্য এবং দার্শনিক আলোচনা দ্বারা দূরের ও কাছের সকলকে অনুগৃহীত করতেন। ওসীয়ত, উপদেশ, আমানতের হিসাব এমনকি নিজ গ্রন্থাবলীর যে সকল বক্তব্য কারও নিকট বোধগম্য নয় বলে সন্দেহ করতেন, তিনি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করতেন। নিজ চিন্তাধারা ও মতবাদ উল্লেখ করতেন। যখন শারীরিক দুর্বলতার কারণে কর্মশক্তি হ্রাস পেত, তখনও তাঁর পূর্বের কার্যাবলী যথা নিয়মে এবং যথাসময়ে পালন করতেন।

১৩৬২ হিজরী সনের ১৬ই রজব মুতাবিক ১৯শে জুলাই, ১৯৪৩ সালে সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেন।

==========

তথ্য ও টিকা নির্দেশ

১. গোলাম মুহাম্মদ; হায়াত আশরাফ, করাচী, মাকতাবায়ি থানবী, ১৯৬৩, পৃ. ২৩

* নাযমূল হাসান, হাকিমূল উম্মত আশরাফ আলী থানবী, মুজাফফর নগর, ইদারায়ে তালিকাতে আশরাফীয়া, পৃ.৭

* আব্দুস সামাদ করিম, হাকিমূল উম্মত কি মুখতাসার সাওয়ানি, হায়াত, এম. সানাউল্লাহ এ্যান্ড সন্স-১৯৬১, পৃ. ৯

২. আব্দুর রহমান খান মুন্সী, সীরাতে আশরাফ, ১ম খন্ড, শায়খ একাডেমী, লাহোর, পৃ. ৫১

৩. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁহার অবদান,পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৯৯, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

৪. বরং ঐ দর্শন শাস্ত্রের ক্ষতিকারক বস্তুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ এর পরিবর্তে আউযুবিল্লাহ পড়ে আরম্ভ করতেন। কেননা শয়তানী চিন্তাধারা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অনেক সময় মানুষের উপর ভর করে থাকে। আব্দুর রহমান খান মুন্সির সীরাতে আশরাফ, পৃষ্ঠা-৬৬

৫. আব্দুর রহমান খান মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮

৬. খলিল আহমদ, আসারে রহমত, করাচী-১৯৬৫, ভূমিকা।

৭. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৮. ঐ, পৃ. ৭৪

৯. খাজা আজিজুল হাসান, সীরাতে আশরাফ, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪৩১

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

১১. ঐ, পৃ. ৪৩২

১২. ঐ, পৃ. ৪৩৩

১৩. ঐ, পৃ. ৪৩৪

১৪. ঐ, পৃ. ৪৩৪

১৫. ঐ, পৃ. ৪৩৫

১৬. ঐ, পৃ. ৪৩৫

১৭. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস

(১৮৮৫ - ১৯৪৪)

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছিলেন প্রখ্যাত মুবাল্লিগ, দক্ষ সংগঠক, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ,সমাজ সংস্কারক এবং একজন যোগ্য আলিম। তাবলীগ জামাআতের মূল প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি সমধিক খ্যাত।

১৩০৩/১৮৮৫ সনে দিল্লী সন্নিহিত কান্ধালা নামক স্থানে মাতুলরালয়ে মাওলানা ইলিয়াস-এর জন্ম হয় পিতা মাওলানা ইসমাঈল পুরাতন দিল্লীর নিজমুদ-দীন নামক বস্তীতে বসবাস করতেন। পারিবারিক ঐতিহ্যানুসারে শৈশবেই তিনি কুরআন শরীফ হিফজ করেন। অতঃপর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে মাতাও মাতামহীর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক কিতাবাদি অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁর পিতা 'ইবাদাত-বন্দেগীতে অত্যাধিক লিপ্ত থাকায় বালক ইলিয়াসের লেখাপড়ার প্রতি নজর দিতে পারতেন না। ফলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা ইয়াহিয়া তাঁকে নিজের নিকট গাঙ্গুহ-এ নিয়ে আসেন।[১]

গাঙ্গুহ-এ প্রখ্যাত 'আলিম, মুহাদ্দিস' ও ফকীহ মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.)-এর সান্নিধ্যে ইলিয়াসের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। এই 'আলিমের সান্নিধ্যে থেকে ইলিয়াস একদিকে যেমন 'ইলম-ই-শারী'আতে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন তেমনি অন্যদিকে 'ইলম-

Dhaka University Institutional Repository

ই-মারিফাতের ফায়াদ- লাভ করেন। ১৩২৩ হিজরীতে বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর শাখয় ও মুরশিদ মাওলানা গাঙ্গুহী (র.) ইনতিকাল করেন। এতে তিনি গভীর আঘাত পান। পরবর্তী জীবনে তিনি বলিয়াছিলেন, "জীবনে দুইটি আঘাত আমাকে মূল করে দিয়েছেঃ প্রথম আমার আব্বার ইনতিকাল এবং দ্বিতীয় আমার শায়খ হযরত গাঙ্গুহী (র.)-এর চিরবিদায়।"[২]

মাওলানা ইলিয়াস 'ইলম-ই-হাদীছে সনদ লাভ করার উদ্দেশ্যে দারুল-উলুম দেওবন্দ গমণ করেন এবং উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান-এর নিকট এক বৎসরকাল বুখারী ও তিরমিযী শরীফের দারস এবং সনদ লাভ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইব্রাহীম বালয়াবী ছিলেন তাঁর সহপাঠী। এই সময় তিনি তাঁর উস্তাদের নিকট জিহাদেরও বায়আত গ্রহণ করেন।[৩]

দেওবন্দ হতে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় তিনি তাঁর অগ্রজ মাওলানা য়াহ-হ্যার নিকট হাদীসের দারস গ্রহণ করতে থাকেন। অতঃপর 'ইলম-ই-দীনে সনদ লাভ করে শায়খুল-হিন্দ এর নিকট দ্বিতীয় দফা বায়'আত গ্রহণের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁকে মাওলানা গাঙ্গুহীর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট গমনের পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ মুতাবিক তিনি সহারানপুরীর খিদমতে হাযির হয়ে 'ইলম-ই-তারীকাতে কামালিয়াত প্রাপ্ত হন। এই পর্যায়ে গাঙ্গুহী (র.)-এর খলীফাঃ, সম-সাময়িক 'আলিম-উলামা'-ই-কিরামের সঙ্গে মাওলানা ইলিয়াসের ভক্তি ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। এদের মধ্যে শাহ 'আবদু'র রাহীম রায়পুরী।, শায়খুল'ল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী উল্লেখযোগ্য।

১৩২৮ হিজরী শাওয়াল মাসে মাদ্রাসা মাজাহিরুল উলুম- এ তাঁকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ইহাই ছিল মাওলানা ইলিয়াসের নিয়মিত কর্মজীবনের আরম্ভ। শিক্ষাদান কার্যে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন।

অতঃপর পরিবারের ভক্ত ও অনুরক্তদের পীড়াপীড়িতে বস্তি নিজমুদ্দীনে অবস্থিত মসজিদ ও মাদ্রাসার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণে তিনি রাজী হন। অতঃপর জুমআ আল-উলার ২০ তারিখ সাহারানপুর হতে কান্ধালা এবং তথা হতে বস্তি নিজামুদ-দীনে চলিয়া আসেন এবং মসজিদ ও মাদ্রাসার সার্বিক তত্ত্বাবধান ছাড়াও 'ইবাদাত-বন্দেগী ও রিয়াদাত মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করেন।[৪]

এই সময় দিল্লীর দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ মেওয়াতী এলাকার অধিবাসীবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহাদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম সমাজপতি ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সুদীর্ঘ উপেক্ষার ফলে তারা ধীরে ধীরে ইসলামের আলো হতে দূর সরে যায় এবং অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও ধর্মহীনতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় (দ্রঃ

Dhaka University Institutional Repository

Major Powlet), আলওয়ার গেজেটিয়ার ১৮৭৮ ; গোরগাঁও গেটিটিয়ার এবং ভরতপুর গেজেটিয়ার, ১৯১০; শেষোক্ত গেজিটিয়ারদ্বয়ে উল্লেখিত হয়েছে যে, আচার-অনুষ্ঠান দৃষ্টি হারা ছিল আধা মুসলিম, আধা হিন্দু)। পিতা মাওলানা ইসমাঈল-এর সঙ্গে পীর-মুরীদলি সম্পর্ক সূত্রে তিনি মেওয়াতী অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাহাদের দ্বীনী অবস্থাদৃষ্টে ব্যথিত হন। সর্বপ্রথম তিনি সেখানে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাক্রমে আরও দশটি মক্তব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এই সকল মক্তবে মেওয়াতী অঞ্চলের শিশু-কিশোরদিগকে কুরআন শরীফ ও প্রাথমিক মাসলা মাসাইল শিক্ষা দেওয়া হত। এইভাবে মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তাবলিগ-ই দনের ভিত্তি রচনা করেন। অতঃপর তিনি বয়স্কদের শিক্ষার উপায়ে চিন্তা শুরু করেন এবং এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, যে পর্যন্ত না সর্বসাধারনের মধ্যে দীনে উপলব্ধি পরিপূর্ণরূপে আসবে, সে পর্যন্ত মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন সম্ভব নহে।[৫]

হিজরী ১৩৪৪ সনের শাওয়াল মাসে মাওলানা ইলিয়াস তাঁর উস্তাদ মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপুরীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার হজ্জে গমন করেন। হজ্জ পালন শেষে তিনি মদীনা মুনওয়ারার হযরত (স.)-এর রাওযাপাক যিয়ারাতে যান। এইখানে তিনি তাবলীগ-ইগীনের পরিপূর্ণ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। অতঃপর হিজরী ১৩৯৫ সনের ১৩ই রাবীউসসানী দেশে ফিরে তিনি তাবলীগ প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং অন্যদিকে বিশেষতঃ 'আলিম সমাজকে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে তাঁদের তাবলীগী ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করেন।

হিজরী ১৩৫১ সনে মাওলানা ইলিয়াস তৃতীয়বারের মত হাজ্জ করেন।

মাওলানা ইলিয়াস তাবলীগ-ই-দীনের উদ্দেশে থাকতে পারলেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, সংসারী মানুষ ঘর সংসার ছেড়ে মক্ত-মাদ্রাসায় ভর্তি হবেনা, অথচ গভীর মনোযোগ ও পরিপূর্ণ একাগ্রতা ব্যতিরেকে কোন অজ্ঞ লোকের পক্ষে সংক্ষিপ্ত সময়ে ইবাদাত-বন্দেগীর প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি রপ্ত করাও সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে দুই-একটি ওয়াজ-নসীহত অজ্ঞ জনগণের সামগ্রিক জীবন-ধারাকে বদলিয়ে দিবে, দীর্ঘ দিনের লালিত জাহিলী ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন সাধন করবে এবং তাহারা সুষ্ঠু 'আমল ও শুদ্ধ' আকীদায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে এইরূপ মনে করা অবাস্তব। এই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তিনি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, মানুষকে ছোট ছোট জামাআতে সংগঠিত করে ঘর-সংসারের পরিবেশ হতে তাদেরকে কিছু দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং মসজিদ কিংবা ধর্মীয় পরিবেশে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাধানে রেখে তাদেরকে দীনের তালীম প্রদান করতে হবে। অতঃপর মাধ্যমে জনসাধারনের মধ্যে দীনের দাওয়াত দিতে হবে যাতে তারা যা শিখবে, দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তা জনসাধারণের সমক্ষে বলতে হলে নিজেদের অন্তরে তা গেঁথে যায়। অধিকন্তু তারা দীনী ও ইলমী কেন্দ্রগুলোতে 'আলিম ও মুত্তাকীদের মজলিসে নিয়মিত উঠাবসা করলে তাঁদের কথাবার্তা শ্রবণ করলে এবং তাঁদের কাজকর্ম ও চলাফেরা প্রত্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

করলে প্রাত্যহিক দ্বীনী যিন্দেগীর একটি নকশা তাদের মনের উপর প্রতিফলিত হবে।[৬] এতদুদ্দেশ্যে অবসর সময়ে কুরআন কারীমের কিছু অংশ শুদ্ধ করে পড়া, শরীআতের মাসাইল ও আহকামের ফাদা'ইল ও রাসূল (স.) এবং সাহাবা-এ কেরামের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দান করার ব্যবস্থা করে তাদের প্রত্যেকটি জামাআতকে এক একটি চলন্ত মাদ্রাসার রূপ দিতে পারলে সম্ভবতঃ রাসূল কারীম (স.)-এর সাহাবীদের আদর্শে ইসলামের আদি যুগের নমুনার একটি নব্য মুবাল্লিগ সংঘ সৃষ্টি করা যাবে। এই উপলব্ধি হতেই তিনি তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠা করেন। ছয়টি উসূল বা মূলনীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে ছয় মূলনীতি নিম্নরূপঃ

কালিমা ঃ সালাত, 'ইলম ও যিকর, ইকরামু'ল-মুসলিমীন তথা মুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাসহীব-ই-নিয়্যাত বা নিয়্যাত শুদ্ধ করা এবং নাফর ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া।

মাওলানা ইলিয়াস (র.) এর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সীমাহীনত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে এই তাবলীগ জামাআত। কয়েকজন সহচরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আজ উহাই লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরলোকে স্থায়ী আবাস স্থাপন করেছে।[৭]

১৩৬৩/১৯৪৪ -এর ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রির শেষ ভাগে এই মহান মুবাল্লিগ ও দাঈ দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র মাওলানা ইউসুফ ও এক কন্যা রাখিয়া যান।

==========

টিকা ও তথ্য নির্দেশ

১. Goargoan Gezeteer, 1878, P. 117
২. তাবলিগী নিসাব, লেখক পরিচিতি।
৩. মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরিক-এ-দেওবন্দ, ঢাকা-১৯৯২, পৃ. ১৪২
৪. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, ১৬৩
৫. ঐ, পৃ. ১৬৪
৬. ঐ, পৃ. ১৬৫
৭. ঐ, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদ রূহুল আমিন

(১৮৮২ – ১৯৪৫)

মাওলানা রূহুল আমিন ১২৮৯ বঙ্গাব্দে ২৪ পরগণা জিলার বলিরহাট মহকুমার টাকী নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতার নাম মুন্সী গাজী দাবীরুদ-দীন ও মাতার নাম রাহীমা খাতুন। তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই ধার্মিক ছিলেন। পুত্রকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করার জন্য পিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল; কিন্তু মক্তব-মাদ্রাসার অভাবে রূহুল আমিন শৈশবে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইলেন না। এগার বৎসর বয়সে তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। তাঁর মেধা ছিল প্রখর। মাত্র তিনি বৎসরেই তিনি কুরআন মাজীদ, একটি ফারসী কিতাব এবং কয়েকটি বাংলা পুস্তক পাঠ সমাপ্ত করেন। অতঃপর সূফী 'আবদুশ-শাফীর তত্ত্বাবধানে বশিরহাট হাইস্কুরের হেড মৌলভী ওয়াজিদ 'আলীর নিকট তিনি ফারসী ও 'আরবী পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। ওয়াজিদ 'আলীর আকস্মিক ইনতিকালের ফলে এবং বশিরহাটে তাঁর লেখাপড়ার কোন সুবিধা না থাকায় উক্ত সূফীর উদ্যোগে তিনি ১৪/১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। আর্থিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পুত্রের খরচের জন্য তাঁর পিতা প্রতি মাসে দশ টাকা প্রেরণ করতেন।[১]

মাদ্রাসার প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করতেন। জামাআত উলা (ফাজিল) পরীক্ষা তিনি সমগ্র আসাম ও বাংলায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাদ্রাসায় অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে 'ইলম-ই-কিরাআতে বিশেষ পারদর্শী কারী বাশীরুল্লাহর শিষ্যত্বে তিনি তাজবীদ এর নিয়ম কানুনসহ কুরআন শরীফ আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। তৎপর ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো পারসিয়ান বিভাগে তিনি ভর্তি হন। কিন্তু সাংসারিক অসুবিধার কারণে এক বৎসর পর তাঁকে ইহা পরিত্যাগ করতে হয়। এক সময় তাঁর নিজ গ্রাম টাকা নারায়ণপুরে নদীর ভাঙ্গনের আশংকা দেখা দিলে তিনি বশিরহাটে নতুন বাড়ী নির্মাণ করেন ও তথায় স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে একটি গ্রন্থগার স্থাপন করেন এবং মূল্যবান দুস্প্রাপ্য কিতাবসমূহ সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থাগারে প্রায় ২৫০০০ গ্রন্থ ছিল।[২] তাঁর জ্ঞান-পিকে প্রায়ই সফরে থাকতে হত। সফরেও কিছু কিতাবপত্র তাঁর সঙ্গে থাকত। রেলগাড়ীতে, স্টীমারে বা স্টেশনে একটু ফাঁক পেলেই তিনি হয় কোন কিতাব পড়তেন অথবা কিছু লিখতেন। তিনি অসংখ্য হাদীছের হাফিজও ছিলেন।

কিতাবী জ্ঞান-অর্জন শেষ করে তিনি মারিফাতী জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রথমে মাওলানা গুলাম সালমানী (র.) মৃ. ১৩৩০-১৯১২ এর এবং তাঁর মৃত্যুর পরে মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (র.) মৃ. ১৩৫৮-১৯৩৯ খ্রী. এর মুরীদ হন। তিনি শেষোক্ত পরীরের খিলাফত লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশে ওয়াজ করা ও কিতাব রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

শাহ আবু বকর সিদ্দীকী (র.) এর প্রতিষ্ঠিত "আঞ্জুমান-ই-ওয়াইজীন-ইন-বাঙ্গালাহ"-র তিনি সেক্রেটারী ও প্রধান প্রচারক ছিলেন। একাদিক্রমে ৩০/৩২ বৎসর তিনি বাংলা ও আসামের শহর গ্রামে ওয়াজ করেন এবং এতে তিনি কুরআন ও হাদীছের বাহিরে কিছু বলতেন না। তিনি ওয়াজে অনর্গল হাদীছ আবৃত্তি করতে পারতেন। তিনি মাযহাব বিরোধী, বিদআতী ও ভন্ড ফকীর-দরবেশদিগের সঙ্গে বহু স্থানে তর্কবির্তক (বাহাছ) করেন ও তাদেরকে দলীল-যুক্তি দ্বারা পরাজিত করেন। এইরূপ বাহাছের কিছু কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়েছে, যথা গৌরীপুরের বাহাছ; সিরাজগঞ্জের বাহাছ, নবাবপুরের বাহাছ ইত্যাদি।

তাঁর সমসাময়িক বাঙ্গালী 'আলিমগণ সাধারণতঃ বাংলা ভাষার চর্চা করতেন না এবং বাংলাতে পুস্তক রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন না। আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) রুহুল আমিনকে বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তক রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে যখন তিনি তাঁর পীরের সঙ্গে হাজ্জ করবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতেছিলেন, তখন তাঁর পীর তাঁকে বঙ্গ ভাষায় পরিষ্কারভাবে হাজ্জ ও যিয়ারাতের বিবরণ লিখে ছাপিয়ে বাঙ্গালী হাজীগণের হাজ্ব সহজসাধ্য করবার নির্দেশ দেন। তিনি এই নির্দেশ পালন করেন। মাযহাব অনুসরণ (তাকলদি), কাদিয়অনী মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিপক্ষের মতামত খন্ডন করার উদ্দেশ্যে তিনি যে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যায়ঃ (১) মাজহাব মীমাংসা (২) ছায়েকাতোল মোহলেমিন (৩) দাফেয়োল মোফছেদিন (৪) ফেরকাতোন নাজেয়ীন (৫) কাদিয়ানি রদ (ছয় খন্ডে সমাপ্ত)। প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে বাংলায় নির্ভরযোগ্য পুস্তকের অভাব দেখে তিনি লিখেনঃ জরুরী মাসায়েল (৩ ভাগে), হানাফী ফেকাহতত্ত্ব বা মাছলা ভান্ডার (৩ ভাগে), অতি জরুরী মাছলা-মাছায়েল ইত্যাদি। তিনি বহুবিধ ফাতওয়াও প্রদান করেছেন। সে সব ফাতহুয়া "ফাতওয়ায়ে আমিনীয়া" গ্রন্থে (৭ ভাগে) সংরক্ষিত আছে। তিনি মাওলানা আকরম খাঁ (মৃ. ১৯৬৮ খ্রী.) এর মোস্তফা চরিত ও 'তাফসীর' গ্রন্থে উল্লেখিত 'আকাইদ সংক্রান্ত কিছু মত ও মন্তব্যের জবাবে 'খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিত্রের প্রতিবাদ', 'খাঁ সাহেবের তাফসীরের প্রতিবাদ' 'অমপারার তাফছীর' ইত্যাদি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন মুসলিম সমাজ প্রচলিত অনৈসলামিক ক্রিয়া কর্মের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় কিছু সমস্যা সম্পর্কেও তিনি লেখনী চালনা করেছেন। তাঁর এই জাতীয় লেখা যথাঃ (১) তরদীদোল মোবতেলান (২) বাগমালী ফকিরের ধোকাভঞ্জন (৩) এবতালোল বাতেল (৪) গ্রামে জোমা (জুমাআ) (৫) ইসলাম ও সঙ্গীত (৬) ইসলাম ও বিজ্ঞান (৭) ইসলাম ও পর্দা (৮) দাল্লীন ও জালীনের মিমাংসা (৯) খতম ও জিয়ারতের ওজরতের মীমাংসা ইত্যাদি। পীর-মুরীদ ও তাসাউফ সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রয়েছে। তাঁর 'বঙ্গানুবাদ মেশকাত মাছাবিহ' ও কুরআন মাজীদের প্রথম তিন পারার তাফসীর তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি জীবনী গ্রন্থও রচনা করেছেন, যথা ঃ (১) ফুরফুরার পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী, (২) হযরত বড় পীরের জীবনী এবং (৩) বঙ্গ ও আসামের পীর আওলিয়ার কাহিনী। তিনি প্রায় ১৩৫টি পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা এবং সবগুলিই বাংলা ভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে ১১৪টি পুস্তক এই যাবত প্রকাশিত হয়েছে।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সময়ে পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনা অধিকতর দুরূহ ব্যাপার ছিল। এতসত্ত্বেও মাওলানা রুহুল আমিনের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় ১৯২৬ খ্রী. সাপ্তাহিক 'হানাফী', প্রকাশিত এবং ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক 'মোসলেম' ও মাসিক 'সুন্নত আল-জামায়তা' প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি পত্রিকাই মুসলিম সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ইসলাম দর্শন, শরিয়াত, শরিয়াতে এসলাম, ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বাংলার বহু স্থানে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করে মসজিদ-মাদ্রাসার-সহযোগিতা করেছেন। তিনি নিজ গ্রামে ইয়াতীমখানা ও ওল্ডকীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি রাজনীতেও অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি প্রাদেশিক জামাইয়্যাত-ই-উলামার সভাপতি ও নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি এক সময় শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কারণ প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নীতির ব্যাপারে তিনি একমত হতে পারেন নাই।[৫]

তিনি অমায়িক, মিতভাষী, বিনম্র কিন্তু বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, অথচ খুব সাদাসিদা জীবন যাপন করতেন। সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন নির্ভীক। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর পীর তাঁকে 'ইমাম' ও 'আল্লামা-ই-বাঙ্গাল' উপাধি প্রদান করেছিলেন ৬৬ কর্মবীর মাওলানা রুহুল আমিন। মাওলানা রুহুল আমিনের বহু মুরীদ রহিয়াছে। খুলনার মুহাম্মদ মুইযযুদ দীন হামীদা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

জীবনে বিশ্রামের অবকাশ তিনি পান নাই। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লে তিনি অগত্যা কলিকাতায় গিয়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীন হন। বাহ্যত ঃ তাঁর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এমন সময় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ১৬ কার্তিক (১৯৪৫ খ্রী. ২রা নভেম্বর) শুক্রবার যথারীতি তাহাজ্জু ও ফজরের সালাত আদায় করে যখন তিনি বস্তুবৃত অবস্থায় ওজীফা পাঠ করতেছিলেন, তখনই তিনি ইন্তিকাল করেন। কলিকাতায় একবার এবং বশিরহাটে আর একবার তাঁর সালাত-ই-জানাযা পড়া হয়। শনিবার অপরাহ্নে তাঁর বাড়ীর সম্মুখস্থ আম্রকাননে তাঁকে দাফন করা হয়।[৬]

টিকা ও তথ্য নির্দেশ

446902

১. Calcutta Revew, 1861, P. 162
২. মোহাম্মদ মোয়েজ্জদীন হামিদ, কর্মবীর মাওলানা রুহুল আমীন, ২৪ পরগণা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯২
৩. কর্মবীর মাওলানা রুহুল আমিন, পৃ. ৯৩
৪. কর্মবীর মাওলানা রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-২০ আল-আমিন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রায়ারী-১৯৭৭, পৃ. ১৮
৫. আল-আমীন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা-১৯৭৭ খ্রী. পৃ. ১০।
৬. আল-আমীন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা-১৯৭৭ খ্রী. পৃ. ১১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী

(১৮৮৭ –১৯৪৯)

আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উছমানী ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও প্রবন্ধকার। তাঁর মূল নাম শাব্বীর আহমাদ ও উপাধি শায়খুল ইসলাম। হযরত উছমান (রা.)-এর বংশধর ছিলেন বলে তিনি নিজের নামের সঙ্গে উছমাণী শব্দটি জুড়ে দেন। তিনি ১০ই মুহাররম, ১৩০৫/১৮৮৭ খ্রী. ভারতের তদানীন্তন যুক্ত প্রদেশের বিজনৌর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দেওবন্দের দারুল উলুম মাদরাসায় তিনি ফিকহ, হাদীস, দর্শন, মানতিক ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।[১] তিনি ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানের অন্যতম বিশেষ শাগরিবদ। দেওবান্দ মাদরাসায় শিখা সমাপ্ত করে তিনি দিল্লীর ফাতহপুরী মাসজিদে কিছু দিন অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তিনি দেওবান্দ দারুল-উলুম মাদ্রাসায় শিক্ষা নিযুক্ত হন। ভারত বিভাগের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ১৯৪৬ খ্রী. যখন উপমহাদেশে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন তিনি মুসলিমলীগের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে পাকিস্তান দাবীর পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্থায়ীভাবে করাচিতে বসবাস শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে ১৩ই ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

মাওলানা 'উছমান ছিলেন জামাইয়্যাত-ই-'উলামা'-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৫)। ইহা ছিল পাকিস্তান সমর্থক 'আলিমদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন। মুসলিম লীগের শক্তি বর্ধন ও পাকিস্তান অর্জনের মূলে এই সংগঠনের ভূমিকা অসামান্য।

মাওলানা 'উছমানী তিন খন্ডে (কিতাবুর রিদা (আ.) পর্যন্ত)। সাহীহ মুসলিম এর শরহ রচনা করেছেন। শায়খুল হিন্দু মাহমুদ হাসান-এর কুরআনের তরজমায় তিনি টীকা সংযোজনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী ২৫-২৭ তারিখে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক জামইয়াত-ই-উলনামা-ই ইসলামের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি যে বক্তব্য রাখিয়াছিলেন, 'হামারা পাকিস্তান' (পৃ. ৮০) নামে হায়দারাবাদের নাফীস একাডেমী হইতে প্রাকশিত হইয়াছে। এতে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা, এর গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান, আদর্শ, গঠনতন্ত্র, প্রশাসনিক কাঠামো, খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি একজন প্রবন্ধকারও ছিলেন। তাঁর রচনাগুলি মূলতঃ ইসলাম ধর্ম, ইসলামী দর্শন ও সমাজ বিষয়ক। তাঁর 'ইসলাম' ও 'মুজিযাত' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি (পৃ. ১৩২) লাহেরের ইদারা-ই-আশরায়িা হতে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।[৩] তাঁর আরও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন ইদার-ই-ফুরুগ-ই-উদূ হতে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনের অন্যান্য প্রবন্ধ হতে ই'জাযুল কুরআন, আল-লূহ' ফি'ল কুরআন, আল-আকল ওয়ান নাকল এবং হিজাব-ই-শারঈ। এই গ্রন্থের আল-আকল ওয়ান নাকল শীর্ষক প্রবন্ধটি গবেষণামূলক ও কৃতিত্বের দাবিদার।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এই মর্মটি প্রমাণ করার প্রয়াস পান যে, সত্য ধর্ম সুস্থ বুদ্ধির পরিপন্থী হতে পারে না। তবে বুদ্ধি সকল ক্ষেত্রে ধর্মের যাবতীয় গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম নহে। সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশনাবলীতে বিধৃত মূল সত্যের নিরিখে বুদ্ধি-বিবেক উদঘাটিত জ্ঞানকে যাচাই করতে হবে। হিজাবি-ই-শারঈ নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন, স্ত্রী স্বাধীনতার নামে যে পর্দাহীনতা এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ রয়েছে, তাও সমাজের পক্ষে হানিকর। মাওলানা উছমানী দেশবাসীর কাছে বিশেষতঃ 'উলামা' মহলে বিশেষ সম্মানের অধিকারী।

তথ্য ও টিকা নির্দেশ

১. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ৭১
২. আহলে হাদিস, জৈষ্ঠ্য-১৩৩০, ৮ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৃ. ৪০০
৩. শাব্বির আহমদ ওসমানী, ইসলাম ও মুজিযাত, ইদারা-এ-আশরাফিয়া, তাবি, পৃ. ১৩২
৪. ঐ, পৃ. ১৩২

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)
(১৮৭৯ – ১৯৫৭)

মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী (র.) ছিলেন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্নিপুরুষ। তার তেজোদীপ্ত ভূমিকা ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত প্রথম ব্যাপক স্বাধীনতা সংগ্রামের যশশ্বী নেতা মাওলানা আহমদুল্লাহ, আন্দামান বন্দীত্রয় মাওলানা ফজলুল হক খয়রাবাদী (র.), মাওলানা জাফর থানেশ্বরী (মৃতু. ১৯০৫) ও ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজার সাথে তুল্য। বরং কার্যকালের দিক থেকে মওলানা মদনীর সংগ্রামের পরিধি বিস্তৃততর এবং তিনিই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ভাগ্যবান 'আলিম যিনি সুদীর্ঘ সংগ্রাম, কারাভোগ ও দ্বীপান্তর ভোগ করার পর স্বাধীনতার মুক্ত পরিবেশ এবং এর সার্থকতা ও ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করেছেন।[১]

১২৯৬ হিজরী ১৯শে শাওয়াল মুতাবিক ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর সোমবার দিবাগত রাত এগারটায় এই বিপ্লবী পুরুষ উত্তর প্রদেশের বাদিরমৌ মৌজায় সাইয়িদ হাবিবুল্লাহর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্থানীয় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। জন্মের সাল নাম রাখা হয় চেরাগ মুহাম্মদ। কালে এই বালক সূর্যের মতো দীপ্ত হয়ে তাঁর চেরাগ মুহাম্মদ নামের সার্থকতা প্রমাণ করেছিলেন।

আসলে মাওলানা মদনীর পিতৃপুরুষরা ছিলেন ফয়যাবাদ জেলার কসবা টান্ডার আল্লাহদাদপুর গ্রামের অধিবাসী। চারশ বছরেরও অধিক কাল ধরে তাঁর পূর্বপুরুষরা সেখানে বসবাস করতে আসছিলেন।[২]

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মদনীর পিতা সাইয়িদ হাবীবুল্লাহ ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত ওলী হযরত ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র.) এর মৃত্যু (১৩১৩ হিজরী) আধ্যাত্মিক ছাত্র ও খলীফা। কথিত আছে যে, উক্ত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র.) ছিলেন সেই বুযুর্গ যাঁর দুআর বদৌলতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পুত্র সন্তান লাভ করে শোকরানা স্বরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর জন্মের তিন বছর পর পিতা সাইয়িদ হাবীবুল্লাহ শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করে মাতৃভূমি টান্ডায় ফিরে আসেন। মদনী সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষার বিসমিল্লাহ হয় তাঁর বিজ্ঞ পিতার হাতে। তের বছর বয়ঃক্রমকালে তিনি প্রেরিত হলেন বিশ্ববিখ্যাত ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দে। তাঁর পিতার জনৈক পীর ভাই গুরুদাসপুরের বাটালা নিবাসী জনাব মুন্সী ফিরুজুদ্দীন সাহেব তাঁকে দেওবন্দে তাঁর দুই অগ্রজের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। এটা ছিল ১৩০৯ হিজরীর সফর মাসের শুরুর দিকের কথা। শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসানের বাসস্থানের একেবারে নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে তাঁরা অবস্থান করতেন।[৩]

সাধারণত ঃ এ বয়সে কোন শিক্ষার্থী দূরবর্তী স্থান থেকে দেওবন্দে পড়তে আসতো না। কিন্তু হুসাইন আহমদের দু'জন অগ্রজ পূর্ব থেকেই সেখানে থাকায় তাঁর এ দুর্লভ সুযোগটি জুটেছিল। লেখাপড়ায় ভাল একজন মেধাবী ছাত্র হওয়ায় ও বয়সের স্বল্পতার জন্য সেখানে সকল শিক্ষকই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

১৩১৬ হিজরীতে (১৮৯৯খ্রী.) সত্যি সত্যি সাইয়িদ হাবীবুল্লাহ তাঁর ভারতের সমস্ত সহায়-সম্পদ বিক্রী করে সপরিবারে মদীনার পথে পাড়ি জমালেন। বলা বাহুল্য, মাওলানা মদনীও তখন তাঁর সাথে ছিলেন। মাওলানা মদনী বলেন, এ ছিলো আমার পিতার জীবনে দেখা স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন। আমরা ছিলাম হযরত ফাতিমারই সন্ত ান। মদীনায় হিজরতের মাধ্যমে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমরা সত্যি সত্যিই মায়ের কোলেই গিয়ে উঠলাম।

বিশ্বের সেরা ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ 'আলিম মওলানা মদনী এবার বিশ্বশিক্ষক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারকে উপস্থিত হয়ে তার কল্যাণপ্রদ ফয়েয লাভেও ধন্য হলেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে দেওবন্দ দারুল উলুমের সাড়ে ছ'বছরের যাহিরী ইলম অর্জনের পর শিক্ষক মদনী (র.) একজন কৃতি ও মেধাবী শিক্ষার্থীরূপে দারুল উলুম দেওবন্দে দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছরকাল যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিমদের নিকট বিদ্যাভ্যাস করে মওলানা মদনী যখন দেওবন্দ থেকে বিদায় গ্রহণ করছিলেন, তখন ছাত্রবৎসল হযরত শায়খুল হিন্দ পায়ে হেঁটে রেলস্টেশন পর্যন্ত গিয়ে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে আসেন। পথ চলতে চলতে তিনি তাঁর কৃতী শাগরিদকে ওসিয়ত করেন-পড়ানোর কাজ কখনো চাড়বে না, একটি ছাত্রকে হলেও অবশ্যই পড়াতে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনা শরীফে উপস্থিতির পর কয়েকজন 'আরব ও ভারতীয় ছাত্রের শিক্ষকরূপে তিনি উস্তাদের সে উপদেশ বাস্তবায়িত করতে শুরু করেন। 'আরবী প্রচুর কিতাবপত্র পড়া থাকলেও আরবি বলার অভ্যাস না থাকায় প্রথম প্রথম তাঁর কিছু কিছু অসুবিধা হতো। কিন্তু মসজিদে নববীতে ছাত্রদেরকে পড়াতে পড়াতে শীগগীরই সে অসুবিধা কেটে গেল। ভারতীয় 'আলিমরা আরবী ভাষায় কাঁচা থাকায় সহজেই তাঁরা 'আরব আলিমদের সমালোচনার পাত্রে পরিণত হতেন। কিন্তু মওলানা মদনী ছিলেন তার বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। হেজাযী 'আলিমরা তাঁকে ঈষৎ করতে লাগলেন। প্রথম দেড় দু'বছর তাঁর অধ্যাপনা 'আরবী ব্যাকরণ ও ফিকহ প্রভৃতি প্রাথমিক বিষয়াদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৩১৯ সাল গাঙ্গুহ তথা হিন্দুস্তানের সফরে কাটিয়ে ১৩২০ হিজরীর মুহাররম মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর শিক্ষক জীবনের নব পর্যায়ের সূচনা হলো। এবার থেকে তিনি মসজিদে নববীতে বসে উচ্চ পর্যায়ের হাদীসের কিতাবাদি এবং মদীনা, মিসর, তুরস্কের ইস্তাম্বুলের অন্যান্য কঠিন কিতাবাদি পড়াতে শুরু করলেন। এ সময় তাঁর শাগরিদ ছিলেন মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, চীন, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শিক্ষার্থীরা।[৪]

হিজরী ১৩২৬/১৯০৬ খ্রী. সনে মাওলানা মদনীর প্রথমা স্ত্রীর ইন্তেকালের পর পিতার নির্দেশক্রমেবিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতে ফিরে আসেন। এসময় তিনি তাঁর উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দের নির্দেশক্রমে প্রায় তিন বছরকাল পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীসের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন। উস্তাতদের সাহচার্য্যে অধ্যাপনার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতা আরো সমৃদ্ধ হয়। হযরত শায়খুল হিন্দ এবার তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভষ্যিতের শায়খুল ইসলামকে আদর্শ শিক্ষক রূপে গড়ে তুলেন। ১৩২৫/১৯১৬ সফর/ডিসেম্বর মাসে উস্তাদ শায়খুল হিন্দসহ বৃটিশ সরকারের ইঙ্গিতে মক্কা শরীফে শরীফ হোসেনের বাহিনী কর্তৃক বন্দী হয়ে মাসাধিককাল মিসরের জিন্দান খানায় কাটিয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছরকাল মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করে ৮ই জুন ১৯২০ খ্রী/২০শে রমযান ১৩৩৮ হিজরী তারিখে বোম্বাই নীত হয়ে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল মওলানা মদনী তাঁর উস্তাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকেন। ইসলামী বাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেলরূপে তিনি ঐ মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার সম্মানে মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত জিহাদের প্রেরণামূলক তাঁর বক্তৃতাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

মাল্টা থেকে ফিরে মওলানা মদনী লক্ষ্য করেন যে, দেশে খিলাফত আন্দোলন ও অসযোগ আন্দোলনের প্রবল জোয়ার বইছে। দেশব্যাপী সরকারী কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা দলে দলে বেরিয়ে আসছে। মওলানা আবুল কালাম আযাদ কলকাতায় দারুল উলুম নামক বে-সরকারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন আলীয়া মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা দেশ প্রেমিক ছাত্রদের জন্য। শায়খুল হিন্দ তাঁর স্থলে মওলানা

Dhaka University Institutional Repository

মদনীকে এ মাদ্রাসার প্রধানরূপে পাঠালেন। তাঁকে কলকাতার পথে বিদায়কালে তিনি মওলানা মদনীর হাত ধরে নিজ মাথায় রাখলেন, চোখেমুখে লাগালেন, বুকে স্পর্শ করালে এবং সারা গায়ে তার পরশ নিলেন। এটাই ছিল পিতৃসম উস্তাদের নিকট থেকে তাঁর অন্তিম বিদায়। যার সাহচর্য লাভের এবং ছাত্রত্বের মূল্য পরিশোধের জন্য মওলানা জীবনের চরম ত্যাগ স্বীকার করেন, সেই উস্তাদকে পেছনে ফেলে বিদায় নিয়ে আসতে মওলানা মদনীর প্রাণান্তকর কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু, তবুও উস্তাদের আদেশকে শিরোধার্য্য করে তিনি কলকাতায় চলে এসে মাদ্রাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৩৫৯ হিজরী / ৩০ নভেম্বর ১৯২০ খ্রী. তারিখে হযরত শায়খুল হিন্দ ইন্তেকাল করলে ডাঃ আনসারী টেলিগ্রামে এ খবর তাঁকে অবগত করেন। কিন্তু যখন দেওবন্দে পৌছলেন, তখন লোকজন তাঁর প্রিয় উস্তাদকে দাফন করে ফিরে আসছিল। করাচী মোকদ্দমার পূর্ব পর্যন্ত কলকাতায় তিনি ৬/৭ মাসকাল হাদীসের অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন।[৫]

১৯২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯২৭ ইং পর্যন্ত মওলানা মদনী (র.) সিলেটের নওয়া সড়কে মানিক পীরের টিলা সংলগ্ন একটি টিবির মতো উঁচু স্থানে নির্মিত খিলাফত অফিসে কওমী মাদ্রাসা চালু করেন। মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে হাদীস অধ্যাপনা, কলকাতার দারুল উলুমে অধ্যাপনা, মাল্টার বন্দী জীবনে শায়খুল হিন্দের সাহচর্য লাভ এবং করাচীর ঐতিহাসিক মোকাদ্দমা খ্যাত মাওলানা মদনী দেওবন্দ দারুল উলুমের শায়খুল হাদীস পদে গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে আমাদের এই বাংলাদেশের একটি ধর্মীয় বিদ্যাকেন্দ্রে দীর্ঘ ছয় বছর অধ্যাপনা করেছেন। এটা যে আমাদের জন্য বড় গর্বের ব্যাপার, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সিলেটের নয়া সড়কস্থ সে ঐতিহাসিক খিলাফত অফিস ও কওমী মাদ্রাসাটির ভবনটি সংরক্ষিত রাখা হয়নি।

মওলানা মদনীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পরিচিতি হচ্ছে যে তিনি সুদীর্ঘ একুশ বছরকাল ১৩৪৬ হিজরী/১৯২৭ খ্রী. থেকে জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস ও প্রধান আকর্ষণরূপে বিরাজ করে হাজার হাজার জ্ঞান-পিপাসুকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দেওবন্দের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেন। তাঁর ইন্তে কাল পর্যন্ত দেওবন্দ দারুল উলুমের সুদীর্ঘ ৯৪ বছরের ইতিহাসের মোট ৬৬৩০ জন শিক্ষার্থী হাদীসের শেষ সনদ নিয়ে দারুল উলুম থেকে বেরিয়ে আসেন। তন্মধ্যে একা মওলানা মদনীর হাতে ৩৮৫৬জন এবং অবশিষ্ট সবার হাতে ২৭৭৪ জন সনদ লাভ করেছিলেন। উপমহাদেশের এমন কোন জেলা নেই যেখানে তাঁর ৫/১০ জন ছাত্র নেই। তারীখে দারুল উলুমের বরাতে হযরত মদনীর পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার জীবনী পুস্ত ক 'মাআছিরে শায়খুল ইসলাম' এ তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত 'আলিমের সংখ্যা ৪৪৮৩ জন্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান,

Dhaka University Institutional Repository

সৌদীআরব, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ বর্হিবিশ্বের প্রতিটি দেশেই তাঁর ছাত্ররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন।

এ যুগের বিদ্যাসাগর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) এর দেওবন্দ ত্যাগের পর স্বয়ং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর প্রস্তাবক্রমে হযরত মওলানা হাফিজ আহমদ (হযরত মওলানা তাইয়্যিব সাহেবের পিতা) ও অন্যান্য শূরা সদস্যগণ হযরত মদনীকে সদরে মুদার্রিসরূপে দারুল উলুম দেওবন্দের দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানান। স্বয়ং হযরত থানভী অত্যন্ত বিনয়মাখা ভাষায় হযরত মদনীর উঁচু ব্যক্তিত্ব, গভীর পান্ডিত্য, এখলাস ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা ও স্বীকৃতি এরং অপর্যাপ্ত বেতনভাতার উল্লেখ করে এ প্রস্তাবটি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মাওলানা মদনী দেশ জাতির স্বার্থে নিবেদিত তাঁর কোন তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করা হবেনা সহ ১৯টি শর্ত সাপেক্ষে সে আহবানে সাড়া দেন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সে গুরু দায়িত্ব পালন করে যান।[৬]

মওলানা রইস আহমদ জাফরী ১৯৩২ সালে তাঁর দেওবন্দ সফরে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য মওলানা মদনীর ক্লাশে বসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন-

মওলানা হুসাইন আহমদ সাহেবের ক্লাশে বসার সুযোগ আমার হয়েছিল। মওলানা হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন। তাঁর সাথে যার যত রাজনৈতিক বিরোধই থাক না কেন, তাঁর জ্ঞান গরীমা, উন্নত চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা এবং তাকওয়া ছিল প্রশ্নাতীত। আমি অত্যান্ত আগ্রহের সাথে কিছুক্ষণ তাঁর ক্লাসে বসলাম এবং তাঁর অধ্যাপনার নমুনা অবলোক করলাম।

মওলানা মদনীর ক্লাশে বসে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন রইস আহমদ জাফরী। তাই উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর যিয়াউদ্দিনের মতো তিনিও রাজনৈতিক ব্যতিব্যস্ততার জন্য তাঁর জ্ঞান-গরিমার সবটুকু ছাত্রদেরকে দেবার মতো অবস্থায় ছিলেন না বলে জাফরী অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেছেনঃ

'হায়, যদি মাওলানার তৎপরতা কেবল দেওবন্দেই সীমাবদ্ধ থাকতো।'

কিন্তু জাফরীর হয়তো জানা ছিল না যে, মওলানা ভারতবর্ষ তথা মুসলিম বিশ্বের দেশগুলির স্বাধীনতার সংগ্রামে যতই কর্মতৎপর ও ব্যতিব্যস্ত থাকুন না কেন, প্রতি বছরই যথারীতি তিনি বুখারী শরীফের শেষ হাদীসটুকু পর্যন্ত পড়িয়ে 'খতম' করতেন এবং তাঁর অন্য ব্যস্ততা যতই থাক না কেন, ৫/৭ শ মাইলের সফর সেরে এসেও তিনি ঘরে না গিয়ে সরাসরি দারুল হাদীসে গিয়ে যথারীতি ২/৩ ঘন্টা হাদীস পড়িয়ে তবে ঘরে যেতেন। এ জন্যই দারুল উলুমের দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছরকালের মুহতামিম মওলানা কারী তাইয়্যিব সাহেব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তাঁর বিরোধী (মুসলিম লীগ ভাবাপন্ন) হওয়া সত্ত্বেও খোলা মনে স্বীকার করেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ সালের পর দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে তালীমী, দ্বীনি, রূহানি ও ইজতেমাঈ (সামাজিক) আন্দোলনের সূচনা হয়, তার কয়েকটি যুগ, অধ্যায় ও বিপ্লবের পূর্ণতা মওলানা মদনীর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সাধিত হয়ে ১৯৫৭ সালে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। হযরত নানতুভী (র.) যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন, হযরত শায়খুল হিন্দের যুগে তা যৌবনে উত্তীর্ণ হয় এবং শায়খুল ইসলাম মদনী (র.) তা সম্পন্ন করেন। এভাবে ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৭]

বলাবাহুল্য মওলানা মদনীর রাজনৈতিক তৎপরতা যতই উল্লেখযোগ্য হোক না কেন, সদরুল মুদাররিস, দুরুল উলুম দেওবন্দ রূপে তাঁর ভূমিকা তাতে একটুও ম্লান হয়নি। মুহতামিম কারী তাইয়্যিবা সাহেব তাঁর এ গৌরবজনক ভূমিকার সাক্ষ্য দেওয়ার পর রইস আহমদ জাফরীর সে আক্ষেপ অর্থহীন হয়ে যায়। তবে কেবল শিক্ষা উন্নয়নের কাজে মনোযোগী থাকলে এ মনীষী যে আরো কত বিস্ময়ে জন্ম দিতে পারতেন, তা আল্লাহই জানেন।

==========

তথ্য নির্দেশ

১. মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
২. ঐ, পৃ. ১৫৬
৩. ঐ, পৃ. ১৫৭
৪. ঐ, পৃ. ১৫৮
৫. ঐ, পৃ. ১৫৭
৬. ঐ, পৃ. ১৫৮
৭. ঐ, পৃ. ১৫৮

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী

(১৮৮৬ –১৯৫২)

মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল বাকী' মাওলানা আবদুল্লাহিল-কাফীর সহোদর, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত নিঃস্বার্থ সমাজসেবক এবং আদর্শনিষ্ঠা রাজনীতিবিদ। তাঁর পিতা মাওলানা 'আবদুল হাদী ছিলেন একজন মুহীককিক' আলিম এবং সমাজ সংস্কারক।

মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল বাকী ১৮৮৬ খ্রী. স্বীয় মাতৃতালয়ে বর্ধমান জেলার ইব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার অধীনে লালবাড়ী মাদ্রাসায় পিতার সান্নিধ্যে এবং মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব নাবীনা দেহলভীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের

Dhaka University Institutional Repository

পর উত্তর ভারতের কানপুর মাদ্রাসায় ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ এবং আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৯০৬ খ্রী. পিতার মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে উত্তর বঙ্গের বিরাট আহল হাদীছ জামাআতের নেতৃত্বভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

বাংলার 'আলিম সমাজ ও মুসলিম জনগণের জড়তা ও দুর্দশা দর্শনে তাঁর আস্থা ব্যথিত হয়ে উঠে। তাই তিনি তদানীন্তন দেশবরেন্য আলিম ও নেতা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা দনীরুখ প্রমাণ ইসলামাবাদী, তরুটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের সহযোগিতায় আঞ্জুমান 'উলামা বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং উহার কর্মতৎপরতার বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

১৯১৯ খ্রী. বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিক্ষোভ যখন শিক্ষাঙ্গন আন্দোলনের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন বাংলাদেশে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দানে যাঁরা আগাইয়া আসেন, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩২ খ্রী. তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য দুইবার কারাবরণ করেন।

শেষবার জেলা হতে বের হয়ে মাওলানা 'আব্দুল্লাহিল বাকী প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন। প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থীরূপে তিনি ১৯৪৩ খ্রী. ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি নিখিলবঙ্গ কৃষকপ্রজা সমিতির সহকারী সভাপতি এবং পরে সভাপতি নির্বাচিত হন।

মওলানা সাহেব ১৯৪৩ খ্রী. মুসলিম লীগে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান পূর্বক পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি যুগপৎ পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদ এর সদস্যরূপে কাজ করেন। তিনি বিভাগপূর্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কিছুকাল প্রেসিডেন্ট পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পাকিস্তান মুসলীমলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন।

মওলানা বাকী'র রাজনৈতিক জীবনের মূল আদর্শ ছিল নিঃস্বার্থ দেশ সেবা এবং এই জন্যই তিনি সকল মহলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম গণপরিষদের গৃহীত আদর্শমূলক প্রস্তাব এবং মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট কুরআন ও সুন্নাহকে পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্রে পূর্ব স্বীকৃতি দেওয়ার কথা হয়। উহার মূলে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী এর সংগ্রামী অবদান অনস্বীকার্য।

মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী তাঁর কর্মজীবনের বৃহত্তর অংশ রাজনীতির চর্চায় ব্যয়িত করিলেও ধর্মীয় জামাআতী কার্যক্রম এবং সাহিত্য চর্চা হতে নিজেকে নিলিপ্তি রাখেন নাই। ১৯২৯ খ্রী. বগুড়া জেলা আহল হাদীছ কনফারেন্সে এবং ১৯৩৫ খ্রী. রংপুর জেলার

Dhaka University Institutional Repository

হায়াগাছে অনুষ্ঠিত উত্তর বঙ্গ আহল হাদী কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বারবার অধুনালুপ্ত 'আঞ্জুমান আহল হাদীস বাঙ্গালাঃ ও আসাম এর কার্যকরী সংসদের সদস্য এবং কখনও সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী. হারাগাছে অনুষ্ঠিত আহল হাদীছ কনফারেন্সে যোগদান করে তিনি নিখিল বঙ্গ ও আসাম জামইয়াত (পরে পূর্ব-পাকিস্তান জামইয়াত) আহল হাদীছ-এর গোড়াপত্তনে বিশেষ সহায়তা করেন।

অক্লান্ত জ্ঞান সাধক মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী এর আরবী ফারসী ও উর্দু ভাষায় পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। দর্পণশাস্ত্র এবং ইতিহাসেরও তিনি ছিলেন উৎসাহী পাঠক। তিনি শেষ বয়সে ইংরেজী শিক্ষা করেন। প্রসিদ্ধ 'আল-ইসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক ইসলাম বিষয়ক প্রবন্ধরাজি বাংলার ইসলামী সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। তাঁর একমাত্র পুস্তক হলো "পীরের ধ্যান"।[১]

==========

তথ্য নির্দেশ

১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী; বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ। প্রগতি প্রকাশনী ঢাকা-১৯৮৮ খ্রী. পৃ. ৯০।

মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ

(১৮৭৩ – ১৯৫২)

মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ.) ছিলেন আধাত্মিক গুরু। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের সুপন্ডিত শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কার ও দ্বীনি শিক্ষার মহাসাধক। বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে জ্ঞানের আলো বিশেষ করে দ্বীনী শিক্ষার আলো বিস্তারে অসংখ্য কীর্তির মাঝে মাওলানা নেছার উদ্দীন সাহেবের সর্ববৃহৎ কীর্তি হলো বৃহত্তর বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠির অধীন শর্ষিণা দারুসসুন্নাহ আলিয়া মাদ্রাসা এটি দেশের উচ্চ দ্বীনী শিক্ষার অন্যতম পাদপীঠ। এ মহান প্রতিষ্ঠানটির ন্যায় এদেশে বহু আলিয়া মাদ্রাসা থাকলেও ইলমে হাদীসের সাথে সাথে এখানকার ছাত্রদের মধ্যে আমলী ও রুহানী প্রশিক্ষণ দানের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি খ্যাত।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানাধীন শার্ষিণা গ্রামে ১২৭৯ খ্রী. (১৯৭২/৭৩ খ্রী.) বাংলাদেশের অন্যতম মহান পীর ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্করণ মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ.) সাহেবের জন্ম। তাঁর পিতার নাম সাদরুদ্দীন আহমদ। জনাব সাদরুদ্দীন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন শিক্ষিত প্রতিভাবান গ্রাম প্রধান ছিলেন। তিনি মরহুম হাজী শরীয়াতুল্লাহর পুত্র হাজী সাঈবুদ্দীন-এর মুরীদ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পীর সাহেবের বাল্য শিক্ষা নিজ গ্রামের পাঠশালায় শুরু হয়। বাল্য জীবনে তিনি সরল, সুবোধ, বিদ্যানুরাগী ও ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন। ধার্মিক পিতামাতার প্রভাবে বাল্য জীবনেই তাঁর ধর্মীয় অনুরাগের স্ফুরেণ ঘটেছিল। শৈশবেই তাঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটে। অতঃপর মাতার চেষ্টায় তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুরের একটি মাদ্রাসায় মাধ্যমিক মানের মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যায়ন করেন।

কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যায়নকালে তিনি উপমহাদেশের খ্যাতনামা পীর হুগলী জেলার মাওলানা শাহসূফী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ওরফে আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর হাতে বায়াআত হন, অতঃপর তিনি নিয়মিতভাবে তার সাহচার্যে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা লাভ করেন।[১]

দানে ছিলেন হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ সাহেব মুক্ত হস্ত। প্রত্যহ তিনি অগণিত গরীব দুঃখীকে মুক্ত হস্তে দান করতেন। অসংখ্য গরীব ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করতেন। তিনি বাংলা ১৩০৮ সনে সপরিবারে হজ্জ করেন। ৮০ বছর বয়সে তৃতীয় বার হজ্জ করতে যান। মক্কা শরীফ পৌঁছিয়াও তিনি তথাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থ দান করেন। পূর্বে মক্কা শরীফে বাঙ্গালী মুসলমানদের আহার বাসস্থানের বিশেষ অসুবিধা ছিল। তিনি তথায় একটি বিরাট মুসাফিরখানা তৈরী করে দেন।

তাছাড়া তিনি মক্কা ও মদীনার দুস্থ লোকদের সাহায্যকল্পে একটি সাহায্য তহবিলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই তহবিলে তিনি নিজে এবং তাঁর অসংখ্য মুরীদ প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন।

হযরত মাওলানা নেসার উদ্দীন আহমদ (র.) সাহেব পবিত্র মক্কায় পৌঁছিবার পর তিনি তথাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন। মাওলানা সাহেব গরীব-দুঃখীদেরকে দান খয়রাত করতেন। কোন লোক পত্র দ্বারাও যদি তার নিকট ঐ লোকের অভাব-অভিযোগের কথা জানাইত তবে তিনি সেই অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য টাকা পাঠিয়ে দিতেন।[২]

কোথাও দুর্ভিক্ষ, কি অন্য কোন কারণে দুর্যোগ দেখা দিলে, তিনি তখন সেখানে সাহায্য দ্রব্য পাঠাতেন এবং নিজেও সুযোগ পেলে যেতেন।

মাওলানা সাহেবের নিকট যে সব বকরী, গরু, মহিষ ও সুস্বাদু ফল প্রভৃতি মালামাল নজরানা স্বরূপ আসিত, তিনি ঐসব মালামাল অনেক সময় বিক্রি করে রিলিফ ফান্ডে জমা দিতেন অথবা মাদ্রাসায় সাহায্যে করতেন।

হযরত মাওলানা নেসার সাহেব মক্কা ও মদীনা শরীফের দুঃখগ্রস্ত লোকদের সাহায্যার্থে একটি রিলিফ ফান্ডও খুলে ছিলেন।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় রাস্তা নিরাপদ না থাকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানেরা হজ্জ করতে যেতে পারেনি। ইহার ফলে মক্কা ও মদীনার লোক এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। মাওলানা সাহেব ইহা অবগত হয়ে নিজ বাড়ীতে মক্কা ও মদীনার দুঃস্থদের জন্য একটা রিলিফ ফান্ড খুলেছিলেন এবং তাঁর মুরীদেরকে মুক্ত হস্তে দান করতে বললেন। তাঁর মুরীদগণ মুক্ত হস্তে দান করতে আদেশ করেন। হুজুরের মুরীদগণ তাঁর আদেম মত মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন। এমনকি তাঁর মুরীদগণ ব্যতিরেকেও অন্যান্য লোকেরা এই ফান্ডে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন। হিসাব করে দেখা গিয়াছে, উক্ত রিলিফ ফান্ডে প্রায় ৫৫ হাজার টাকা জমা হয়েছে।

মাওলানা সাহেব উক্ত ফান্ড হতে প্রতি মাসে মক্কায় এক হাজার টাকা করে পাঠাতেন। তিনি মক্কাতে যে বিদেশীদের থাকার জন্য একটি মুসাফিরখানা নির্মাণ করেছিলেন তাতে দৈনিক প্রায় একশত লোক থাকতেও ও খেতে পারত।[৩]

==========

তথ্য টিকা

১. মাওলানা বশীর আহমদ, "তাযকিরাতুল আওলিয়া, শিরীন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র)

(১৮৯৮ – ১৯৬৯)

খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষাবিদ, লেখক, আধ্যাত্মিক সাধক, সুপ্রসিদ্ধ ওয়ায়েয মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) ফরিদপুর জেলার (বর্তমান গোপালগঞ্জ) গওহরডাঙ্গা গ্রামে ১৮৯৮ খ্রী. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ'। মাতার নাম আমেনা খাতুন।

শিক্ষা জীবন:

তিনি প্রথমে স্থানীয় টুঙ্গীপাড়ার মুন্সী আজিজুল হকের পাঠশালা পরে বরিশাল জেলার নাজিরপুর থানাধীন সুটিয়াকাঠি স্কুল ও নোয়াপাড়ার ভাগুটিয়া হাই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার এ্যাংলো ফার্সীয়ান বিভাগে ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯২০ খ্রী. এন্ট্রান্স পাস করার পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এ সময়ে তিনি নিজের চেষ্টায় কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা চালিয়ে যান। এক পর্যায়ে তিনি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাই তিনি কলেজ ধারার শিক্ষাকে বাদ দিয়ে 'মাজহারুল উলুম সাহারানপুর' গমন করেন। এ প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বছর লেখা পড়ার করার পর তিনি 'দারুল উলুম দেওবন্দ' গমন করেন। সাহারানপুর মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার আগেই তিনি উপ-মহাদেশের প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধক ও হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর সঙ্গে পরিচিতি লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দে থাকার সময়ে তিনি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৮- ১৯৫৭) মাওলানা আনওয়ার শাহ

Dhaka University Institutional Repository

কাশ্মিরী (র) (১৮৭৫-১৯৩৩), মাওলানা সৈয়দ নবীর হোসেন মিয়া (১৮০৫-১৯০২), প্রমুখের নিকট ইলম দ্বীন তথা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্তি কালে তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী'র নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর খিলাফত প্রাপ্ত হন।[১]

কর্মজীবন:

ছাত্র জীবন শেষ করার পর মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী চলে আসেন বাংলাদেশে। দেশে এসে তিনি ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কর্ম জীবন শুরু করেন। তাঁর কর্ম জীবনের সমসাময়িক সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার গৌরব অর্জন করেন এ দেশের প্রসিদ্ধ অনেক মনীষী ও ইসলামী চিন্তাবিদকে। মাওলানা আব্দুল ওহাব পীরজী হুজুর (১৮৯০-১৯৭৬) ও মাওলানা মুহাম্মদ উল্যাহ হাফেজ্জী হুজুর (১৮৯৫-১৯৮৬) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রথমত এই দু'জন বিশিষ্ট 'আলিম দ্বীনকে সাথে নিয়ে তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ইউনুসিয়া মাদরাসায় তা'লিমের কাজ শুরু করেন। তৎকালে বাংলাদেশে কোন প্রকার আলীয়া বা কাওমী মাদরাসায় 'টাইটেল; বা 'দাওরায়ে হাদীস' পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি এই মাদরাসার মুহতামিম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।আর মাওলানা মোহাম্মদ উল্যাহ হাফেজ্জী হুজুর ও মাওলানা আব্দুল ওহাব পীরজী হুজুর উক্ত মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২]

পরবর্তীতে তিনি পূর্ব বাংলার প্রতিটি এলাকায় কুরআন শিক্ষার পথকে সুগম করার মহান লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে মক্তব/ফোরকানিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। সাথে সাথে নগর ও শহর কেন্দ্রিক উচ্চতর শিক্ষার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে তিনি উল্লেখিত দুই সহপাঠি সহ ১৯৩৫খ্রী. জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ত্যাগ করেন এবং দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় অসংখ্য মক্তব ও প্রাথামিক শিক্ষার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেমন:-

গাজালিয়া মাদরাসা, বাগেরহাট :

মাওলানা ফরিদপুরী (র) ১৯৩৫ খ্রী. বাগেরহাট কচুয়া থানাধীন গজালিয়ায় এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসার ভৌত কাঠামো ও শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন। এই জ্ঞান তাপসের দ্বীন প্রচার ও ইলমে দ্বীনের উৎকর্ষ সাধনের স্পৃহা ছিল বিরামহীন। এ অবস্থায় তিনি রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত উক্ত গজালিয়া মাদরাসা আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে এবং দাওরায়ে হাদীস পাঠদানের মানসম্পন্ন উন্নততর মাদরাসা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।[৩]

জামি'আ হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম, বড়কাটারা, ঢাকা :

এ মাদরাসাখানি ঢাকার চকবাজারের পার্শ্ববর্তী নদীর সন্নিকটে ১৯৩১ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হয়। সঠিক তত্ত্বাবধান ও যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তা কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। মাওলানা শামছুল

Dhaka University Institutional Repository

হক ফরিদপুরী (র) '১৯৩৬ খ্রী. এ মাদরাসা পুন:প্রতিষ্ঠা করে বর্তমান বড়কাটরার শাহী দালানে স্থানান্তর করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ কাঁজে তাকে বিশেষ ভাবে তাঁর পূর্ববৎ দুই সহপাঠী মাওলানা আব্দুল ওহহাব পীরজী হুজুর (র), মাওলানা মোহাম্মদ উল্যাহ পীরজী হুজুর (র) মুহতামিম, মাওলানা ফরিদপুরী (র) শায়খুল হাদীস ও মাওলানা মোহাম্মদ উল্যাহ হাফেজ্জী হুজুর (র) মুহাদ্দিস হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নব উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু করেন।[৪]

তখন সারাদেশের ইসলামী শিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য মাত্র তিনটি মাদরাসা পরিচালিত হত। মাদরাসা তিনটি হচ্ছে, (১) দারুল উলুম ম'ঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, (২) জীরি মাদরাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম ও (৩) দারুল হাদীস কানাইঘাট, সিলেট।[৫]

মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্বে বড় কাটরার এই মাদরাসা অল্প দিনের মধ্যে দেশের উল্লেখযোগ্য মাদরাসায় পরিগণিত হয়। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু ছাত্র এখানে অধ্যয়নের জন্য সমবেত হয়। মাওলানা ফরিদপুরী (র) কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদানের পাশাপাশি বেশ কিছু সংস্কার কাজও পরিচালনা করেন। যেমন:

১. দাওয়াত ও তাবলীগ বা ইসলাম প্রচার;

২. কাওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কর্মসূচী;

৩. মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে সমিতি গঠন পূর্বক ইত্তিহাদুল আইম্মাহ বা ইমামগণের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৪. কুরআনুল কারীমের তাফসীর মাহফিল চালু করণ;

৫. ইসলামের বিভিন্ন দিকের ওপর গ্রন্থ রচনা ইত্যাদি।

১৯৩৬ খ্রী. থেকে ১৯৪৯ খ্রী. পর্যন্ত তিনি এ মাদরাসায় কর্মরত ছিলেন। অদ্যাবধি এ মাদরাসা সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর রেখে যাওয়া এ মাদরাসায় মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (১৮৯২-১৯৯৫) ও মাওলানা ওবাইদুল হকের মত খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও বিজ্ঞ আলিমগণ তাঁর পথ অনুসরণ করে হাদীস কুরআনসহ অপরাপর ইসলামী শিক্ষার বিষয়াদী শিক্ষা দান করেন। মাওলানা ফরিদপুরী (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসায় অধ্যয়ন করে বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী মনীষী জন্ম লাভ করেছেন, যাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

জামি'আ কুর'আনিয়া 'আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা :

মাওলানা ফরিদপুরী (র) ১৯৫০ খ্রী. ঢাকার লালবাগ কেল্লার নিকটবর্তী স্থানে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ কাজে মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (র), মাওলানা মোহম্মদ উল্যাহ হাফেজ্জী হুজুর ও মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান তাঁকে বিশেষভাবে প্রেরণা দান করেন। এ মাদরাসায় মাওলানা ফরিদপুরী (র) মুহতামিম পদে এবং হাফেজ্জী হুজুর (র) মুহাদ্দিস পদে অধিষ্ঠিত হন।

যোগ্যতা এবং দক্ষতার মাধ্যমে মাদরাসা পরিচালনার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে ফরিদপুরী (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসা দেশের শীর্ষ স্থানীয় কাওমী মাদরাসা হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। ১৯৬৮ খ্রী. পর্যন্ত একটানা তিনি এ মাদরাসায় কর্মরত ছিলেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি এ বছর এখান থেকে অবসর

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে এ মাদরাসায় দেশের শীর্ষ স্থানীয় বেশ কয়েকজন আলিম ও মুহাদ্দিস শিক্ষা দান করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন,

১. মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান (১৯০০-১৯৭৪)

২. মাওলানা হিদায়েত উল্যাহ (১৯০৮-১৯৯৬)

৩. মাওলানা আব্দুল মজীদ (১৯১৮-১৯৯৭)

৪. মাওলানা সালাহ উদ্দিন (১৯২২-১৯৯৭)

৫. মুফতি মাওলানা আবদুল মঈয (১৯১৯-১৯৮৪)

মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর আদর্শে এরা অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষা দানের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মসূচী ও বাস্তবায়ন করেন।[৬]

আল্ জামি'আ আল্ ইমলামিয়া দারুল 'উলুম খাদেমুল ইসলাম (গওহরডাঙ্গা মাদরাসা রামে অধিক পরিচিত) গওহর ডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ :

এ মাদরাসাখানি তাঁর জন্মস্থানে অবস্থিত। ১৯৩৭ খ্রী. তিনি এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করের। তৎকালে অত্র এলাকায় কোন মাদরাসা ছিল না। তিনি এ এলাকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সে সময়ে ঢাকায় অবস্থান করলেও এ মাদরাসাখানি তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাঁর একান্ত অনুজ ও ভক্ত প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আব্দুল আযীয (১৯০৫-১৯৯৪) (র) কে মুহতামিম হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তিনি (মুহতামিম) তাঁর নির্দেশমত মাদরাসাকে পরিচালনা করে উচ্চমান সম্পন্ন মাদরাসায় পরিণত করতে সক্ষম হন। বর্তমানে এ মাদরাসা বাংলাদেশের অন্যতম কাওমী মাদরাসা হিসেবে বিবেচিত হয়ে চলেছে।[৭]

জামি'আ 'আরাবিয়া ইমদাদুল'উলুম, ফরিদাবাদ, ঢাকা :

ঢাকা শহরের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী স্থানে ১৯৫৬খৃ. মাওলানা ফরিদপুরী (র) এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমদিকে মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র)-এর মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাদরাসাখানি আজও সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। দেশের খ্যাতনামা মাদরাসার মধ্যে এই মাদরাসাও অন্যতম।[৮]

মাওলানা ফরিদপুরী (র) কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাবলী :

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থাদী রচনায় এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেন। তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রন্থ রচনা করায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আরবী ও উর্দূ ভাষার প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণের গ্রন্থসমূহ প্রথমে অনুবাদ করার মনস্থ করেন। বিশেষ করে তাঁর আধ্যাত্মিক অগ্রজ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন-[৯]

Dhaka University Institutional Repository

১.বেহেশতী জেওর, ২.ফরউল ঈমান, ৩. ছাফায়ে মুআ'মেলাত, ৪. হায়াতুল মোসলেমীন, ৫. মুনাযাত-ই-মকবুল ৬. তা'লীমুদ্দীন।

বহু প্রতিভার অধিকারী মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর গ্রন্থ অনুবাদের বড় দিক হচ্ছে তিনি হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সহীহ বোখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ করার জন্য মাওলানা আজিজুল হককে অনুপ্রেরণা দান করেন। বাংলা ভাষায় হাদীস শাস্ত্রের এটা প্রথম সংকলন। তাঁর প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় এ ঐতিহাসিক কাজটি মাওলানা আজিজুল হক সম্পন্ন করেন। বুখারী শরীফের এ অনুবাদকর্ম সাত খন্ডে বিভিন্ন সময় ঢাকায় প্রকাশিত হয়।[১০]

মাওলানা ফরিদপুরী (র.) কর্তৃক রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক বলে জানা যায়। তন্মধ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১, তাফসীরুল কুরআন।

২. পাঞ্জ সূরার তাফসীর।

৩. আমপারার তাফসীর।

৪. পীরের তাফসীর।

৫. প্রশ্ন উত্তরে তাসাউফ।

৬. মুক্তির পথ।

৭. তাছাউফ তত্ত্ব।

৮. এছলাহে নফস।

৯. এলমের ফজিলত।

১০. নামাজের ফজিলত।

১১. রোজার ফজিলত।

১২. জেকেরের ফজিলত।

১৩. হজ্জের ফজিলত।

১৪. নামাজের অর্থ।

১৫. ছহীহ নামাজ শিক্ষা।

১৬. দ্বীনিয়াত ও নামাজ।

১৭. তাবলীগের ফজিলত।

১৮. হাদীসে আরবাঈন।

১৯. আমলে কোরআনী।

২০. বেদআত ও ইজতেহাদ।

২১. জেহাদের আহবান।

Dhaka University Institutional Repository

২২. মাতৃজাতির মর্যাদা।

২৩. আজল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ।

২৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে পারিবারিক আইন।

২৫.ঈদ ও চাঁদ সমস্যার সমাধান।

২৬. তিন তালাক সমস্যা ও সমাধান।

২৭. ইসলামী পরিবার পরিকল্পনা।

২৮. বাংলা ফারায়েজ।

২৯. নেতার কর্তব্য।

৩০. ওমর ইবনে আবদুল আজিজ।

৩১. সংক্ষেপে ইসলামী জিন্দেগী।

৩২. বিদায় হজ্ব।

৩৩. ভোটারের দায়িত্ব।

৩৪. মাতা পিতার হক।

৩৫. আল্লাহর পরিচয়।

৩৬. মানুষের পরিচয়।

৩৭. হাদীস রত্ন ভান্ডার।

৩৮. হালাল ও হারাম।

৩৯. জামায়াতি জিন্দেগী।

৪০. যুদ্ধের সময় দেশবাসীর কর্তব্য।

৪১. অসৎ আলেম ও পীর।

৪২. এই জামানায় ইসলামী নেজাম সম্ভব নয়কি?

৪৩. খেদমতে খালক বা দুঃস্থ মানবতার সেবা।

৪৪. জনসেবা।

৪৫. জনগণের কর্তব্য।

৪৬. প্রাথমিক আদর্শ শিক্ষা।

৪৭. মাদরাসা পদ্ধতি।

৪৮. ইসলামের অর্থনীতি।

৪৯. কুটির শিল্প ও ইসলাম।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ক্ষেত্রে মাওলানা ফরিদপুরী (র.)-এর অবদান :

১. ইসলামের মৌলিক দিক নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা এবং এ ক্ষেত্রে লোক তৈরীর জন্য তিনি এদারাতুল মা'আরিফ নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালু করেছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তা অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। দেশের প্রখ্যাত 'ওলামায়ে কিরামগণকে নিয়ে তিনি এ প্রতিষ্ঠান' চালু করেছিলেন।[১২]

২. কুরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন, তাঁর এক প্রিয় ছাত্র প্রসিদ্ধ ক্বারী মাওলানা বেলায়েতকে নিয়ে তিনি এ লক্ষে 'নুরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা' নামে একটি কর্মসূচী শুরু করেছিলেন। তার এই কর্মসূচীর ধারাবাহিকতায় কয়েক হাজার নুরানী পদ্ধতীর মকতব সারা দেশে পরিচালিত হচ্ছে।

৩. কুরআন তহবিল নামে তিনি একটি তহবিল গঠন করে দ্বীনের প্রসার ও ইসলামী শিক্ষার জন্য ব্যয় করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন।[১৩]

৪. ১৯৬৬ খ্রী. তিনি খুলনার টাউন হলে পাঁচটি জেলার ইমামদের নিয়ে একটি ইমাম সমিতি গঠন করেন। ইমামদের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ দ্বারা ইসলামী মূল্যবোধ দেশে প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে তিনি এই সমিতি গঠন করেন।[১৪]

৫. মাদরাসা শিক্ষার সাথে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয় খুবই জরুরী। এ জন্য তিনি দেশের কাওমী মাদরাসা সমূহে সাধারণ শিক্ষার বিষয়াদী সিলেবাসভুক্ত করার জন্য চেষ্টা চালান। গওহর 'ডাঙ্গা, লালবাগসহ কতিপয় মাদরাসা তিনি সিলেবাসের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।

৬. ১৯৬৩ খ্রী. আইয়ুব খান কর্তৃক গঠিত মোয়াজ্জেম হোসাইনের নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তাতে তিনি সক্রিয় সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। দেশে একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রচেষ্টায় একটি প্রস্তাবনা তৎকালীন সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছিল।

৭. মাদরাসা শিক্ষায় কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তনে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, বাংলাদেশের কাওমী মাদরাসা সমূহের মধ্যে তিনি প্রথম গওহর ডাঙ্গা মাদরাসায় কর্মমূখী কারিগরী শিক্ষা চালু করেন।

৮. খাদেমুল ইসলাম জামায়া'ত নামে ১৯৪০ খ্রী. তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় এর ৪০ টির বেশী শাখা তিনি গঠন করেন। ইসলামী চিন্তা চেতনা ও ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুনের বিকাশ সাধনের জন্য তিনি এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫]

৯.বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় অবদান রেখেছিলেন। বর্তমান বায়তুল মোকাররম মসজিদটি যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, এখানে তৎকালীন শিল্পপতিরা এ জায়গায় মার্কেট হিসেবে চালু করার চেষ্টা চালান। তিনি তাদেরকে এ স্থানে শপিং কমপ্লেক্স না করে দ্বীনি কমপ্লেক্স করার জন্য বাধ্য করেন। তাঁর যুক্তিমূলক পরামর্শে তারা এখানে ইসলামী কমপ্লেক্স যা পরবর্তীতে বায়তুল মোকাররম সোসাইটি, ইসলামীক একাডেমী ইত্যাদি নামে কার্যক্রম শুরু করে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

১০. বাইতুল্লাহ'য় তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে গমন করলে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে সকল মাযহাবের 'ওলামাদের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সেখানে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। বাদশাহ আব্দুল আজিজ কনফারেন্স উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর আলোচনা শুনে তাঁকে বুকে জড়িয়ে নেন এবং 'সদরুল 'ওলামা ' খিতাবে ভূষিত করেন।[১৭] ধারণা করা হয়, এরপর থেকে তিনি 'সদর সাহেব হুজুর' নামে পরিচিত লাভ করেন।

১১. মাওলানা ফরিদপুরী (র) পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৫ খ্রী. 'ওলামায়ে হিন্দের বিপরীতে তিনি 'জামায়াতে ওলামায়ে ইসলাম' নামক সংগঠক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৬ খ্রী. থেকে ১৯৪৭ খ্রী. সময় তিনি সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আদায় করেন।

ঐতিহাসিক শিমলা কনফারেন্সে তিনি বিপ্লবী ভাষায় বক্তব্য দেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে খাজা নাজিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এ, কে, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন, মাওলানা আকরাম খাঁন, তমিজুদ্দীন খান, মাওলানা আতাউর আলী প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন। সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেট জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করণে তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টা নিবেদিত ছিল।[১৮]

তিনি অগণিত ছাত্র, খোলাফা ও ভক্ত অনুসারী রেখে ১৯৬৯ খ্রী. ২১জানুয়ারী মহান আল্লাহ'র ডাকে সাড়া দিয়ে পরকালীন যাত্রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৯]

তথ্য নির্দেশ

১. মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এর শিক্ষাজীবন, আল্লামা শামছুল হক স্মরণিকা, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, গোপালগঞ্জ-১৯৯৭ খ্রী. পৃ. ৩–৪

২. মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, সমাজ সংস্কারক আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরীর জীবনী, গোপালগঞ্জ (খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স-১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ২৫-৩০

৩. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৪. মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, সমাজ সংস্কার আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরীর জীবনী, গোপালগঞ্জ (খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স-১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ২৫-৩০

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৬. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, লালবাগ জামি'আ একটি যুগান্তকারী ইতিহাস, (আল-জামি'আ স্মরণিকা-১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ১২

৭. প্রসপেকটাস, আল জামি'আ আল ইসলামিয়া, গওহর, পৃ. ৩

৮. অফিস রেকর্ড ও সরেজমিন পরিদর্শন রিপোর্ট জামি'আ আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা (পরিদর্শন তারিখ: ২১-৮-১৯৯৯ খ্রী.)

৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৯২ খ্রী.), পৃ. ২৪৮

১০. মাওলানা মুহাম্মদ তকী ওসমানী, নকুস-এ-রফতেগা দেওবন্দ, (মাকতবা জাবীদ-১৪১৪ হিজরী), পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

১১. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, (ইফাবা-১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ২০২-২০৪
১২. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (র)-এর জীবনী-১৯৯৮ (তা.বি.),পৃ. ১১৩
১৩. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (পূর্বোক্ত), পৃ. ১২৫
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
১৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা-২০০০ খ্রী.
১৬. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (পূর্বোক্ত), পৃ. ১৩০-১৩১
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
১৮. মাওলানা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (পূর্বোক্ত), পৃ. ১২০
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

মাওলানা আতাহার আলী (র.)

(১৮৯১-১৯৭৬)

ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে স্বনামধন্য এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা আতহার আলী (র.)। ১৮৯১ খ্রী. মোতাবেক ১৩০৯ হিজরী সনে রোজ শুক্রবার তিনি সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার থানাধীন গোংগাদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আজিম খান। মাতার নাম আতেরা বিবি। তাঁর পিতৃপুরুষ ইরানের রংশদ্ভূত ছিলেন। তিনি তৎকালীন সময়ে একটি ভদ্র ও দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ আশিক মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত খোদাপ্রেমিক লোক ছিলেন। যার কারণে তাঁর বংশের সকলেই খাঁটি মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করেন। তাঁর পিতা একজন 'আলিম ও মুত্তাকী' ব্যক্তি ছিলেন।[১]

শিক্ষা জীবন :

পিতার নিকট তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। গ্রামের মকতবে পিতার নিকটেই তিনি কুরআনুল কারীম শিক্ষা করেন। এরপর উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান তিনি পিতার নিকটে লাভ করেন। ছোট বেলা থেকে মাওলানা আতহার আলী (র.) অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন ও ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। খেলাধূলা বা অপ্রয়োজনীয় ঘোরা ফেরায় না গিয়ে তিনি ছেলে বেলাতেই লেখাপড়ায় মশগুল থাকতেন। আরবী শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি দেশের বেশ কিছু মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। মাদরাসা আলীয়া জংগী বাড়ীতে তিনি বেশ কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি মাওলানা ইবরাহিম তাশনা (র.) ও মাওলানা আবদুল বারী (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করে ইলম হাসিল করার সাথে সাথে উন্নত চারিত্রিক মর্যাদায় উন্নীত হন। এভাবে আরবী কিতাব সমূহের দ্বিতীয় স্তর (মাধ্যমিক স্তর) অতিক্রম করেন এবং ইসলামী শিক্ষায় বিরাট বুৎপত্তি অর্জন করেন।

তৎকালীন সময়ে সাহারানপুর মাযাহির 'উলুম মাদরাসা ও দারুল উলুম দেওবন্দ ব্যতিত উচ্চ ইসলামী শিক্ষা লাভের কোন মাদরাসা এতদঞ্চলে ছিল না। ফলে ইসলামী শিক্ষার উচ্চস্তর পর্যায়ের শিক্ষা লাভের জন্য এদেশের অনেকেই এ দু'মাদরাসায় পাড়ি জমাত। মাওলানা আতহার আলীও (র.) তাই ইসলামী শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রী লাভের সৎ উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ সাহারানপুর মাযাহিরুল উলুম মাদরাসা, রামপুর আলীয় মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। এই সময় তিনি দেওবন্দ

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসায় মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র.), মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (র.) কে স্বনামধন্য শিক্ষক হিসেবে পেয়ে তাদের প্রশংসনীয় ছাত্রত্ব বরণ করার গৌরব অর্জন করেন। তিনি মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী দেওবন্দী (র.), মাওলানা রসূল খান (র.), মওলানা ইব্রাহিম ও মাওলানা ইয়াজ আলী (র.) নিকট হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেছেন। এরপর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর সঙ্গ ও খিলাফত লাভ :

প্রকাশ্য ইলম আয়ত্ব করার পর তিনি তাযকিয়ায়ে নফসের উদ্দেশ্যে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর নিকট গমন করেন। তার স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার ও ইলমী শক্তি সামর্থ থানবী (র.) কে রীতিমত মুগ্ধ করে ফেলে। তিনি তাকে বাইয়াত করান এবং তাঁর সাথে তিনি বেশ কিছু দিন সময় কাটান।[২] এ সময়ে তিনি থানবী (র.) এর জাহেরী ও বাতেনী সফলতার উপর ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মাওলানা থানবী (র.) তার জ্ঞান গরীমা, দুরদর্শীতা ও দাওয়াত তাবলীগের কৌশল অবলম্বনকে খুব কাছ তেকে অবলোকন করেন। যার ফলে তিনি তাকে যোগ্যতার আলোকে খিলাফত প্রদান করেন। ১৩৩৮ হিজরী সনে তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর খিলাফত লাভে ধন্য হন।

তিনি ছোট বেলায় কুরআনুল কারীম বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শিখেছেন কিন্তু হিফজ করেননি। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মেহেরবাণীতে তিনি ১৯২১ খ্রী. অর্থাৎ তাঁর ৩২ বছর বয়সে অলৌকিকভাবে কুরআনুল কারীম হিফজ করার গৌরব অর্জন করেন। এ বছর তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে (নিজ এলাকায়) রমযানুল মোবারক উপলক্ষে আসেন। লোকেরা তাকে হাফিজুল কুরআন মনে করে তাঁর পেছনে তারাবীহ নামায আদায় করার আবদার জানালে তিনি রাজী হন। পরে প্রতিদিন এক পারা করে মুখস্থ করে নামায পড়াতে থাকেন। এভাবে তিনি ত্রিশ দিন তারাবীহ'র নামাযের ইমামতি করার মাধ্যমে পুরো কুরআন মুখস্থ করার গৌরব অর্জন করেন। পরবর্তী ৭৫ দিনে তিনি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কুরআনুল কারীম যথাযথভাবে হিফজ করে 'হাফিজুল কুরআন' রূপে নিজেকে তৈরী করে নেন।[৩]

শিক্ষকতা জীবন:

তিনি শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন নিজের জন্মভূমি গোংগাদিয়ায়। এখানে নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকাশের সুযোগ লাভ করেন। কারণ তিনি নিজের জন্মভূমিতে প্রথমে দ্বীনি শিক্ষার ধারাবাহিকতা চালু করাকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় মনে করেন। এখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করে মাদরাসা চালু করে দিয়ে তিনি সিলেটের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা জংগীবাড়ী আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। এখানে বেশী দিনি তিনি থাকেননি। ইতোমধ্যে বড় বড় মাদরাসাসমূহ থেকে তার জন্য ডাক আসতে শুরু করে।[৪]

এরপর তিনি জামিআ মিল্লিয়া কুমিল্লা শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। তাঁর শিক্ষা দানে ছাত্ররা যথাযথ উপকার পেতে শুরু করায় তিনি এসব মাদরাসায় অত্যন্ত স্বনামধন্য ও সম্মানজনক অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের সময় মাওলানা মুহাম্মদ উল্যাহ

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ্জী হুজুর (র.) ও মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) বাক্ষণবাড়ীয়া ইউনুসিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের কাছাকাছি অবস্থান করাকে মাওলানা আতাহার আলী (র.) অতিশয় সৌভাগ্যে মনে করেছিলেন।

কিশোরগঞ্জে গমন :

কিশোরগঞ্জ জেলা (তৎকালীন থানা শহর) শহরের পূর্ব দিকে 'বুলায়ী' নামক গ্রামে এক মুসলমান জমিদার বাস করত। তাঁর ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের প্রতি তৎকালীন সময়েও খুবই অনুরক্ত ছিলেন। মাওলানা আতাহার আলী (র.)-এর কথা শুনার পর তাদেরই একজন স্বনামধন্য পুরুষ জনাব সাইয়্যেদ মুসলেহ উদ্দীন তাকে পাওয়ার জন্য তার পীর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর নিকট আবদার জানান। থানবী (র.) মাওলানা আতাহার আলীকে এখানে আসার জন্য আদেশ করেন। প্রথমে তিনি এটাকে তত গুরুত্ব দেননি। পরবর্তীতে পুনরায় জোর তাগিদ দিয়ে থানবী (র.) তাঁকে আদেশ করার পর তিনি কিশোরগঞ্জের উক্ত স্থানে আগমন করেন। দীর্ঘদিন এখানে থেকে ওয়াজ নসীহত এবং দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাধাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। জমিদারী চাল চলন তাঁর অপছন্দ ছিলো বলে থানবী (র.) এর অনুমতিক্রম তিনি নিজ জন্মভূমিতে চলে যান।

হায়বত নগর ঈদগাহের খতীব ও ইমাম পদে নিযুক্তি :

তৎকালীন সময় হতে কিশোরগঞ্জ জেলার হায়বত নগরে একটি ঈদগাহ ময়দান রয়েছে। যেখানে সোয়া লক্ষ মুসল্লী জামাতে নামায আদায় করার জন্য আসতেন। আজও এখানে এই ঈদগাহ ময়দান বিদ্যমান আছে এবং একে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ মনে করা হয়। পাশে দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ রয়েছে। তখনকার স্থানীয় প্রচলিত বিধান ছিল যিনি দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হবেন, তিনি উক্ত ঈদগাহ ময়দানে খতীব ও ইমামতির দায়িত্ব পালন করবেন। ইতিপূর্বে এখানে মাওলানা সাইয়্যেদ মুসলেহ উদ্দীন খতিব ও ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কোন কারণে তিনি এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে একজন যোগ্য আলিমকে এখানে নিয়োগ দানের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিভিন্ন দিক থেকে মাওলানা আতহার আলী (র.) কে এখানে ইমাম ও খতিব নিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। এ সময়ে তিনি হয়বত নগর আলীয়া মাদরাসা কিশোরগঞ্জে দরসে হাদীসের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ইমাম ও খতিব হিসেবে নিয়োগ লাভের প্রস্তাব করা হলে তিনি নিজের শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর অনুমতিক্রমে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৫] এ দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি এলাকায় কুরআন ও হাদীসের দরসের ব্যবস্থা চালু করেন। এ সময়ে তাঁর স্বভাব চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা ও ঈমান আমলে উন্নততর অবস্থা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অগণিত লোক তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন এখানে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার পর তিনি এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শহিদী মসজিদের ইমাম হিসেবে নিযুক্তি:

দেওয়ান বাড়ীর এ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার পর কিশোরগঞ্জে ডা. শরফুদ্দীন (ওরফে বাদশা মিয়া) মৌলভী সাঈদুর রহমান ও মৌলভী আমির উদ্দিনের অনুরোধক্রমে তিনি শহিদী মসজিদের ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, এই মসজিদ খানি হিন্দু অধ্যুষিত অবস্থায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার হিন্দুর সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ করে একে রক্ষা করে। বহু মুসলমান তাতে শহীদ হয়ে যান। এজন্য তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই মসজিদের নাম শহিদী মসজিদ হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে খ্যাত হয়ে যায়। এই মসজিদে তিনি ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মসজিদে ইলমে দ্বীন শিক্ষার একটি চমৎকার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন।[৬] আজও কিশোরগঞ্জের পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট উক্ত শহিদী মসজিদ মাওলানা আতহার আলী (র.) এর স্মৃতিকে অম্লান করে রেখেছে।

এমদাদুল উলুম মাদরাসার প্রতিষ্ঠা:

নিরলস পরিশ্রম, সদা নিবেদিতপ্রাণ মাওলানা আতহার আলী যেখানেই দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন অনাবাদী এলাকাকে দ্বীন ও ইলমের ফসলে আবাদী এলাকায় রূপান্তর করেছেন। শহিদী মসজিদে থাকাবস্থায় তিনি এর পশ্চিম পার্শ্ববর্তী এলাকায় ১৯৪৫ খ্রী. একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। তাঁর দাদা পীর শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (র.)-এর নামে এর নামকরণ করেন 'এমদাদুল উলমু' মাদরাসা। তাঁর সাধনায় অল্প দিনে মাদরাসা খানি অবিরাম উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করে। ফলে পরবর্তীতে একে জামি'আ এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ' হিসেবে নামকরণ করা হয়। আর এমনিভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অনন্য ইসলামী বিদ্যাপীঠ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। জামি'আ এমদাদিয়া এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

(১) ইসলামী তথা আরবী শিক্ষার পরিপূর্ণ কুরআনি শিক্ষা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকাইদ, 'উলুমুল কুরআন, উসুলে হাদীস, উসুলে ফিকহ, বালাগাত, ছরফ, নাহু, মানতিক ও ফালছাফা (ইসলামী দর্শন) ইত্যাদি বিষয় পাঠদান।

(২) উচ্চস্তরে পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের বিস্তারিত কিতাবাদীর পাঠদান করে ব্যুৎপত্তি অর্জনের ব্যবস্থা করণ।

(৩) এছাড়া পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক স্তরে অংক, ইতিহাস ইউনানী শাস্ত্র, বিজ্ঞান, ফারসী, বাংলা, ইংরেজীসহ অন্যান্য সাধারণ বিষয় সমূহের পাঠদান।

(৪) ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ওয়াজ, আলোচনা সভা, সেমিনার এবং লেখালেখির মাধ্যমে প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা, যাতে 'সালফিল সালেহীন' তথা 'খাইরুল কুরুনের' নমুনায় একদল যোগ্য নবীর উত্তরসূরী তৈরী হয়।[৭]

(৫) বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা তথা এ ধরণের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং জামি'আ দ্বারা পরিচালনা করা।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) ওলামায়ে কিরাম ও এখানে শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৭) উচ্চতর গবেষণা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

জামি'আকে পরবর্তী সময়ে কয়েকটি বিভাগে বিন্যস্ত করে পাঠদান ও অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। জামি'আর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে-

(১) মাওলানা হাফেজ আনোয়ার শাহ (নায়েবে মুহতামিম)

(২) মাওলানা আতাউর রহমান খান (বেফাক এর সেক্রেটারীর দায়িত্ব ও তিনি কিছু সময় পালন করেন)।

(৩) মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ। (পরবর্তীতে ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন)।

(৪) মাওলানা খলিলুর রহমান (মুহতামিম আনোয়ারুল উলুম বরুনা সিলেট)।

মাওলানা আতহার আলী (র.) তখনকার জন্য যেমন মাদরাসাকে পর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করেন। অনাগত ভবিষ্যতেও যেন এ ব্যবস্থা চলমান থাকে তার জন্য বহু সহায় সম্পত্তি গড়ে তোলেন। যেগুলোর আয় দিয়ে জামি'আ পরিচালনা সম্ভব হয়। দেশ-বিদেশী বহু ইসলামী চিন্তাবিদ, দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম, সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ এই জামি'আ পরিদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম উল্লেখ করেন:

(১) মাওলানা মুফতী সহুল (র.) (ভাগলপুরী) প্রাক্তন মুফতীয়ে আযম, দারুল উলুম দেওবন্দ।

(২) মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী (র.), সদস্য,পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী শিক্ষা বিভাগ।

(৩) আল্লামা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী (র.) নদওয়াতুল ওলামা লখনৌ।

(৪) ক্বারী মোহাম্মদ তাইয়্যেব (র.) সাবেক মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ।

(৫) মুফতী মোহাম্মদ শফি (র.) মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান ও করাচী দারুল উলুমের প্রিন্সিপাল।[৮]

(৬) মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী (র.), লেখক, আছাহুস সিয়ার গ্রন্থ।

(৭) মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন নুরী (র.), শায়খুল হাদিস মাদরাসা-ই-আরাবিয়া, করাচী।

(৮) মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মোস্তফা মদনী (র.), অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-মাহমুদিয়া বরিশাল।

(৯) মাওলানা মাকছুদ উল্যাহ (র.), খলিফা, থানবী (র.)।

(১০) মাওলানা লুৎফর রহমান (র.) সিলেট।

(১১) মাওলানা আবরারুল হক, খলিফা থানবী (র.)।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) মাওলানা হাকিম আকাতর শাহ (র.)।

(১৩) মাওলানা মুফতী মাহমুদ (র.), মন্ত্রী, সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান।

(১৪) মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (র.)।

(১৫) মাওলানা সালমান নদভী (র.)।

সরকারী কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ মাদরাসা পরিদর্শন করেন-

(১) ইস্কান্দার মির্জা, গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তান।

(২) চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান।

(৩) তজীম উদ্দীন খান, পরিচালক মিল্লিয়ায়ে ইসলামীয়া পাকিস্তান।

(৪) ম্যাজিস্ট্রেট আবদুস সাত্তার, শিক্ষামন্ত্রী পাকিস্তান।

(৫) লুৎফর রহমান খাঁন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী, পাকিস্তান।

(৬) মিয়া জাফর শাহ, যোগাযোগ মন্ত্রী, পাকিস্তান।

(৭) রমিজ উদ্দিন, যোগাযোগ মন্ত্রী, পাকিস্তান।

(৮) ফরিদ আহমদ, শ্রমমন্ত্রী, পাকিস্তান।

(৯) মাহমুদুন নবী চৌধুরী, মন্ত্রী, পাকিস্তান।

(১০) আতাউর রহমান খান, সাবেক মন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তান।

(১১) চৌধুরী আশরাফ উদ্দিন, শিক্ষামন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তান।

(১২) মুজিবর রহমান, পরিচালক, দুর্নীতি দমন ব্যুরো পাকিস্তান।

(১৩) উমরাও খান, চীফ আর্মি স্টাফ ডিভিশন।

মাওলানা আতাহার আলী (র.) উপরে বর্ণিত মাদরাসা ও মসজিদ ছাড়াও আরও কিছু মাদরাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন।

রাজনৈতিক জীবন:

মাওলানা থানভী (র.) সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন এবং থানভী (র.) এর খলিফা হওয়ার কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কখনও জড়িত হওয়া পছন্দ করতেন না। তবুও (১৯৩৭খ্রী.- ১৯৪৭ খ্রী.) পর্যন্ত সময় পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন, হিন্দু মুসলিম সংঘাতসহ অন্যান্য কারণে মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন সময় ছিল। দেশ জাতি ও মিল্লাতকে বাঁচানোর তাগিদে তিনি রাজনৈতিক ময়দানে আসার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। প্রথম দিকে তিনি পাক-ভারত বিভক্তির বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে পাকিস্তানের স্বাধীকার আন্দোলনে বড় বড় ওলামায়ে কিরামের সাথে তিনি অংশগ্রহণ করেন পাকিস্তান আন্দোলনে তার বিশেষ অবদান ছিল। এর জন্য তিনি প্রত্যন্ত এলাকা সফর করেন।

১৯৪৯ খ্রী. তিনি দেওবন্দী 'ওলামায়ে কিরামদের সমন্বয়ে একটি জামিয়াত প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা শিব্বির আহম্মদ ওসমানী (র.) মুফতী শফী (র.)-সহ এতে অংশ নেন। ১৯৫০ খ্রী. ৬

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর তাঁর সভাপতিত্বে জমিয়তের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই সনের ১৫, ১৬, ১৭ নভেম্বর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও জমিয়তে বরিশালের ছারছীনায় অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন গভর্ণর লিয়াকত আলী খানের ইসলামী শিক্ষা বিরোধী আইনের বিরোধিতায় তিনি গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৯৫১ খ্রী. ১৪,১৫, ১৬ জানুয়ারী সিলেটে মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী (র.)-এর সভাপতিত্বেও (২১-২৪ জানুয়ারী) করাচীতে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে তৎকালীন সংসদে পেশ করা হয়। মাওলানা আতাহার আলী (র.) ছিলেন সংগঠকদের অন্যতম।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতৃত্ব :

পূর্ব থেকে ওলামায়ে ইসলামের নেতৃত্ব দানে তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫০ খ্রী. কাউন্সিলের সিদ্ধান্তক্রমে ছারছীনার মরহুম পীর সাহেব মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ সভাপতি ও মাওলানা আতাহার আলী, সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত হন।[৯]

নেজামে ইসলাম পার্টি গঠনে তাঁর অবদান :

১৯৫৩ খ্রী. পূর্ব পাকিস্তানে নেজামে ইসলাম পার্টি নামে একটি পৃথক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভূমিকা পালনে এই পার্টি নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। মাওলানা আতাহার আলী (র.) ছিলেন এর প্রথম সারির নেতা এবং এক সময় দলের সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৫৩ খ্রী. ২৮ ডিসেম্বর জমিয়ত উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে শেরে-ই-বাংলা এ.কে.ফজলুল হক (তৎকালীন কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি) এর সাথে একটি ঐক্যজোট গঠন করেন। এতে সমঝোতায় অন্যান্যদের মধ্যে স্বাক্ষর করেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ খ্রী. মাওলানা আতাহার আলী (র.) শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হককে কুরআন সুন্নাহ মতে রাষ্ট্র এবং যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য একটি পত্র লেখেন।

পত্রে তিনি তার সাথে ঐক্যের প্রশ্নে ও জনগণের দাবীর শর্ত হিসেবে এ চিঠিতে উল্লেখ করেন।

এ চিঠি পাওয়ার পর এ.কে.ফজলুল হক সংক্ষিপ্তভাবে চিঠির জওয়াব লেখেন: "আমি আপনার এ পত্র গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছি। আমার মন ও প্রাণ দিয়ে সকল শর্তাবলী গ্রহণ করলাম।"[১০]

আইয়ুব খানের শাসনামল ও মাওলানা আতাহার আলী:

পাকিস্তানের তৎকালীন নানা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে সেনাপ্রধান আইয়ুব খান হঠাৎ ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ খ্রী. পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করে সকল রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। ১৯৫৬ খ্রী. এর সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করেন। সামরিক শাসনের দুঃসময়ে তিনি ইসলাম তথা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনায় সাংগঠনিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা জোরদার করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি ইসলামের খিদমত করতে পিছিয়ে ছিলেন না। এভাবে তিনি আইয়ুব খানের ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতিরোধের জন্য ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন দেন এবং পরবর্তীতে ইয়াহইয়া খানের সামরিক শাসনামলেও তিনি ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনায় মুখর ছিলেন। তিনি নেজামে ইসলাম ও জমিয়তে ইসলামের পক্ষ থেকে দুই পাকিস্তানের উন্নয়ন ও শিক্ষা সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন।[১১] পাকিস্তানী শাসকদের জবরদস্তীমূলক রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণে দু'পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যায়।

শেষ জীবন ও মোমেনশাহী জামি'আ ইসলামীয়া :

১৯৭১ খ্রী. থেকে ১৯৭৩ খ্রী. পর্যন্ত তিনি জেলখানায় বন্দী জীবন কাটান। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কারা মুক্তির পর তিনি হজ্জে বায়তুল্লাহ'র উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। শহিদী মসজিদ ও জামি'আ এমদাদিয়া থেকে বিদায়, তাকে খুবই কষ্ট দিয়েছিল। পরে তিনি সেই কষ্টকে শক্তিতে পরিণত করে জামি'আ ইসলামীয়ায় পদার্পণ করেন। তাঁর স্বভাবসুলভ কার্যক্রম দ্বারা তিনি দ্রুত এ মাদরাসার উন্নতিতে নতুন অধ্যায় সূচনা করেন। নেহায়েত কম সময়েই একটি ছোট আকারের মাদরাসাকে বিশ্ববিদ্যালয় মানের জামি'আয় রূপান্তর করেন। ১৯৭৬ খ্রী. পর্যন্ত তিনি এখানেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে একান্তে মিশে থাকেন। জ্ঞানের অগ্নিমশাল ও জাতির উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য এই মনীষী ১৯৭৬ খ্রী. ৬ অক্টোবর আল্লাহর ডাকে সাড়ি জমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। ইসলামের প্রকৃত মুজাহিদ বাংলার অগণিত মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র মাওলানার অবদান এ জাতি শ্রদ্ধা ভরে চিরদিন স্মরণ করবে।

তথ্য নির্দেশ

১. মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী, হায়াতে আতহার, কুতুবখানা মাজহারী, করাচী (তা.বি.),পৃ. ৩৭

২. প্রফেসর আহম্মদ সাঈদ, বজমে আশরাফ কি চেরাগ, দারুল কিতাব, দেওবন্দ (ভারত-১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ৩২৪

৩. হাফেজ মোহাম্মদ আকবর শাহ বুখারী, কাওয়ানে থানবী, মাকতুবাতুল এমদাদিয়া, সাহারানপুর (ভারত-১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ২৬১

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

৫. মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮-৫৩

৬. ঐ, পৃ. ৫৩

৭. খাইরুল কুরুণ: রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাল থেকে খোলাফায়ে রাশিদার সময়কাল পর্যন্ত সময়কালকে খাইরুল কুরুন বলে আখ্যায়িত করা হয়। কুরুণ যুগ/শতাব্দী বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

৮. **মুফতী মোহাম্মদ শফি:** তিনি ১৯৯৭ খ্রী. সাহারানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ইয়াছিন (র.)। তিনি রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (র)-এর শিষ্য ছিলেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমীরি, শাব্বীর আহমদ উসমানী, আসগর হোসাইন, মাওলানা ইব্রাহিম প্রমুখ' আলিমগণের নিকট অধ্যয়ন করেন। দারুল 'উলুম দেওবন্দের তিনি অন্যতম ছাত্র। ১৯২০ খ্রী. ১৯৪৬ খ্রী. পর্যন্ত তিনি এখানে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩২ খ্রী. তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে প্রধান মুফতী নিযুক্ত হন। ১৯১৯ খ্রী. মুফতী সাহেব এর খিলাফত লাভ করেন। সুবিশাল তাফসীর মারিফুল কুরআন তাঁর অন্যতম তাফসীর গ্রন্থ। এছাড়া তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৭৬ খ্রী. মোতাবেক মাওলানা মোঃ কজলুর রহমান আশরাফী , 'মুসলিম মণীষীদের কথা' (ঢাকা-১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ১০৮-১১২

৯. ঘোষণা পত্র , জাতীয় কাউন্সিল ১৯৫০ খ্রী. অনুযায়ী।

১০. ১৬-২-১৯৫৫ খ্রী. তিনি পত্রের জওয়াবে এর উল্লেখ করেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

১১. ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাচনী ইস্তিহার দ্র.।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ (র.)

(১৮৬৯-১৯৬৮)

মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমাধীন হাকিমপুর গ্রামের বিখ্যাত খাঁ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ আগস্ট ঢাকায় ইনতিকাল করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা হাজী আবদুল বারী খাঁ গাজী। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১০/১২ বছর বয়সেই মাওলানা আবদুল বারী সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী ঘোষিত শিখ ও ইংরেজ-বিরোধী জিহাদে যোগদান করার উদ্দেশ্যে সীমান্তে গমণ করেছিলেন। খাঁ বংশের উর্ধ্বতন পুরুষরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। জানা যায়, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ একই বংশোদ্ভুত।

বাল্যকালেই মাওলানা আকরম খাঁ পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পড়ায় বিভিন্ন অভাব, উপেক্ষা ও ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হন। তিনি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা মাদরাসা থেকে এফ এম পরীক্ষা পাস করেন। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে মাদরাসায় সামান্যতম ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা থাকলেও বাংলা লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ইংরেজী-বাংলা জানতেন না। কিন্তু চেষ্টা থাকলে একজন লোক ভাষা জ্ঞানের কোথায় উপনীত হতে পারে মাওলানা আকরম খাঁ তার বড় প্রমাণ। তিনি চেষ্টা-সাধনা দ্বারা ইংরেজীতে ভাল জ্ঞানার্জন করেন এবং বাংলা ভাষায় ঐতিহ্যবাহী আযাদ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হওয়া ছাড়াও বাংলা ভাষায় সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আরবী, ফারসী ও উর্দুতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি ফারসীতেও কবিতা লিখতেন। স্টিন সাহেব কলকাতা মাদরাসার অধ্যক্ষ থাকাকালে এক সভায় আকরম খাঁ স্বরচিত একটি ফারসী কবিতা আবৃত্তি করে উপস্থিত আলিমদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।[১]

মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদকরূপেই মাওলানা আকরম খাঁ কর্মজীবনের সূচনা ঘটে (১৯১০ খ্রীস্টাব্দ)। এ পত্রিকায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে ইজতিহাদ করার চেষ্টা করেন। মুজাহিদসুলভ মনোবৃত্তি মাওলানাকে কুরআন-হাদীস ও আরবী ভাষা-সাহিত্য চর্চায় আজীবন নিমগ্ন রাখে। তাঁর যুক্তিবাদী ইজতিহাদের জন্যে কেউ কেউ তাঁকে মুতাজিলী ভাবাপন্ন বলতেন।

৪৭-এর আযাদী আন্দোলনে মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান অপরিসীম। মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আকরাম খাঁ তখন তার সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আযাদের মাধ্যমে জনগণকে আযাদী পাগল করে তোলেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা তিনি ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুরাগ সৃষ্টি করেন। মূলত এজন্যেই বলা হয় যে, মাওলানা আকরাম খাঁ ও তাঁর আজাদ পত্রিকা না থাকলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান হতো না আর পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না। ফলে পশ্চিম বাংলার মতো ভারতের অধীন থাকতে হতো। আজ যাঁরা কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরম খাঁর আদর্শকে বক্র দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁদের হয়তো একজনও বাদ পড়বেন না, যারা আযাদী আন্দোলনের বীর সিপাহী এই মাওলানা সাংবাদিকের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ঋণী নন।[২]

উপমহাদেশের, বিশেষ করে, বাংলার মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ চিন্তা মাওলানা আকরম খাঁর মন-মস্তিককে আচ্ছন্ন করে রাখত। তাঁর কর্মবহুল জীবনই এর জলন্ত সাক্ষী। দেশবাসীর সার্বিক কল্যাণের জন্যে তিনি স্বাধীনতাকে প্রথম ও প্রধান শর্ত গণ্য করেছিলেন। এজন্যেই তিনি পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার জন্যে আপোসহীন ছিলেন। শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় সকল দিক থেকে অনগ্রসর মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তায় ঐ সময় অনেকে এগিয়ে এসেছেন বটে কিন্তু জাতীয় জাগরণ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান সর্বোচ্চ। কেননা, তাঁর দ্বারাই বাংলার ঘরে ঘরে আযাদী পাগল মানুষের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের বাণী পৌঁছেছিল অধিক। তাঁর নির্ভীক ভূমিকার ফলে তিনি ইংরেজদের রোষ দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের "আরবের খেজুর গাছের তল থেকে আগত" বলে ভারত থেকে তাদের সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এর অনুকূলে বহু অযুক্তির অবতারণা করে তারাই ভারতের একচ্ছত্র মালিক বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতেন। মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাদের যাবতীয় কূটযুক্তির জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতেন। মাওলানা সাহেব খিলাফত, অসহযোগ আন্দোলনসহ এ দেশের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গেই সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। মুসলমান প্রজাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্যে তিনি 'বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেছিলেন। হতাশ মুসলমানদের মধ্যে আত্মজাগরণ সৃষ্টি করতে হলে তাদের চিন্তার দুয়ারের কড়া প্রথম নাড়া দিতে হবে। এজন্যেই তিনি লেখনীর অস্ত্রকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন এবং প্রথমে 'সেবক', 'আল-ইসলাম' ও উর্দু দৈনিক 'জামানা' পত্রিকা বের করেন। সেবক পত্রিকায় 'অগ্রসর! অগ্রসর!!' শিরোনামায় উত্তেজনাপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখায় তাঁকে গ্রেফতার হতে হয় এবং পত্রিকার জামানত তলব করা হয়। মাওলানা আকরাম খাঁ কলমের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা-বাগ্মিতায়ও অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ অনলবর্ষী বক্তৃতা শ্রোতাদের অন্তরে সহজেই প্রভাব বিস্তার করতো। তিনিও অন্যদের মত সর্বপ্রথম কংগ্রেসের শক্তিকে অধিক জোরদার করেছিলেন। মূলতঃ ঐ সময়ই হিন্দু নেতাদের মুসলিম-স্বার্থ-বিরোধী মানসিকতার সঙ্গে তাঁর সঠিক পরিচয় ঘটে। বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের ভিতর দিয়েই মাওলানা আকরম খাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়।[৩]

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে তিনি যোগদান করেছিলেন। ঐ অধিবেশনই প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন মাওলানা হাসরাৎ মোহানী। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে মাওলানা হাসরাৎ মোহানী ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীর বিরোধিতায় তাঁর সে দাবী নাকচ হয়ে যায়। কেননা কংগ্রেস তখন পর্যন্ত ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। অবশ্য মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগের অধিবেশনে গৃহীত হওয়ার পরবর্তীকালে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হয়।[৪]

মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগে যোগদান করে এর সাংগঠনিক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তিনি সভাপতি ছিলেন। অপরদিকে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আযাদীর পরও তিনি দীর্ঘদিন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। মাওলানা আকরাম খাঁ অবিভক্ত পাকিস্তান গণপরিষদ ও তালীমাতে ইসলামিয়া বোর্ডের সদস্য ছিলেন। আইয়ুব সরকারের আমলে তিনি ছিলেন ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে এই সংগ্রামী নেতা সক্রিয় রাজনীতি হতে দূরে সরে এলেও তাঁর কলমের সংগ্রাম আযাদ পত্রিকা মারফত অব্যাহত থাকে। এই বৃদ্ধ সংগ্রামী নেতা আইয়ুব আমলে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধের প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিলে নেমে তাঁর প্রতিবাদ করেছিলেন। সাবেক পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে বার্ধক্যের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি জীবনের চরম অবস্থায় পৌঁছেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা কায়েদে আযমকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব নেওয়ার সময় থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আযাদী সংগ্রামের এক নির্ভীক সৈনিক ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ। তিনি ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এসময় তিনি মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ চেষ্টা করেন।[৫]

'বন্দে মাতরম' ও মাওলানা আকরম খাঁ:

মুসলিম জাতীয়তাবোধের বিকাশ দানে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মাওলানা আকরম খাঁ যে বিরাট কাজ করেছেন তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে তা সহজে অনুমেয়। কেননা জাতীয়তাবোধ তীব্রতর হওয়ার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী জোরদার হয়েছিল। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, ব্যাঙ্গল প্যাক্ট ইত্যাদির ভিতর দিয়ে মুসলমানদের ব্যাপারে হিন্দু নেতাদের বিরূপ মনোভাবের দরুন মুসলমানদের জাতীয়তাবোধ অনেক বৃদ্ধি পায়। তবে তা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত ও 'শ্রীপদ্ম' প্রতীককে কেন্দ্র করে। কংগ্রেস রাজনীতি ক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম' কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর রচয়িতা ছিল বিখ্যাত মুসলিম বিদ্বেষী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মুসলিম-বিদ্বেষে পূর্ণ তাঁর গ্রন্থ 'আনন্দ মঠে' এ সঙ্গীতটি রয়েছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানকারী একদল মস্তানের মুখে এ সঙ্গীতটি গাওয়ানো হয়েছিল। এছাড়া এটি দুর্গাদেবীর প্রশস্তি হিসাবে রচিত হয়েছিল। লা-শারীক এক আল্লাহতে বিশ্বাসী কোন মুসলমান একে কিছুতেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে মেনে নিতে পারে না। দলমত নির্বিশেষ সকল মুসলমান এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল। কংগ্রেসীরা তবুও একে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবেই রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রইলেন। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিবাদ তীব্রতর হয়ে উঠলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মীমাংসায় এগিয়ে আসেন। তিনি বললেন, প্রথম চার লাইনকে দুর্গার বন্দনা হিসেবে গ্রহণ না করে

Dhaka University Institutional Repository

দেশমাতৃকার বন্দনা হিসেবে গ্রহণ করা চলে এবং ঐ টুকু জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এ পরামর্শ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেও মুসলমানরা মানতে রাজী হলেন না। তারা জানালেন, বন্দনা ও পূজা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া মুসলমানরা আর কারুর করতে পারে না। তাছাড়া এর রচনার পটভূমি ও এর সঙ্গে মুসলিম বিদ্বেষের যে যোগ রয়েছে, মুসলমানরা তা ভুলে যেতে পারে না। এটা হিন্দুদের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারলেও মুসলমানদের কিছুতেই হতে পারে না।[৬]

'বন্দে মাতরম' ও 'শ্রীপদ্ম' কে কেন্দ্র করে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীপদ্ম অঙ্কিত মনোগ্রামকে পাঠ্যপুস্তক ও কাগজপত্রে প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। মাওলানা আকরম খাঁর পত্রিকা মোহাম্মদীতে শ্রীপদ্ম মনোগ্রাম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মুসলমান ছাত্রেরা যুক্তি দিল, 'শ্রী হিন্দুদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী' 'স্বরস্বতী' এবং 'পদ্ম'কে তার আসন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পৌত্তলিক ভাবধারার মনোগ্রাম মুসলমানদের প্রতীক হতে পারে না। মাওলানা আকরম খাঁ 'বন্দে মাতরম' ও শ্রীপদ্মের সপক্ষে আনীত যুক্তিসমূহ সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদীতে ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করতেন। এ আন্দোলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামী 'শ্রী' বাদ হয়ে শুধু 'পদ্ম' থাকে। পদ্মকে বাংলাদেশের একটি ফুল হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এতে মুসলমান ছাত্ররা অনেকটা দমে যায়। 'শ্রীপদ্ম' ও 'বন্দে মাতরমে'র আন্দোলনের ফলে মুসলমানরা দীর্ঘ দিন থেকে নামের পূর্বে যে 'শ্রী' ব্যবহার করত, তা পরিত্যক্ত হয়। মুসলমানদের নামের পূর্বে 'জনাব' ও 'মৌলভী' ব্যবহারও তখন থেকেই বৃদ্ধি পায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম চেতনাবিরোধী আরও বহু ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অবিভক্ত পাকিস্তানকে একটি খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠাই তাঁর স্বপ্ন ছিল। এজন্যে পূর্ব থেকেই তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌছার চেষ্টা করেন।

বলাবাহুল্য, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি অনাসক্ত এদেশের আলেম সমাজের ও সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে লেখা ও সাংবাদিকতার প্রেরণা মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুনশী মেহেরুল্লাহ, ফুরফুরার পীর সাহেব, মাওলানা রুহুল আমীন প্রমুখ আলিমই অধিক সৃষ্টি করেন। এভাবে ত্রিমুখী-চৌমুখী আন্দোলনেই ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা আসে।

তথ্য নির্দেশ

১. মাওলানা আব্দুস সাত্তার, তারিখে মাদরাসা-ই-আলিয়া, পৃ. ১৭৭
২. যফর আহমদ উসমানী, পৃ. ৭৮
৩. ঐ, পৃ. ৮১-৮২
৪. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৩
৫. ঐ, পৃ. ৮৪
৬. ঐ, পৃ. ৮৫
৭. আবুল কালাম সামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
৮. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৯. আবুল কালাম সামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মেহেরুল্লা

ভিন্ন ধর্মী আক্রমন থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করার মধ্যেই মেহেরুল্লাহর কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে তাঁর কাম্য ছিল সমাজসহ উভয় ক্ষেত্রের সংস্কার। তাই শুধু ধর্মপ্রচারক হিসেবে বিচার করে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পর্যালোচনা করলে এ সত্য স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। মেহেরুল্লাহর একজন জীবনীকার আসির উদ্দীন প্রধান একটি সভা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সভার প্রথম দিন ২/৩ সহস্র ও দ্বিতীয় দিন ৩/৪ সহস্রের উপর লোক সিমজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্যকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মক্তব-মাদ্রাসা-স্কুল স্থাপন, শিল্প শিক্ষা, ঘর্মগত প্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভাসমিতির উপকারিতা, বায়তুল মাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোষ স্বজাতি আন্দোল ইত্যাদি বিষয় রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।[১]

উদ্বৃতি থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু আলিমের মতো মুন্সী মেহেরুল্লাহ মানুষকে কেবল পারলৌকিক মুক্তির কথা বলেন নি, বরং একটি সুখী-সমৃদ্ধ পার্থিব জীবন গঠনের প্রতিও তাঁর সমধিক দৃষ্টি ছিল। জগতকে তিনি মায়া বলে উড়িয়ে দেননি। তাই তো ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও ভাবতে পেরেছিলেন তিনি। জীবনীকার শেখ হবিবুর রহমান ও জানিয়েছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলনের জন্যে, উন্নত প্রণালীতে কৃষি কাজ বিস্ত ারের জন্যে, এমনকি মিঠাই-এর দোকান, পানের বরজ করার মতো তথাকথিত 'ছোট' কাজেও দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজকে বারবার তিনি আহবান জানিয়েছেন এবং তা একেবারে বৃথা যায়নি।[২] এই ধরনের সজাগ অনুভূতির পরিচয় বর্তমানেই বা কতটুকু পাই আমরা? মুন্সী মেহেরুল্লাহ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শকে সমর্থন করেননি কখনো। কিন্তু তাই বলে ইংরেজী শিক্ষার বিরোধীতা তিনি ছিলেন না। তার পরিচয় পাওয়া যায় নিজ গ্রামের কিছু দূরবর্তী মনোহরপুরে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ে কারামতিয়ার সঙ্গে মধ্য ইংরেজী স্কুল সংযোজনের ঘটনা থেকে।[৩]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ সমাজ সচেতনতার ভিন্ন একটি পরিচয় পাওয়া যায় তার 'বিধবা গজনা' নামের কবিতা ও পুস্তক থেকে। সমকালীন সমাজে নারীর মূল্য, বিধবা রমণীর সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা পুস্তক থেকে। সমকালীন সমাজে নারীর মূল্য,বিধবা রমণীর সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে এ বইটি থেকে। বিধবার বিবিধ মর্ম যন্ত্রণা তিনি যতদূর অবগত হতে পেরেছিলেন, তা-ই অতি সহজ ও সাধারণ ভাষায় কাব্যকারে তুলে ধরেছিলেন তাঁর এই জনপ্রিয় পুস্তকে। এত তিনি আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে হিন্দু বিধবার পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক দুর্বাবস্থার বর্ণনা করেছেন। বিধবা বিয়ের সমর্থনে বাস্তব যুক্তি প্রয়োগ করে বিরোধী পক্ষের কাছে আশা প্রকাশ করেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

"যদি ইহার দ্বারা একজন বিধবা বিবাহ বিদ্বেষীরও সেই প্রস্তরঃ নিরসচিত্ত ক্ষণকাল দোলায়মান ও চঞ্চলিত হয়, তা হইলে আমার শ্রম সফল হইবে সন্দেহ নাই।" সমাজে বিধবা বিয়ে প্রচলিত না থাকায় কেবল হিন্দু সমাজ ও হিন্দু রমণীই পিষ্ট হয়নি, সে বিষে জর্জরিত হয়েছে মুসলিম সামজও, বিশেষ করে তথাকথিত শরিফ সম্প্রদায়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ সেদিকেও দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তীব্র ভাষায় তিনি বিধবা বিয়ে-বিরোধী সমাজনেতাদের আক্রমণ করেছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। জীবনীকার জানাচ্ছেন, "মুন্সী সাহবের বিশেষ প্রচেষ্টায় এবং 'বিধবা গঞ্জনা' পুস্তকের প্রভাব সমাজ বহু স্থানে বিধবা বিবাহের প্রচলন হইয়াছেন।"[৪]

মুন্সী মেহেরুল্লাহর সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল মুসলমান সমাজকে একটি অবশ্যম্ভাবী ভাঙ্গনের হাত থেকে বাঁচানোর তাগিদে। সেই কর্ম-প্রেরণায় আজীবন তিনি দেশের সর্বত্র বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন, সাংগঠনিক কর্মে লিপ্ত থেকেছেন, তারই ঐকান্তিক প্রয়োজনে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যে উদ্দেশ্য তিনি নিজে যেমন সমিতি গঠন করেছেন তেমনি মুসলিম হিতৈষী অন্য সমিতির সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে যথাসাধ্য কাজ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রযত্নে যশোর শহরে গঠিত হয় 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা আঞ্জুমান।[৫] এ ছাড়া তিনি আঞ্জুমানে নুরুল ইসলাম প্রচার সমিতি প্রভৃতি সংগঠনের ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রাগুক্ত সুধাকর দল প্রকাশিত 'সুধাকর' মিহির ও সুধাকর', ' সোলতান' প্রভৃতি পত্রিকার জন্যে তাঁর জনসংযোগের সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশের নানা স্থান থেকে গ্রাহক সংগ্রহ করে দিতেন।

জীবন্নোয়নের জন্যে শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি মুন্সী মেহেরুল্লাহ তা নিজের জীবন থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্যে আমরা দেখি ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে নিজে চেষ্টা করেছেন ও মুসলিম সমাজকে আহবান জানাচ্ছেন। দেশের নান স্থানে বক্তৃতায় যে অর্থ তিনি পেতেন তা আমপরায়ণ মানুষের মতো জমিয়ে রাখেনি, তা ব্যয় করেছেন শিক্ষা প্রসারে, শিক্ষার্থীর ভরণপোষণে, আর্থিক অস্বচ্ছল লেখকের পুস্তক প্রকাশেও অতিথি আপ্যায়নে। নিজ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়ার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতেন, অনেক ছাত্রকে নিজের বাড়ীতে জায়গীর দিতেন। নিজে তিনি ইংরেজী তেমন জানতেন না, কিন্তু এর গুরুত্ব বুঝতেন। তাই মাদ্রাসার সঙ্গে মধ্যে ইংরেজী স্কুল যুক্ত করেন। এখানকার ছাত্ররা যাতে ভবিষ্যত জীবনে যথার্থ কাজের লোক হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে তিনি যত্নশীল ছিলেন।[৬]

এ ছাড়া সাহিত্যে সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর সমকালীন মুসলিম সাহিত্যেসেবীদের উৎসাহিত করেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছেন। এ জন্যে নিজ অর্থ ব্যয় কবতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯০১ খ্রী.) 'অলন প্রবাহ', শেখ ফজলুল করিমের (১৮৮২-১৯৩৬ খ্রী.) 'পরিত্রণ কাব্য', শেখ জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত তাঁরই অর্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অকালে পিতৃহীন দরিদ্র মুন্সী মেহেরুল্লাহ এমনিভাবে কেবল অমিত উদ্যম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অসাধারণ বাগ্মিতার সাহায্যে মিশনারীদের সম্মুখীন হয়ে মুসলমান সমাজ সমূহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাই স্বাভাবিকভাবেই অভিহিত হয়েছেন 'মুসলিম বাংলার রামমোহন' হিসাবে।[৭] তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন মুসলিম সমাজের তখন নিতান্ত দুর্দশা। এই দুর্দশা থেকে সমাজের মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। শেখ ফজলুল করিম লিখেছেন, "নিজের সমাজের দুঃখ কাহিনী বর্ণনার সময় তাঁহার (মুন্সী মেহেরুল্লাহ) বাণী অগ্নিময় তীরের মত সমঝদার শ্রোতার মর্ম্মস্থলে গিয়া বিধিত। এ জন্য কত মানুষকে সভাক্ষেত্রে হা হা রবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। বাস্তবিক তিনি আসিয়াছিলেন অনেক অকল্যাণের অবসান ঘটাইতে। কাজেই তাঁহার বাক্যেও এমন তেজ ছিল, যাহা মুসলমান সমাজের বহু কালের জড়তাকে ভাঙ্গিয়াছে, তাহাদের চেতনা ফিরাইয়াছে; বাঙলা আত্মবিস্মৃত মুসলমান আত্মোপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নব নব প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হইয়াছে; এক কথায় সমাজ জাগিয়েছে।..... বলিতে কি, এই নিঃস্বার্থ লোকটি একা সমাজের যতখানি কাজ করিয়া গিয়েছেন, ততখানি কাজ করিবার মত কর্ম্মবীরের আজিও অভাব আছে।[৮]

বাঙ্গালী মুসলমানের তমসাচ্ছন্ন জীবনকে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ও সামর্থ দিয়ে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, যেভাবে বাস্তব-সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, যে অবশ্যম্ভাবী ভাঙ্গনের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, সে জন্যে তিনি আমাদের সামাজিক ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

==========

তথ্য নির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ.৭৭

২. শেখ হাবিবুর রহমান, সাহিত্যরত্ন, কর্ম্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪৩, পৃ. ১৫

৩. ঐ, পৃ.১৭

৪. ৪. ঐ, পৃ. ৩৭

৫. পরিশিষ্ট, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩৮০

৬. উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীন, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ১৫-১৬

৭. উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আবূ তালিব, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহঃ দেশ কাল সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ৫৯

৮. ঐ, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ

(১৯০০ –১৯৭৪)

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিশাল ভূভাগে যে কয়জন বিশিষ্ট আলেম ও খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটেছে, ঢাকা তথা গোটা বাংলার কৃতি সন্তান আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলামী শাস্ত্রে অসাধারণ পান্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়চেতা এই মনীষী শিক্ষা জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে আমরণ ইসলামের সেবায় নানাভাবে জড়িত ছিলেন। একজন বাগ্মী ও যুক্তিবাদী মোফাসসির-এ কোরআন হিসেবে সর্বপ্রথম তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি একাধারে মোফাসসির, মোহাদ্দস ও অনলবর্শী বক্তা ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। রাজধানী ঢাকায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর আলাদা প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

বংশ পরিচয় ও জন্ম ঃ

তিনি ১৯০০ খ্রী. জানুয়ারী মাসে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণের আদি অধিবাস ছিল সীমান্ত প্রদেশের বাজুড় এলাকায়। তাঁর পিতা নুরুল্লাহ খাঁ বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। মনিপুরের যুদ্ধ উপলক্ষ্যে নুরুল্লাহ খাঁ বাংলাদেশে আগমন করেন এবং চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ঢাকাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।[১] ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি মোমেন শাহীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। সেই ঘরেই মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁ এবং তাঁর জেষ্ঠ্য ভ্রাতা জনাব হাজী নূর মোহাম্মদ খাঁ ও এক বোন জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাদীক্ষা ঃ

রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মসজিদ চকবাজারের জামে মসজিদ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভেরও সুযোগ ছিল। মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ উক্ত চকবাজার মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসাতেই সেখানে অবস্থানরত মওলানা ইবরাহীম পেশোয়ারীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চস্তরের কিতাবাদি পড়াশোনা করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান গমন করেন এবং ১৯১৫ খ্রী. উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা প্রশিক্ষণের পাদপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ দেওবন্দে ৫ বছর ধরে ফিকাহ, হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পান্ডিত্ব অর্জন করেন। এক পর্যায়ে তিনি সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা থেকে 'মোল্লা ফাজেলের' পরীক্ষায়ও অংশ নেন। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ বিশ্ববিখ্যাত দিল্লীর মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেবের হাদীস শিক্ষা কোর্সেও যোগদান করেছিলেন এবং দিল্লীর আমিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেছেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যায়নকালে প্রখ্যাত মোহাদ্দেস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর নিকটও হাদীস অধ্যায়ন করেন। হাদীস শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করার পর মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ ১৯২১ খ্রী, ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন ঃ

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ কর্মজীবন অর্ধ শতাব্দীকাল। এ বিস্তৃত সময়ের মধ্যে তিনি অধ্যাপনা, তাফসীরের মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষা আদর্শের বিস্তার ও সমাজ সেবার মধ্যে কাটিয়েছেন।

শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করে তিনি সর্বপ্রথম ঢাকার প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের প্রায় এক যুগকাল অতিবাহিত হয়। সাথে সাথে তিনি সর্বত্র একজন সুবক্তা হিসাবেও সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। ঢাকা শহরে সাধারণত উর্দুভাষারই প্রচলন অধিক ছিল বলে মুফতী সাহেব এখানকার সভা সমিতিতে প্রায় উর্দুতেই বক্তৃতা দিতেন। তাঁর উর্দু বক্তৃতা একজন দক্ষ উর্দু ভাষাভাষী বক্তার মতোই গতিশীল ও আকর্ষণীয় ছিল। সুদুর বার্মাতেও তিনি বক্তৃতা সফরে যেতেন। তিনি কয়েক বছরের শিক্ষকতার বিরতি দিয়ে বার্মায় ওয়াজ-নসীহত, কোরআন তাফসীর, রোশদ ও হেদায়েতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। বার্মা সফর তাঁর কর্মজীবনের এক নয়া দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। বার্মার ইসলাম প্রচারের মধ্য দিয়ে মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।[৩]

কার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন বান্দার হেদায়াতের ব্যবস্থা রেখেছেন, সেটা তিনিই জানেন। বার্মার পথহারা মানুষেরা বাংলা কৃতি সন্তান মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর ওসীলায় আল্লাহর পথে অনুসারী হবার সুযোগ পাবেন, এটা কেউ পূর্বে ভাবতেও পারেনি। কিন্তু আল্লাহপাক তাঁর এই প্রিয় বান্দা দ্বীনের হাদীর জন্য বার্মা যাবার উপলক্ষ করে দেন। বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলমানের কাছে অতি সুপরিচিত আওলাদ-এ-রাসূল মওলানা আবদুল করীম তখন সারা বাংলার বিভিন্ন সভাসমিত ও ধর্মীয় মাহফিলে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে আল্লাহর পতে আহবান জানাতেন। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর সাথে মাওলানা মাদানীর পরিচয় ঘটার পর উভয়ের মধ্যে অধিক হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ সাহেব মাদানী সাহেবের আরবী বক্তৃতাসমূহ বাংলায় তরজমা করে দিতেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজ পরিহার করে মুফতী সাহেব এখন মওলানা মাদানীর সাথেই ইসলামের তাবলীগে নিয়োজিত হয়ে পড়েন। ঠিক ঐ সময় মওলানা সাইয়েদ আব্দুল করীম মাদানী ইসলাম প্রচারের গরজে বার্মা সফরের সিদ্ধান নেন। সুতরাং ইসলামের উভয় খাদেম ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছেন।[৪] মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ সাহেব আগের মতোই মাওলানা আব্দুল করীম মাদানীর আরবী বক্তৃতা উর্দুতে তরজমা করে বার্মার জনসাধারণকে ইসলামের দিকে আহবান জানাতে লাগলেন। উল্লেখ্য যে, বার্মার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অধিবাসিই উর্দু ভাষা জানে। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর মওলানা মাদানী ও মুফতী সাহেবের কাজের ধরণ আলাদা হয়ে যায়। মুফতী সাহেব রেঙ্গুনের বাঙ্গালী জামে মসজিদের মুফতী ও খতিব নিযুক্ত হন এবং ঐ মসজিদকে কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

করে তাফসীর এবং ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ প্রচারে মনোনিবেশ করেন। বার্মার অধিবাসী মুসলমানরা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁর মতো একজন বিচক্ষণ আলেমকে পেয়ে অপরিসীম আনন্দিত হয়ে উঠলো। তারা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন সমস্যা ও মাসলা-মাসায়েলের সম্মুখীন হলে মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ সাহেবের নিকট এসেই তার ইসলামী সমাধান জেনে নিত। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলার গৌরব মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁনের সুনাম চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মুফতী সাহেব প্রায় বার বছর ধরে বার্মায় ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। এক পর্যায়ে তিনি পরিবার-পরিজন সব নিয়ে বার্মায় চলে যান।[৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ১৯৪১ খ্রী. মুফতী বার্মা থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ ১৯৪৬ খ্রী. প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বড় কাটারা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার সাথেও জড়িত ছিলেন। অতপর ১৯৫০ খ্রী. লালবাগ জামেয়া-এ-কোরানিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি সেখানে হাদীস ও তাফসীরের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মুফতী সাহেব লালবাগ মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি আমরণ এ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন।

==========

তথ্য নির্দেশ

১. এসরার আহমদ খান, মুফতী দীন মোহাম্মদ খান, এসিরায় রোড, ঢাকা, পৃ. ১-৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৫. ঐ, পৃ. ১৩

মাওলানা মাহমুদুল হাসান

(১৮৫১ – ১৯২০)

১২৬৮/১৮৫১ সালে ভারতের যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বেরেলী শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা যুলফিকার আলী। তিনি ছিলেন বেরেলীর শিক্ষা বিভাগের সরকারী ডেপুটি ইন্সপেক্টর। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁহার দক্ষতা ছিল অপরিসীম।

মাওলানা মাহমুদ হাসান শৈশবে মিয়াজী মঙ্গলূরীর নিকট কুরআন মাজীদ এবং মিয়াজী মাজীদ এবং মিয়াজী আবদুল লতিফ এর নিকট ফারসী ভাষার প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থসমূহ অধ্যায়ন করেন। অতঃপর তিনি ফারসী ভাষায় উচ্চ স্তরের গ্রন্থসমূহ তাঁর চাচা মাওলানা মাহতাব আলীর নিকট অধ্যায়ন করেন। যখন তিনি তাঁর পিতৃব্যের নিকট কুদূরী, তাহযীব প্রভৃতি কিতাব পড়িতে ছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল পনর বৎসর। মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদ হাসানই ছিলেন দারুল উলুম মাদরাসা-এর প্রথম শিক্ষার্থী।[১] দারুল উলুম দেওবান্দের সাদর মুদাররিস মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতাবীর নিকটও তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১২৮৬ হিজরী সনে তিনি মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতিবীর নিকট হাদীছ শাস্ত্রের সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর পিতা মাওলানা যুলফিকার আলীর নিকট 'আরবী সাহিত্য অধ্যায়ন করেন। তিনি ১২৮৯ সনে দারুল উলুম দেওবান্দ মাদরাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯শে যুল কা'দা ১২৯০ হিজরী তিনি দারুল উলুম দাস্তারবান্দী অনুষ্ঠানে দাস্তার ই ফাদীলাত ও তাকমীল এর সনদ লাভ করেন। পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাব করিয়া ১৩০৫ হিজরী সনে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষায়তনের সাদর মুদাররিস ও শায়খুল হাদীছ এর পদে অধিষ্ঠিত হন।[২] তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অত্যন্ত অগ্রগামী। যে কোন শাস্ত্রের যে কোন গ্রন্থ পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত তিনি সুদক্ষভাবে পড়াইতে পারিতেন। বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপানায় তিনি ছিলেন অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ভারত, মক্কা, মদীনা, মূসিল, বসরা বালখ, বুখারা, হিরাত, কান্দাহার, কাবুল, তুরস্ক প্রভৃতি এলাকার ছাত্রদের সংখ্যা ছিল তাঁর দারুসে মাওলানা মাহমুদুল হাসান সর্বধিক। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল তিনি দেওবন্দ দারুল উলূম মাদরাসায় হাদীছ এর অধ্যাপনা করেন। এতদ্ব্যতীত মক্কা এবং মদীনায়ও তিনি হাদীসের পাঠ দান করেন। খ্যাতনামা বহু 'আলিম তাঁর শাগরিদ ছিলেন। তন্মধ্যে শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদান, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরফ আলী থানভী, মাওলানা আনওয়ার শাহি কাশ্মীরী, মুফতী ইজায আলী, শায়খুল হাদীছ মাওলানা ফাকরুদ্দীন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম বালয়াবী প্রমুখ মনীষীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩]

গানী মুহাদ্দিছ-এর নিকট হতে হাদীছের ইজাযাত লাভ করেন এবং মক্কায় অবস্থানরত হাজী মানুতাবীর ইরশাদ-এর বায়আত গ্রহণ করেন খিলাফত লাভ করেন। তদুপরি ১২৯৭ হিজরী সনে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানূতাবীর ইন্তেকালের পর মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর হতেও বায়'আত গ্রহণ করেন এবং খিদমাতে অবস্থান করেন তরীকাতের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। পাঠদানের সময়ের পর অবশিষ্ট সময় তিনি যিকর ও মুরাকবায় রত থাকিতেন। মাওলানা গাঙ্গুহীও তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন।[৪]

পরবর্তী জীবনে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক আন্দোলন সংগঠন করার মনস্থ করেন এবং ১৩২৭/১৯০৯ সালে দারুল উলুম দেওবান্দের সকল পুরাতন ছাত্রদিগকে দারুল উলুম মাদরাসার দস্তরবান্দী অনুষ্ঠানে আহবান করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্র অংশগ্রহণ করে এবং তাহাদের সমন্বয়ে 'জামইয়াতুল আনসার' নামক একটি সংস্থা গঠিত হয়।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীর বৃহৎশক্তি ইংরেজ, ফ্রান্স ও রুশ সম্মিলিতভাবে একটি গোপন চুক্তি করিয়া তুরস্কের ইসলামী হুকুমাতকে চিরতরে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইটালী ত্রিপোলী আক্রমণ করে। ফ্রান্স মরক্কো ছিনাইয়া নেয়। বলকানের খৃস্টানগণ তুরস্কের উপর পুনঃপুন আক্রমণ চালাতে থাকে। এইরূপ সংকটময় মুহূর্তে শায়খুল হিন্দ দারুল উলুম দেওবান্দ মাদরাসা ১৫ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে তুরস্কের সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতের সর্বত্র প্রেরণ করেন। অপরদিকে শায়খুল হিন্দু ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইংরেজদের ক্ষমতা বিলোপ করবার মানসে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৬]

শায়খুল হিন্দু অত্যন্ত গোপনে সাংগঠনিক কাজ আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত শাগরিদ ও বন্ধু-বান্ধবকে তাঁর সংগঠনের সদস্য করেন এবং বিভিন্ন স্থানে গোপন কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকা হতে বিপ্লব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি হাজ্জী তুরঙ্গযায়ীর নেতৃত্বে ইয়াগিস্তান কেন্দ্র হতে ইংরেজদের উপর আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এতদসঙ্গে সারা ভারতের গোপনকেন্দ্রসমূহ হতে স্বাধীনতা যুদ্ধ তৎপরতা জোরদার করেন। অপরদিকে বহির্বিশ্বের সমর্থন ও সাহায্য লাভের জন্য তিনি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে ১৯১৫ খ্রী. হিজায গমণ করেন। হিজাযের গভর্ণর গালিব পাশা এবং মদীনায় আগত আনওয়ার পাশা ও জামাল পামার সহিত সাক্ষাত করে তিনি তুর্কী সরকারের পক্ষ হতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস পান। এই পরিপ্রেক্ষিতে গালিব পাশা স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত নির্দেশনামা ও সাহায্যের আশ্বাসবাণী ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ইহার গালিব নামাহ নামে অভিহিত। এই গালিব নামাহ মুদ্রণ করিয়া ইয়াগ স্থানের আযাদ মিশন-এর সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অতঃপর শায়খুল হিন্দ হিজাম হতে বাগদাদ ও বেলুচিস্তানের পতে ইয়াগিস্তানের আযাদ মিশণে পৌছিবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অপরদিকে মক্কার গর্ভনর শরীফ হুসায়ন তুর্কি খিলাফাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইংরেজদের সহিত আঁতাত গঠন করেন।[৭] ইংরেজদের ইঙ্গিত শায়খুল হিন্দ ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী, মাওলানা 'উযায়রগুল, হাকীম নুসরাত হুসায়ন এবং মাওলাবী ওয়াহীদ আমাদকে শারীফ হুসায়ন গ্রেফতার করেন। পক্ষান্তরে মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী গালিব নামাহপ্রাপ্ত হয়ে আফগানিস্তানের আমীর হাবীবুল্লাহ খানের সাথে আলোচনা করে কোন পথে কোন তারিখে এবং কিভাবে ভারত আক্রমনকরা হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আমীর হাবীবুল্লাহ খান ও তাঁর পুত্রত্রয় আমানুল্লাহ খান, নাসরুল্লাহ খান এবং ইনআয়তুল্লাহ খানের দস্তখতসহ উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ জনৈক পারদর্শী শিল্পীর সাহায্যে রেশমী রুমালে লিপিবদ্ধ করেন। হিজাযে শায়খুল হিন্দের নিকট প্রেরণ করার সময়ে পথিমধ্যে উহা ইংরেজদের হস্তগত হয়ে যায়। ইহাই রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র নামে অভিহিত। ফলে শায়খুল হিন্দের বৈপ্লবিক আন্দোলনের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। এই বিপ্লবের বিশদ তথ্য উদঘাটন ও এর মূলচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। ইহাই রাওলেট কমিটি। ১৯১৬ খ্রী. এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে, কিন্তু শায়খুল হিন্দের বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করতে তারা সক্ষম হইল না, বরং অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য পরিবেশন করিল। শায়খুল-হিন্দু ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দকে ইংরেজগণ মাল্টা প্রেরণ করে। তথায় তাঁর দিকে তিন বৎসর দুই

Dhaka University Institutional Repository

মাসকাল কারাবন্দি রাখার পর ৮ই জুন, ১৯২০ খ্রী. মুক্ত করে দেয়। সারা ভারতের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ তাঁহাদেরকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানায়। ভারতে আগমন করে মাওলানা খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। খিলাফত কমিটি তাঁকে 'শায়খুল-হিন্দু' উপাধিতে ভূষিত করে। ফলে উহা তাঁর নামের অংশ পরিণত হয়। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগের ফাতওয়া প্রদান করে। ইহাতে সারা দেশে এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এমনকি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতেও জনগণ উদ্যত হয়ে পড়ে। এই সময়ে অসুস্থ থাকলেও তিনি আলিগড়ে গমণ করে এবং ১৯শে অক্টোবর, ১৯২০ খ্রী. জামি আ মিল্লিয়্যা ইসলামিয়্যার উদ্বোধন করেন।[৮] উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, উহা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আরও অধিক অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য তিনি দিল্লীস্থ ডক্টর মুখতার আহমাদ আনসারীর বাসভবনে অবস্থান করেন। বিজ্ঞ হাকীম আজমাল খান ও হাকীম আব্দুর রাজ্জাক তাঁর চিকিৎসা করতে থাকেন। এই সময়ে ১৯,২০ ও ২১শে নভেম্বর, ১৯২০ খ্রী. জামাইয়্যাত-ই-উলামা হিন্দ এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতেও সভাপতিত্ব করেন। মোট কথা, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ, জাতি ও স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকেন। ৩০শে নভেম্বর ১৯২০ খ্রী. তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন দেশ দরদী এই মহাবীর আক্ষেপ করিয়া বলেছিলেন যে, অসি হস্তে বীর বেশে জিহাদের ময়দানে তিনি শাহাদাত বরণ করতে পারলেন না, শয্যাতেই মৃত্যুবরণ করতে হল। একটু পরে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় দিল্লীস্থ ডক্টর আহমাদ আনসারীর বাসগৃহে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং দেওবান্দে সমাধিস্থ হন।[৯]

সারা জীবন অধ্যাপনা ও রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও শায়খুল হিন্দু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। তাঁর কতিপয় স্মরণীয় রচনা ঃ (১) আল-আদিল্লাতুল কামিলা (২) ঈদাহল আদিল্লা (৩) আহসানুল কুয়া (৪) আল জুহদুল মুকিল্ল (৫) আল ইফাদাতুলমাহ মুদিয্যা (৬) আল আবওয়াব ওয়াত তারাজিম (৭) তাসবীহে আবী দাউদ (৮) কুল্লিয়্যাতই মায়খুল হিন্দ (৯) হাশিয়াই মুখতাসারুর মাআনী (১০) তার্জামাতুল কুরআনিল মাজীদ।

==========

তথ্য নির্দেশ

১. ইবন সাদ আত তাবাকাত, বৈরুত ১৯৬০, ১:২৩৯-৪৫,
২. সামহুদী, ওয়াফাউল ওয়াফা, মিসর, হিজরী ১৩২৬, ১ম ও ২য় খন্ড,
৩. মঈনুদ দীন আহমাদ নাদাবী, তারিখ ই ইসলাম, আজামগড়, হি. ১৩৬৭, ১ম খন্ড,
৪. শিবলী নুমানী, আল-ফারুক, মাত বা কাদীমী, দিল্লীঃ ২:৬৪ ৫;
৫. প্রাগুক্ত
৬. Hughes, Dictionary of Islam, New Delhi, 1978, PP. 343-46;
৭. মুসাতাফা মুমিন, কাসামাতুল আলামিল ইসলামিল মাআসির, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ. ১১-৫২,
৮. মানারুল ইলাম (পত্রিকা), আরব আমীরাত, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-১৯৭৯, পৃ. ৩৪-৫৮
৯. শেখ আব্দুর রহীম গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৫, পৃ. ১৭৪-৭৫; মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ. ৫৪৬-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী

(১৮৭৫ – ১৯৩৩)

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ছিলেন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, বিশিষ্ট সংস্কারক 'আলিম ও দারুল উলুম দেওবান্দ'-এর প্রধান শিক্ষক। তিনি ২৭ শাওয়াল ১২৯/২৬ নভেম্বর, ১৮৭৫ খ্রী. দুধূওয়াঁ (কাশ্মীরের লৌলার অঞ্চল)-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ-এর নিকট কুরআনুল কারীম ব্যতীত ফারসী ও আরবী প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ-এর খ্যাতির কথা শ্রবণ করে ১৩০৭-১৩০৮ হিজরী সনে ষোল কিংবা সতের বৎসর বয়সে তথায় গমণ করেন। তথায় তিনি চার বৎসর অবস্থান করে মাওলানা মাহমুদ হাসান (দ্রঃ), মাওলানা খালীল আহমাদ সাহারান পুরী ও অন্যান্য উস্তাতদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। আনুমানিক বিশ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সাথে সমাপনী সনদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি মাওলানা রাশীদ আহামদ গাংগুহী-এর নিকট বায়আত হন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীছ বর্ণনা করার সনদ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি দিল্লীতে হাকীম ওয়াসিল খান-এর নিকট ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করেন।[১]

তিনি দিল্লীর আমিনীয়া মাদরাসায় তিন কিংবা চারি বৎসর শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৩২৩/১৯০৫ সনে কাশ্মীরের কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তির সহিত হারামায়ন শারীফায়ন-এর যিয়ারত করেন। হিজায় সফরকালে তিনি শায়খ হুসায়ন জিসর তারাবলিসীর নিকট হইতে হাদীছ-এর সনদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি কয়েক বৎসর যাবত দেওয়ান্দে হাদীছের অধ্যাপনা করেন।[২]

হযরত শায়খুল হিন্দ-এর ইন্তিকালের পর শাহ সাহেব যথারীতি দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক থাকাকালে একদিকে বাংলা, বার্মা ও মালয়েশিয়া, অপরদিকে তুর্কিস্তান ও আফ্রিকা মহাদেশ হতে আগত ছাত্র দেওবন্দে তাঁর নিকট হতে হাদীছের শিক্ষা লাভ করে।[৩]

তিনি অক্টোবর ১৯২৭ খৃ. পেলাওয়ারে অনুষ্ঠিত জামইয়্যত-ই-উলামা ই হিনদ এর বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভাপতির ভাষণে সীমান্ত প্রদেশের ভৌগোলিক গুরুত্ব, ইংরেজদের অত্যাচার এবং স্বাধীন জাতিসমূহের প্রতিবন্ধকতার উপর আলোকপাত করেন। সীমান্ত প্রদেশের জন্য অন্যান্য প্রদেশের সমান সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং সুযোগ-সুবিধার দাবি জানান। উপরন্তু নিপীড়িত মুসলিম মহিলাদের ধর্মত্যাগের তদারক, কুপ্রথাসমূহের বিলোপ ও কন্যাদের জন্য পিতার সম্পত্তিতে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে শারীআত প্রদত্ত অধিকার ও পাওনা প্রদান করার আহবান জানালেন।[৪]

সভার পর দারুল-উলুম-এর ব্যবস্থাপক মন্ডলীর সাথে প্রদক্ষেপের ব্যাপারে যখন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমান, মাওলানা বাদরই 'আলাম মীরাঠী ও অন্য বহু 'আলিম ও কয়েক শত ছাত্রের একটি দলসহ তিনি জ্যামিআ ইসলামিয়া, চলে যান। সেখানে ১৩৫১/১৯৩১ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ বয়সে শাহ সাহেবের লক্ষ্য কাদিয়ানীদের বিরোধীতায় এবং তাদের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে ইসলাম প্রচার এবং লেখনি ও রচনার মাধ্যমে কাদিয়ানিদের মুকাবিলা করার আহবান জানান। আল্লামাঃ ইকবাল শাহ সাহেবের অনুপ্রেরণায় তাঁর (Islam and Ahmadism) গ্রন্থ রচনা করেন।[৫] (মুফতী মুহাম্মদ শাফী, কাদিয়ানী ফিতনা, হায়াতই আনওয়ার সঙ্কলকঃ মুহাম্মদ আযহার শাহ, পৃঃ ২৪৭-২৬৯, দিল্লী ১৯৫৫ খ্রী.)। ১৯৩৩ খ্রী. তিনি বাহাওয়ালগুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজের এজলাসে এমন এক ঐতিহাসিক বিবরণ পেশ করেন যাহা কাদিয়ানী মতবাদের উপর তথ্যবহুল পর্যালোচনা এবং কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার দাবি ও ভ্রান্ত ধারণাসমূহের বিরুদ্ধে এক অকাট্য দলীল হিসাবে বিবেচিত। তফসির ১৩৫২/২৯ মে, ১৯৩৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং দেওবান্দেই তাঁকে দাফন করা হয়।

জ্ঞান গরিমা ঃ

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর বর্ণনা মতে, "মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ দূরদৃষ্টি, অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তির অতুলনীয় ছিলেন। হাদীছের হাফিজ ও পর্যালোচক, আরবী সাহিত্যের উঁচুদরের পন্ডিত, যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী, আরবী কাব্যের বিশেষজ্ঞ এবং যুহদ ও তাকাওয়ায় অদ্বিতীয়"।[৬]

রাফতাগান, করাচী, পৃ. ১৪৬)। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ইছমানী 'আল্লামা ইকবাল 'ইলমের কোনও জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য তাঁর শরনাপন্ন হতেন।

শাহ সাহেবের খ্যাতিমান ছাত্রবৃন্দ ঃ

মাওলানা মানাজির আহসান গীলানী, মুফতী মুহাম্মদ শাফী, মুহাম্মদ ইদরীস কানধলাবী, বাদর-ই আলাম মীরাঠী, মুহাম্মাদ যুসুফ বিন্নুরী, মৌরানা কারী মাহুম্মদ তায়্যিব, হাবীবুর রহমান আজামী, সাঈদ আমাদ আকবার আবাদী ও মাহুম্মাদ চেরাগ।[৭]

রচনাবলী ঃ

শাহ সাহেব কুরআনুল কারীম, হাদীছ ও ইসলামী ফিকহ-এর কতক জটিল বিষয়, সম্পর্কীয় বিষায়াদি এবং সহীহ (মুহাম্মাদী) আকাইদ এর মুল উৎস ও মৌল নীতির উপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এইগুলি সবই আরবী ভাষায় রচিত। এতদ্ব্যতীত তাঁর হাদীছের পাঠদান সম্পর্কীয় বক্তৃতামালা এবং বিভিন্ন স্মৃতি ও ঘটনা তাঁর ছাত্রগণ সংকলণ করে প্রকাশ করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) মুযাকিলাতুল কুরআন (দিল্লী), কুরআনুল কারীম এর কতিপয় জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বলিত সমৃদ্ধতিপঞ্জীর সংকলন, যাহার প্রকাশকে মাওলানা যুসুফ বিন্নুরী। ইহার শুরুতে বিজ্ঞ সংকলকের একটি দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় উহাতে বিভিন্ন তাফসীর, উহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ এবং ইজাযুল বারী, সাহীহ

Dhaka University Institutional Repository

আল বুখারীর ভাষ্য (কায়রোর ১৯৩৮ খ্রী.) ইহা শাহ সাহেবের সহীহ বুখারীর দাস শ্রুতলিপি আকারের ভাষ্য, যাহা মাওলানা বাদরই আলাম মীরাঠী ও মাওলানা য়ুসুফ বিন্নুরী (র.) আরবী ভাষায় চারি খন্ডে কায়রো হতে প্রকাশ করেছেন। এই ভাষা গ্রন্থে কুরআন, হাদীছ, কালাম, ফলসাফা (দর্শন) ও অলংকার শাস্ত্র- এর আলোচনা করেছেন (৩) আনওয়ারুল মাহমুদ ফী শারহ সুনানি আবী দাউদ, সুনান আবী দাউদ-এর উপর পাঠদানের শ্রুতলিপি। ইহা মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দীক দুই খন্ডে সংকলন করে প্রকাশ করেছেন; (৪) আশরাফুল শাযী বি শারহি জামিইত-তিরমিযী, শাহ সাহেবের জামি তিরমিযীর উপর বক্তৃতার শ্রুতলিপি। ইহা মাওলানা মুহাম্মাদ চেরাগে (গুজরানওয়ালা) পাঠদানের সময় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (৫) আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি ঈসা আলায়হিস সালাম, এই গ্রন্থে মাসীহ 'আলায়হিস' সঅরামের জীবিত থাকার আকীদাঃ সম্পর্কে কুরআনুলকারীমের বর্ণিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যঅ সন্নিবেশিত হয়েছে (৬) তায়িয়্যাতুল ইলাম ফীর হায়তি ঈসা আলায়হিস সালাম ইহাতে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইসলামী আকীদার সংযোজন ও ব্যাখ্যা রয়েছে; (৭) আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযুলিল মাসীহ (বৈরুত সং), মাসীহ (আঃ)-এর অবতলেন সম্পর্কে হাদীছ ও সাহবায়ে কিরাম এর বাণীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকাশ করা হয়েছে। ইহা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী লিখিয়াছেন (৮) ইকফারুল মুলহিদীন দাররুরিয়াতিদ দীন, ১২৮ পৃষ্ঠার; ইহাতে কুফর ও ঈমানের হাকীকাত-এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে (৯) ফাসলুল-কিতাব ফী মাসআলাতি উম্মিল কিতাব, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সংক্রান্ত ভিন্ন মতামতের বিশদ বিবরণ। ইহাতে হানাফী দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করা হয়েচে (১০) নায়লুল ফারকাদীন ফী মাসআলাতি রাফইল য়াদায়ন(দিল্লী সং), ১৪৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই পুস্তকে সালাতের পূর্বে ও পরে হাত উত্তোলন সম্পর্কিত এই পুস্তকে সালাতের পূর্বে ও পরে হাত উত্তোলন সম্পর্কিত মাসআলার পুঙ্খনাপুংখ বিচার বিশ্লেষন করা হয়েছে (১১) দারুবুল খ্যাতাম আলাহু দুছিল আলাম (দিল্লী সং), আকাঈদ ও ফলসাফার বহুল বিতর্কিত বিষয় (বিশ্ব সৃষ্ট ও পতনশীল)-এর সপক্ষীয় দলীল প্রমাণগুলিকে চারি বছরের শেষের দিকে তিনি শিবলী নুমানীর পরামর্শে দাক্ষিণাত্যের পুনা কলেজে আরবী ও ফার্সীর অধ্যাপনা গ্রহণ করেন।[৮]

আল্লামা শিবলী নুমানী ১৯১৪ সালে ইন্তেকাল করলে সাইয়িদ সাহেব পুনার অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে আযমগড় চলে আসেন।[৯] মাওলানাদ মসউদ আলম নদভীর প্রশাসনিক সহযোগিতা এবং মাওলানা আব্দুস সালাম নদভীর সার্বিক সাহায্যের মাধ্যমে ১৯১৫ সালে সুলাইমান নদভী দারুল মুসান্নিফীন (লেখক সংঘ) এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আরদুল কুরআন' এর প্রথম খন্ড প্রকাশ করে দারুল মুসান্নিফীনের লেখা ও প্রকাশনার কাজ শুরু করেন। ১৯১৬ সালে তিনি দারুল মুসান্নিফীনের মুখপত্র হিসেবে মা'আলিফ প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহরের নেতৃত্বে খিলাফত কমিটির যে প্রতিনিধি দল বিলিতে গমন করেছিল, সুলাইমান নদভী সে ধর্মের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা মনোনীত হয়েছিলেন।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়িদ সাহেব ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করে বক্তৃতা দেন এবং সংবাদপত্র সমূহে নিবন্ধ লিখেন। ১৯২১ সালে আহমাদাবাদের গুজরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন।[১১]

১৯২৪ সালে সুলতান আব্দুল আযীয ইবনে সাউদ শরীফ হুসাইনকে পরাজিত করে হিজায অধিকার করলে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শরীআতের বিধান চালূ করার প্রচেষ্টা চালানো এবং ইবন সাউদ ও হুসাইনের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য খিলাফত কমিটি সাইয়দ সুলাইমান নদভীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল হিজায প্রেরণ করেন। তিনি দুমাস জিদ্দায় অবস্থান করে এ উদ্দেশ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়ন; কিন্তু শরীফ হুসাইন তনয় শরীফ আলীল জেদের কারনে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।১১ ১৯২৬ সালে সাইয়িদ সাহেব পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যে নিজ নেতৃত্বে খিলাফত কমিটির প্রতিনিধি দল নিয়ে হিজায গমণ করেন। উল্লেখ্য, আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং শুআইব কুরাইশীর মত ব্যক্তিত্ব ও এ প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তিনিএ সম্মেলনের সহ-সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১২]

১৯২৭ সালে তিনি দক্ষিণ ভারতে শিক্ষামূলক সফর করেন। ১৯৩৩ সালে আফগানিস্তানের বাদশাহ নাদির খানের আমন্ত্রণে ইকরাল ও স্যার রাস মসউদ সমভিব্যাহারে কাবুল গমন করেন এবং আফগানিস্তানের আরবী ও ধর্মীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে মূল্যমান পরামর্শ দেন। ১৯৩৮ সালে তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর হাতে বায়আত লাভ করেন এবং ১৯৪২ সালে সুলুকের মাকাম সমূহ অতিক্রম করে মুরশিদের পক্ষ হতে চার তরীকার খিলাফত লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ভুপালের প্রধান বিচারপতি (কাযূউল কুযাত) এবং জামিআ মাশরিকিয়ার আমীর নিযুক্ত হন। কিন্তু দারুল মুসান্নিফীন এবং নদওয়াতুল উলামার সাথে সম্পর্ক বিরাজমান ছিল।[১৩]

১৯৪৯ সালে তাঁর সহধর্মিণী ও সন্তান সালমানকে নিয়ে হজ্জে গমন করেন এবং হিজায পৌঁছিবার পর বাদশাহ সউদের অতিথি হন। হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর ভুপাল যান এবং সরকারী দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেওয়ার পর আযমগড় পৌঁছান। ১৯৫০ সালে আত্মীয়-স্বজনকে দেখার জন্য পাকিস্তান গমন করেন; কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যান।[১৪]

১৯৫৩ সালের শেষের দিকে সুলাইমান নদভী পাকিস্তান হিষ্টোরিক্যাল কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করার জন্য ঢাকা আগমন করেন। কনফারেন্স শেসে তিনি ভারতে গিয়ে আত্মীয়দের মাঝে কিছুদিন অবস্থান করেন। করাচী পৌঁছার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৪ই রবিউল আউয়াল, ১৩৭৩ হিজরী/২২ শে নভেম্বর ১৯৫৩ খ্রী. এর রজনীতে ইন্তে কাল করেন। পরবর্তী দিন করাচীর নিউ টাউন জামে মসজিদে তাঁর পীর ভাই ড. আব্দুল হাই তাঁর সালাতুল জানাযার ইমামতী করেন। জ্ঞান জগতের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ কল্যাণে তাঁর অবদানঃ

সাহিত্য কর্মঃ সাইয়িদ সুলাইমান নদভী সীরাত, ইতিহাস, জীবন চরিত, সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা ধর্মী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর বিশেষ অবদান হচ্ছে, তিনি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিষয় সমূহকে ও সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখা সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ, উপমা এবং রূপক অলঙ্কারে সমৃদ্ধ। সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর মতে সুলাইমান নদভীর স্টাইল ও রচনাশৈলীর মাঝে শিবলীর স্বত্ব প্রবৃত্ততা ও ফার্সী বাক্য গঠনের কলা কৌশল অনুপস্থিত বটে, কিন্তু ভাষার মাধুর্য স্বচ্ছতা এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য পুরোপুরিভাবে বিরাজমান। তাঁর রচনাবলী সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চমানের ভাষা উন্নত চিন্তা, জ্ঞানের পরিপক্কতা ও গভীরতা দ্বারা সমৃদ্ধ। তাঁর রচনাবলী নিম্নরূপঃ

(১) লুগাতে জাদীদাহ

(২) আরদুর কুরআন

(৩) সীরাতুন্নবী

(৪) সীরাতে আইশা

(৫) খুতবাতে মাদরাসা

(৬) হিন্দু ওয়া আরব কে তা'আল্লুকাত

(৭) আরবৌ কি জাহাযারানী

(৮) খাইয়াম

(৯) নুকুশে সুলামানী

(১০) রাহমাতে আলম

(১১) হায়াতে শিবলী

(১২) ইয়দে রাফতা গান

(১৩) সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর পত্রাবলীর তিনটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছেঃ

(ক) বারীদে ফারাঈ

(খ) মাকাতীবে সুলাইমান

(গ) মাকতুবাতে সুলাইমানী

শাহমুঈনুদ্দীন নদভী সুলাইমান নদভীর কাব্য চর্চাকে তিন পর্যায়ে ভাগ করেছেন-

(ক) তাঁর ছাত্রীজীবনের কাব্যচর্চা

(খ) তাঁর কাব্য চর্চার দ্বিতীয় পর্যায়

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সাইদি সাহেবের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের কাব্যচর্চা, প্রথম পর্যায়ের কাব্য চর্চা ছিল তার কাব্য অনুশীলন ও প্রশিক্ষনের সময়। এ সময় তিনি আমীর মীনাঈর অনুকরণ ও অনুসরণে গযল কিতাব রচনা করেছেন? আর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্য শুধুমাত্র 'গুল বুলবুল এবং "বিরহ মিলনের" কাহিনীর মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তার অনুপ্রেরণার মাঝে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা এবং চিন্তার চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়। তিনি নিজেও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্য চর্চাকে "রাসমী নাকল" প্রথাগত ও কৃত্রিম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৫]

তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের কবিতা সংখ্যাগত এবং মানগত উভয় দিক দিয়ে গুরুত্বের দাবীদার। এ কাব্যের সাহায্যে তিনি জ্ঞান জগতের সীমানা পেরিয়ে মারিফাত ও আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমন করেছেন এবং শবাব ও পান পাত্রের ছদ্মবরণে "আল্লাহ দর্শণ" লাভের কথা বলেছেন। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতা সম্ভারের শিরোনাম দিয়েছেন "গযলুল গায়যলাত"। এ সম্ভারে সর্বমোট ৩১৬টি কবিতা রয়েছে।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইকবাল সুলাইমান নদভীর গযলের প্রশসা করে তাঁর নিকট পত্র লিখেছেন।

==========

তথ্য নির্দেশ

১. বাদরে আলাম মীরাঠী, মুকাদ্দীঃ ফায়দুল বারী, কায়রো-১৯৩৮, পৃ. ১৭-২০।
২. মুহাম্মদ আজহার শাহ, হায়াত-ই-আনওয়ার, দিল্লী-১৯৫৫ খৃ. পৃ. ৪-৬
৩. মুহাম্মদ য়ুসুত বিন্নুরী, মুশকিলাতুল কুরআন, দিল্লী-১৩৫৭ হিজরী, করাচী, পৃ. ৩-৪
৪. আনজার শাহ মাসউদী, নাকশ-ই-দাওয়াম, দিল্লী-১৯৭৮ খৃ. পৃ. ২০২০-২৪৭
৫. মুফতী মোহাম্মদ শফী (র.), কাদিয়ানী ফিতনা, হায়াতে আনোয়ার, দিল্লী-১৯৫৫, পৃ. ২৪৭-২৬৯
৬. মুহাম্মদ আজহার শাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৭. আব্দুল হাই আল হাসানী, নুযহাতুল খাওয়াতির, ৮ম খন্ড, দুইরাতুল মাআরিফা, হায়দারাবাদ, ১৯৭০ খ্রী. পৃ.১৬৩
৮. ইউসুফ সালীম চিশতী, খারাজে আকীদা, রিয়ায়, করাচী, সুলাইমান নদভী, পৃ. ৮২
৯. শাহ মুঈনুদ্দীন নদভী, হায়াতে সুলাইমান, পৃ. ৮৫
১০. রইস আহমদ জাফরী, আলী বেরাদরান, নাফীস একাডেমী, করাচী, পৃ. ৬৪৩
১১. ইউসুফ আলী চিশতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪, সুলাইমান নদভীর পত্র, নদভী শাহ মুঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত,পৃ.২২২
১২. গোলাম মুহাম্মদ, তাযকিরায়ে সুলাইমান, পৃ.৬০
১৩. আহমদ সাঈদ, বযমে আশরাফ কে চারাগ, আল-আশরাফ, লাহোর, ১৯৭৫ খ্রী., পৃ. ৮০
১৪. ইউসুফ সালীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬
১৫. গোলাম মুহাম্মদ, পাকিস্তান কে তীন সাল, বিয়াজ করাচী, সুলাইমান নং-১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ (র.)

পীর সাহেব, আমতলী

পরাধীনতার যুগে প্রতিকূল পরিবেশে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে যে সকল মণীষী ভারত উপমহাদেশে আর্বিভূত হয়েছিলেন, পার্থিব লোভ-লালসা ও ক্ষমতার মোহ যাদেরকে ন্যায় ও সত্যের আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটাতে পারেনি, যারা শেরক ও বেদায়াতের নিকট কখনও আপোষ করেনি, ইসলাম প্রচার ও মানুষের কল্যাণে আমরণ নিবেদিত ছিলেন শায়খ হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ (র.) তাদেরই অন্যতম। নীল, থৌল, নবান্ন, হলিখেলা (নর-নারীর অবাধে পরস্পর রং ছিটানো), জামিদারদের বার্ষিক পুন্নাহ, সিন্দুর বিতরণ, ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা, স্বরস্বতী পূজা, ফরজ তরক করে পুরুষদের ধূতি পরিধান, নারীদের সিন্দুর ও সংখ ব্যবহার ইত্যাকার অনুসলীম আচরণ ও অনুষ্ঠানের মাঝে যখন গোটা মুসলিম সমাজ ছিল নিমজ্জিত, তখন এসবের বিরুদ্ধে এতদালাকায় ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র প্রতিবাদী ব্যক্তি। যার ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম দার্শনিক পথিকৃৎ।

এ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বর্তমান বাগেরহাট জিলার অন্তর্গত মোরেলগঞ্জ উপজেলাধীন আমতলীর নিভৃত পল্লীতে বাংলা ১৩০১ সালের ২৭ অগ্রহায়ন (ইংরেজী ১৮৯৫ ও হিজরী ১৩১৩ সাল) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এ জন্ম তারিখটি ছিল বাংলাদেশের সর্বস্মরণযোগ্য ষোল (বাংলা ১৩১৬ সাল) সালের ঐতিহাসিক সর্বনাশা ঝড় ও প্লাবনের ঠিক পনের বছর আগে। তাঁর পিতার নাম মুনশী জয়নুল্লাহ। মাতা ভাগ্য বিবি।[১]

পিতামাতা উভয়ই ধার্মিক ছিলেন। তারা অতি আদর করে এ নবজাত শিশুর নাম রাখেন মেহের অর্থাৎ আল্লাহর করুনা বা দয়া। জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মের ছাব্বিশ বছর পর এ সন্তানের জন্ম হয়। এত ব্যবধানের পর পুত্র সন্তান লাভকে পিতা-মাতা পরম করুনাময় আল্লাহর মেহেরবাণী মনে করেন। এবম্বিত কারণেই হয়তোবা এরূপ নামকরণ করা হয়। অথবা সম্ভবতঃ তৎকালীন যশোর জিলার অদ্বিতীয় সমাজ সংস্কারক ইসলাম বিদ্বেষী পাদরীদের আতংক বহু পরিচিতি মুনশী মেহেরুল্লাহ এর নামানুসারে এ শিশুর নাম করা হয়ে থাকবে। বাস্তবিক মুনশী মেহেরুল্লাহর ন্যায় উত্তরকালে এ শিশু মেহের দেশবাসীকে শেরক ও বিদায়াতমুক্ত একটি সমাজ উপহার দিয়েছিলেন।[২] পিতা আমতলী আদিবাসী ছিলেন না। তার পৈতৃক নিবাস ছিল বৃহত্তম বরিশাল জেলার অন্তর্গত ভান্ডারিয়অ থানাধীন প্রসিদ্ধ ভিটাবাড়িয়া গ্রাম। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। স্বাচ্ছন্দ বসবাসের জন্য পিতা দেশান্তর গমন করে বৃহত্তর খুলনা জেলার মোড়েলগঞ্জ থানাধীন আমতলীতে বসতি স্থাপন করেন।

শিশু মেহের ছিল পিতামাতার তিন সন্তানের কনিষ্ঠ জন। বয়জ্যেষ্ঠ ছিলেন আলহাজ্ব মুনশী আদন আলী ও মেজে সন্তান একমাত্র কন্যা শান্তি বিবি। রুচি সম্পন্ন একটি সুখী পরিবার বটে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি পিতা দারুন সহানুভূতিশীল ছিলেন। আত্মীয় ও পড়শীদের সামর্থানুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা করেন। পিতা উদার, অসম্প্রদায়িক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। বাড়ীর দক্ষিণে বসবাসকারী হিন্দুদের সাথে তিনি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এলাকায় একজন প্রভাবশালী জ্ঞানী ও ধীরস্থির ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হন।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

শৈশব কাল থেকেই মেহেরের স্বভাব প্রকৃতি ছিল পিতার ন্যায় শান্ত ও ধীরস্থির। তিনি নিম্ন স্বরে কথা বলতেন এবং স্বল্পভাষী ছিলেন। কি যেন সদা ভাবতেন , চিন্তা করতেন, আপন ভাবনা রাজ্যে সদা বিভোর থাকতেন। অন্যান্য শিশুদের ন্যায় তিনি চঞ্চল ছিলেন না, শিশু সুলভ বাচালতা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হতনা। সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ভালবাসতেন। যাবতীয় আচরণে তার স্বাতন্ত্রবোধ ছিল। এ জন্য তিনি সকলের কাছে আদুরে ও প্রশংসনীয় ছিলেন। অনাগত ভবিষ্যতে এ শিশু এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হবেন এবং দেশ, জাতি ও বংশের মুখ উজ্জল করবেন তা জীবনের প্রভাতেই প্রতীত হয়।

শিশুদের কুরআন শিক্ষা ছিল মুসলীম বাংলার পারিবারিক ঐতিহ্য। মসজিদ মকতব বা নিজ গৃহে এ কাজ সমাধা হত। শিশু মেহেরের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নোয়াখালী নিবাস মুনশী ফয়জুল্লাহ সাহেবের নিকট নিজগৃহে তিনি কুরআন পাঠ শেখেন।

দশ বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। মাতার আপাত্য স্নেহে তিনি লালিত হয়। পিতার অবর্তমানে কনিষ্ঠ ভ্রাতার লেখাপড়াসহ গোটা পরিবারের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুনশী আদন আলী সাহেব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। শিশু মেহেরের জীবন ফুলে ফুলে সুশোভিত হতে তার অবদান ছিল অপরিসীম। কেবল শৈশবে নয়, পীর সাহেবের পরিণত বয়সেও উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব বিদ্যমান ছিল।[৪]

প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য আতমলী ও আশেপাশের গ্রামে তেমন কোন সুযোগ ছিলনা। ফলে তিনি মাতুলালয়ে যান। বৃহত্তর বরিশাল জেলার অন্তর্গত ভান্ডারিয়া থানার নদমুল্যা গ্রামে উকিল উপেন এদবারের বাড়ীতে অবস্থিত একটি প্রাইমারী স্কুলে তিনি ভর্তি হন। এখান থেকেই তিনি নিম্নপ্রারী (L.P) ও উচ্চ প্রাইমারী (U.P) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তারপর পিত্রালয়ে ফিরে এসে তিনি মোরেলগঞ্জ বন্দরে অম্বিকা চরণ লাহা মাইনর ইংরেজী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। দুর্গম যাতায়াতের দরুন নিজ গ্রাম থেকে নিয়মিত স্কুলে গমনাগমন সম্ভবপর ছিলনা। আবার হিন্দু প্রধান পরিবেশে গুটিকতক মুসলিম ছাত্রের জন্য পৃথক বোডিং এর ব্যবস্থা থাকার প্রশ্নই উঠেনা। লেখা পড়ার প্রতি তার অত্যাধিক আগ্রহ ছিল, তা দেখে মোড়েলগঞ্জ থানার দারোগা মফিজ উদ্দীন সাহেব নিজ গৃহে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। দু'বছর পর মাইনর ইংলিশ স্কুল পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল দেখে তার সম্ভাবনাময় জীবনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।[৫]

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এভাবে তার ছ'টি বছর অতিবাহিত হয়। এরপর এ শিক্ষা আরো দীর্ঘায়িত করতে অথবা এ শিক্ষা বাদ দিয়ে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহন করতে তার মাতুলালয় ও পিত্রালয় উভয় পক্ষই বেশ দ্বিধাদন্দ্বে পতিত হয়। এহেন সিদ্ধান্তহীনতার জাল ছিন্ন করে যে মণিষি মেহেরকে কেবল দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার পথ নির্দেশনা দান করেন, তিনি হচ্ছেন তার নিকট আত্মীয় নদমুল্যা নিবাসী মুনশী ইসমাইল হোসেন। যিনি হবেন একজন সমাজ সংস্কারক, ভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাবেন, পরিবেশ কি করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পরে।এ বারে তিনি দিগ পরিবর্তন করে দ্বীনি ইলম হাসিলের পাকাপোক্ত ইরাদা করে ফেলেন। ফলে তার শিক্ষা জীবনে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বৃহত্তর কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত সুদূর চাঁদপুরে নীলকমল মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হন। এখানে তার জীবনের স্বনামধন্য উস্তাদ ছিলেন মাওলানা গিয়াস উদ্দীন দেওবন্দী (র) কর্ম জীবনেও তিনি এ উস্তাদে কথা ভোলেননি,তারই বড় জামাতা মাওলানা মুহিবুল্লাহ (র) দীর্ঘদিন যাবত আমতলী মাদ্রাসার সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন।

পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠের জন্য তিনি শায়খুল কোররা আল-আরব ও ওয়াল আযম হযরত মাওলানা ইবরাহীম (রঃ) এর চাঁদপুর মাদ্রাসায় ইলমে কিরাতে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি তাজবীদ ও ইলমে ক্বিরাতে শিক্ষা লাভ করেন এবং সপ্ত কিরাতের সনদ লাভ করেন। এরপর তিনি এই মাদরাসায়ই কওমী নিসাবে জামাতে চাহারমে ভর্তি হন।

দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এ বছরই মানসিক রোগে আক্রান্ত্ব হয়ে চাঁদপুর থেকে দেশে প্রত্যাগমন করেন। এমন একটি সম্ভাবনাময় জীবনে এহেন দূরাবস্থার জন্য নিকট আত্মীয়দের মুখে মলিন ছায়া নেমে আসে। পরিস্থিতি এমন হয় যে, অস্বাভাবিক আচারণের দায়ে তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে এ অবস্থা আরো দীর্ঘায়িত হয়। তবে তিনি মনস্তাত্বিক চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করেন। মঠবাড়িয়া থানার হোগলাবুনিয়ার জনৈক হাক্কানী আলেম ফকির তাকে বদজীনের আছর লেগেলোভ করেন। মঠবাড়িয়া থানার হোগলাবুনিয়ার জনৈক হাক্কানী আলেম ফকির তাকে বদজীনের আছর লেগেছে নির্ণয়ে তদবীর দেন। তিনি এ প্রতিভাধর বালকের অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার প্রতি আন্তরিক ও শ্রদ্ধাবান হয়ে নিজ হাতে বন্ধনমুক্ত করে কোলে তুলে নেন। তিনি স্নেহভরে তার বাল্যনাম মেহেরের পরিবর্তে মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ নামকরণ করেন এবং তার উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করে দোয়া করেন। এতে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কালে অভ্যস্ত আব্দুল লতিফ ফকিরের আদর সুলভ ব্যবহারকে গায়েবী মদদের আগমন হিসেবে গ্রহন করেন এবং মানসিক রোগ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।[৭]

পরবর্তিতে তার ছাত্র জীবনের প্রজ্ঞা, প্রত্যৎপন্নমতিত্ব ও প্রতিস্ফুরণ এবং কর্মজীবনে তার দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তার মানসিক ভারসাম্যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ছিলনা। যেহেতু ভারসাম্যহীন মানসিকতা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে মানুষকে বাধাঁ দেয়। তবে বালক মেহেরের এ অস্বাভাবিক আচরণ ছিল সাময়িক এবং এর কারণ ছিল তার মানসিক চাপ ও আভ্যান্তরীন প্রেষণা (Motive বা জীবনের লক্ষ্য) এর দ্বন্দ্ব বা অদমিত আকাংখা।

মানসিক সুস্থতা লাভের পর তিনি পুনরায় চাঁদপুর মাদরাসায় যান। ইতোমধ্যে মাদরাসাটি নিউ স্কীমে রুপান্তরিত হয়। তিনি ব্যর্থমনোরথ হয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে চাঁদপুর ত্যাগ করেন। ইংরেজী ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতা মাদরাসার আরবী বিভাগে জামাতে চাহারমে ভর্তি হন। বৃটিশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসাটি ছিল বর্তমান ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা সমূহের আদিরুপ। এ সময়ে মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ আলেকজেন্ডার হ্যামিলেট (১৯১৯-২৩ খ্রীঃ)

আবার বিপদ। কলকাতা মাদ্রাসায় পড়াকালীন অবস্থায় তিনি সংক্রামক ব্যধি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। একেত প্রবাস জীবন। তানপর পাশে আপনজন কেউ নেই। অবস্থা কি হতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

সহজে অনুমেয়। তিনি অসহায় অবস্থায় পড়ে রইলেন। অবশেষে ভোলা নিবাসী কামিল তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন নামে জনৈক হৃদয়বান ব্যক্তি তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেন। আরোগ্য লাভে দীর্ঘ ছয়মাস অতিবাহিত হয়। তবে এ রোগের প্রভাব দেহে বিশেষ করে চেহারা মুবারকে আমরণ দৃশ্যমান থাকে।[৮]

পীর সাহেব হুজুর সুস্থতা লাভের পরেই কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ইংরেজী উনিশশত একুশ সাল। বছরের শুরুতেই খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একযোগে ভয়াবহ রুপ পরিগ্রহ করে। কংগ্রেস, লীগ,খেলাফত কমিটি ও জামিয়াত-ই-উলামায়ে হিন্দ এ চার দলের সম্মিলিত অধিবেশনে একমত্য পোষণের পরে সমগ্র ভারতে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও মহাত্মাগান্ধী হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অবিভাজ্য নেতায় পরিগণিত হন। তারা গোটা উপমহাদেশে সভা সমাবেশে গলদ ঘর্ম থাকেন। ধর্মঘট মিছিল ও শ্লোগানে সমগ্র ভারতের ন্যায় কলকাতায়ও স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্র জীবনে রাজনীতিতে নিজেকে না জরিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে পীর সাহেব হুজুর নিরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেন। এহেন অবস্থায় আশ্রয়ের স্থান খুঁজে নেয়ার তাগিদে কলকাতায় টিকাটুলি মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ে তদানিন্তন বাগেরহাট মহাকুমার চরকাটির সুবিখ্যাত মাওলানা শফিউদ্দিন দেওবন্দে যাবার পথে এই মসজিদে যাত্রা বিরতি ও সাময়িক অবস্থান নেন।[৯]

এশিয়ার আযহার রুপে অভিহিত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বে-সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলুমে দেওবন্দে অধ্যায়ন করার ঐকান্তিক আগ্রহ তিনি দীর্ঘদিন মনেপ্রাণে লালন করে আসছিলেন। মাওলানা শফিউদ্দিন সাহেবের সান্নিধ্য পেয়ে তিনি এ সুযোগ হারালেন না। তিনি তার সাথেই দেওবন্দ মাদ্রাসায় সরাসরি উপস্থিত হলেন, দরুল উলুমের শায়খুল আদব ও ফেকহ হযরত মাওলানা এজাজ আলী (রঃ) তার ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন, তিনি এখানে ইং ১৯২১-২২ এই দুই বছর ফাজিল পর্যায়ে লেখাপড়া শেষ করে দেশে প্রত্যাগমন করেন। এক বছর বিরতির পরে তিনি পুনরায় দেওবন্দে যান এবং ১৯২৪-২৫ এই দু'বছরতকাল হাদীস,তাফসির ও ফেকহ শাস্ত্রত্রয়ের উপর উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।[১০]

হিজরী ১৩৪২ সালের ২৭ রমজান (ইং১৯২৩ ও বাংলা ১৩৩০ সাল) পবিত্র কদরের রাতে পীর সাহেব হুজুর ২৮ বছর বয়সে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূল্যা নিবাসী মীর নেছার উদ্দীনের পরমা সুন্দরী কন্যা জোহরা খাতুনের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ধৈর্য্যশীলা গুনবতী স্ত্রী জীবন সঙ্গীনি হবার কারণে তার ইসলামী দাওয়াহ সত্যিকার অর্থে একটি শক্তিশালী ভিত খুঁজে পায়। জীবনের আবদ্ধকৃত কর্মকান্ডে তিনি অভূতপূর্ব প্রেরণা লাভ করেন।

একই বছর বাংলা ১৩৩০ সালে ৯ আষাঢ় সোমবার তিনি আমতলী হাফেজ খানা ও মাদরাসা স্থাপন করেন এবং নিজেই মাদরাসার হেড মোদাররেছ ও সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন, এক বছর সুষ্ঠু পরিচালনার পর প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের উপর ন্যাস্ত করে তিনি দারুল উলুমে উচ্চ শিক্ষা হাসিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পুনরায় অধ্যায়নে আত্ম নিয়োগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল লতীফ (র.)-এর সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলী

পোস্ট অফিস ঃ

১৯১৯ সালে মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হতে আলিম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে গোল্ড মেডেল এর কৃতিত্ব অর্জন করেন। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসাতে অধ্যয়নকালে বাড়ী থেকে লেখাপড়ার জন্য যে খরচ নিতেন তা থেকে প্রতিদিন ৪ আনা করে বাঁচিয়ে ১০০ টাকা জমা করে ১৯২০ সালে কলিকাতার আলীপুর হেড পোস্ট অফিসে সিকিউরিটি বন্ড হিসেবে জমা দিয়ে নিজে ইংরেজীতে দরখাস্ত করে নিজ বাড়ীতে পোষ্টঅফিস আনেন। কিন্তু তার বড় ভাই আদন আলী পোষ্ট অফিসের গুরুত্ব না বুঝায় কলিকাতার আলীপুর হেড অফিস থেকে প্রেরিত অভারশিয়ারকে ফেরত পাঠালে রায়োদা আঃ গনি খাঁতা ধরে রায়োদা রাভোর এর কুরমান তালুকদারের একটি ঘরে প্রথম পোস্টঅফিস করেন। পরবর্তী বছর ১৯২০ সালে আবার ১০০ টাকা সংগ্রহ করে মাওলানা আব্দুল লতীফ নিজ বাড়ী আমতলীতে "পোস্টঅফিস" চালু করেন। কারন তখনকার যুগে মোড়েলগঞ্জের কুটিবাড়ীতেই রায়েনআ ও মোড়েলগঞ্জ অধিবাসীদের একমাত্র পোস্ট অফিস ছিল।

লোহার পুল তৈরী ঃ

তখনকার যুগে যখন বাগেরহাট জেলা শহরের নীচে কোন লোহার পুল ছিল না তখন তিনি ডিষ্ট্রিক বোর্ড খুলনাতে দরখাস্ত করে প্রথমতঃ কুমারখালী খালের উপর মোড়েলগঞ্জ ও শরনখোলা থানার জনসাধারনের চলাচলের জন্য লোহারপুল তৈরী করেন। তারপর মোড়েলগঞ্জ থানার দুই নং ডিষ্ট্রিক বোর্ডের চেয়ারম্যান শৈলন ঘোষ, মেম্বর মঈজুদ্দীন ও সুরত মল্লিককে ধরে পঞ্চকরণ ইউনিয়নের পাঁচগাঁও-এ লোহার পুল তৈরী করেন।

রাস্তা নির্মাণ ঃ

মাওলানা আব্দুল লতীফ (র.) শরনখোলা থানার বর্গী থেকে শুরু করে মোড়েলগঞ্জে ফকীরের তক্কা ২০ মাইল দীর্ঘ পর্যন্ত অভারশিয়ারদের দ্বারা অনেক নকশা সংগ্রহ করে ডিস্টিক বোর্ডের রাস্তা , গড় পোলের ব্যবস্থা করেন।

দিঘী খনন ঃ

এলাকার জনসাধারণের বিশুদ্ধ পানীয় সমস্যা লাঘবের জন্য তিনি নিজে এক একর ৩৪ শতক জমির উপর স্থানীয় লোকরে বিরোধীতা সত্ত্বেও এক বিশাল দিঘী খনন করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

(১) মরহুম মাওলানা আব্দুল লতীফ (র.)-১৯২৩ ইং সালে তাঁর নিজ বাড়ীতে দক্ষিণ অজপাড়া গাঁয়ের অশিক্ষিত মানুষকে জ্ঞানের আলো দানের জন্য সর্বপ্রথম আমতলী ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সাথে আলিয়া নেছাব চালু করেন। আজ সেই থেকে যুগ যুগ ধরে বহু ছাত্র বের হয়ে দেশ ও জাতির খেদমতে নিজেরা আত্মনিয়োগ করেছেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে লিল্লাহ বোডিং ও ইয়াতিম খানা ও খানকাহ চালু করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) বর্তমান খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা "আমতলীল পীর মরহুম মাওলানা আব্দুল লতিফ (র.) বাড়ী থেকে খুলনা গিয়ে মাসের পর মাস খুলনায় থেকে অনেক কিছুই প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমত- হাজী মাহমুদ আলী মাদ্রাসার জন্য ২ বিঘা জমি দান করেন। পরবর্তীতে হুজর ১৮ বিঘা জমির উপর মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে কামিল, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও আদব সহ নানা মুখী দ্বীনি শিক্ষার মারকাজ হিসাবে শিক্ষার আলো বিতরণ করছে।

(৩) বাগেরহাট জেলা সদরে অবস্থিত "বাগেরহাট আলিয়া মাদ্রাসা"।

(৪) মোড়েলগঞ্জের থানা সদরে মোড়েলগঞ্জ লতিফিয়া ফাযিল মাদ্রাসা।

(৫) দারুল কুরআন সিদ্দীকিয়া আলিম মাদ্রাসা পাঠাগার মাওলানা আব্দুল লতীফ (র.) প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসালে সাওয়াব ও বার্ষিক মাহফিল ঃ

সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের হেদায়েত প্রদান, জ্ঞানের আলো বিতরণ এবং মৃত আত্মীয় স্বজনের রূহের মাগফিরাত এর জন্য মাওলানা আব্দুল লতীফ (র.) ২১, ২২ ও ২৩ শে অগ্রহায়ন এবং ৪, ৫ ও ৬ ই ফাগুন ইছালে সওয়াব ও বার্ষিক মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মাহফিলে ভক্তবৃন্দ দলে দলে এসে ওয়াজ-নসীহত শুনে নিজের আত্মশুদ্ধির যেমন প্রচেষ্টা চালায় তেমনি সমাজ গঠনে ও আত্মনিয়োগ করে।

কোর্ট-কাচারী ও বিচার ফয়সালা ঃ

গ্রামের সাধারণ জনগণের মধ্যে মামলা- মোকদ্দমার শালিস কার্য নিজ বাড়ীতে করতেন। অনেক সময়ে তাঁকে বিচার কার্য ফয়সালা দেয়ার জন্য ডিস্টিক বোর্ড, কোর্ট-কাচারী থেকে নিযুক্ত করে দেয়া হতো। তিনি সকলের কথা মনোযোগ সহকারে শুনে সূক্ষ্মভাবে বিচার করতেন।

মাহফিলে সফর ঃ

দ্বীনের দাওয়াত প্রচার এবং সমাজ সংস্কারের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে মাহফিলের দাওয়াত নিতেন এবং সাধারণ মানুষকে দ্বীনের জ্ঞান দান করতেন।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঃ

দেশ ও জাতির খেদমত করার জন্য একবার ইউনিয়ন নির্বাচন এবং আর একবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেন।[১১]

==========

তথ্য নির্দেশ

১. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, আল ইসলাহ স্মরণিকা, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা-২০০৭, পৃ. ১৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩. আলমগীর মহিউদ্দীন হাদী, আমার দৃষ্টিতে আমতলীর পীর, অপ্রকাশিত, পৃ. ৪২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৫. এ.এইচ.মতিয়ার রহমান, নায়েবে নবী, অপ্রকাশিত, পৃ. ৬
৬. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৮. আলমগীর মহিউদ্দীন হাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৯. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

১১. মাওলানা আবুল কাসেম রশিদ আহমদ শাহ্ সাহেব মরহুম গদীনশীন পীর আমতলীর বাচনিক বিবরণ হতে; মাওলানা আব্দুল লতীফের বড় জামাতা মাওলানা আবুল হুফফাজ মোঃ হাতেম আলীর বাচনিক বিবরণ মতে।

মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)

(১৮৯৭–১৯৭৬)

জীবনধারা ঃ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির ও মুফতি-ই-আযম নামে খ্যাত মুহাম্মদ শফী (র.) ২০/২১ শাবান, ১৩১৪ হিজরী (জানুয়ারি, ১৮৯৭ খ্রি.) ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দ অঞ্চলে বিখ্যাত উসমানী বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন (র.)। জন্মের পর তাঁর দাদা খলিফা তাহসীন আলী তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ মুবীন; কিন্তু তাঁর পিতা মাওলানা ইয়াসিন (র.) সন্তান জন্মের সংবাদ জানিয়ে তাঁর শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.)[২] এর নিকট চিঠি লিখলে তিনি খুবই খুশি হন এবং তার নাম রাখেন 'মুহাম্মদ শফী'। পরবর্তীকালে এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শৈশবে তিনি বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি সুধারণা ও অত্যাধিক ভালবাসা রাখতেন। এ গুণটি তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। ছোট বেলায় তিনি সুযোগ পেলেই বড়দের মজলিসে গিয়ে বসতেন।[৩] দারুল উলুম দেওবন্দে[৪] তাঁর পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়। পাঁচ বছর বয়সে তিনি হাফিজ মুহাম্মদ আযীম সাহেবের তত্ত্বাবধানে কুরআন শরীফের পাঠ সমাপ্ত করেন।[৫] এছাড়া ফার্সি ভাষার প্রচলিত গ্রন্থাবলি আরবি ব্যাকরণ, ফিকহের প্রাথমিক পুস্তকাবলিসহ হস্তলিপি বিদ্যা তিনি তাঁর পিতার নিকট দেওবন্দ মাদ্রাসায় সমাপ্ত করেন। হিসাববিদ্যা ও শিল্পকলার প্রাথমিক ধারণা তিনি তাঁর চাচা মাওলানা মানযুর আহমদের নিকট হতে লাভ করেন।

ষোল বছর বয়সে তিনি যথারীতি উসূলে ফিকহ ও আরবি সাহিত্যের মাধ্যমিক লাভ করেন[৬] তিনি ইলম (জ্ঞান-বিজ্ঞান), মারিফাত,[৭] যুহুদ[৮] ও তাকওয়ার[৯] এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, যে পরিবেশ থেকে জ্ঞান ও মারিফাতের আলো পুরো উপমহাদেশ তথা মুসলিম জগতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।[১০] তিনি যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও দার্শনিক জুনায়েদ বাগদাদী (র.)[১১], আল্লামা কারখী (র.)[১২] (৮৭৩ – ৯৫১), ইবনে হাজার আসকালানী (র.)[১৩] (৭৭২ – ৮৫২) এবং ইমাম গাজ্জালী (র.) (১০৫৮ – ১১১১ খ্রি.)- এর শিক্ষা ও আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১৪]

তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরেই ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি তীব্র আগ্রহের দিকটি প্রবলভাবে অগ্রাধিকার পেয়েছে। জ্ঞানসাধনায় তাঁর প্রাণপন চেষ্টা ও একনিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। প্রতি দিনের ক্লাস হতে ফিরে এসে তিনি সহপাঠীদের নিয়ে রীতিমত তাকরার (শ্রেণীকক্ষে আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি) করতেন। তাঁর তাকরার ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলেন। ছাত্ররা এতেবিশ গুরুত্বের সঙ্গে তার তাকরারে অংশগ্রহণ করত যে, সেটা রীতিমত শ্রেণীকক্ষের রূপ ধারণ করত। একবার তিনি "দারুল উলুম করাচীর" ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাকরারের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি মাকামাতে হারিরী"[১৫] গ্রন্থের তাকরার করার সময় শায়খুল আদব মাওলানা উজাজ আলী (র.)-এর পূর্ণ বক্তৃতা হুবহু নকল করতাম। অনেক সময় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমার

Dhaka University Institutional Repository

অগোচরে আমার তাকরার শুনতেন এবং পরবর্তীতে আমি জানতে পারতাম যে, তিনি আমার তাকরার শুনে খুবই সন্তুষ্ট হতেন।"[১৬]

তিনি পড়াশোনায় এত বেশি মগ্ন থাকতেন যে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে তাঁর যাওয়া হয়ে উঠত না। এমনকি দেওবন্দের ন্যায় ছোট অঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলোও তিনি ভাল করে চিনতেন না। ছাত্রাবস্থায় পড়াশোনা করে সামান্য সময় পেলে তাও তিনি শিক্ষকদের নিকট গিয়ে তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে ব্যয় করতেন। পড়াশোনার অতিরিক্ত আত্মমগ্নতার কারণে তিনি অন্য কাজ করার সুযোগ পেতেন না। যে সকল শিক্ষকের নিকট হতে তিনি জ্ঞান লাভে ধন্য হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-আল্লামা কাশ্মিরী (র.)-(১২৯২ – ১৩৫২ হিজরী), মুফতী মাওলানা আযীযুর রহমান উসমানী দেওবন্দী (র.) (জন্ম ১৩০৫ হিজরী/মৃত্যু. ১৯৪৭ খ্রী.), মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (র.) (১৮৩৩ – ১৮৮০ খ্রী.), আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা সায়্যিদ মিয়া আসগর হোসাইন (র.) (মৃতু. ১৩৬৪ হিজরী), মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম বিলয়াবী (র.) (১৩০৪ – ১৩৮৭ হিজরী) প্রমুখ। হিজরি ১৩৩৫ সনে ২২ বছর বয়সে তিনি কওমী মাদরাসার সর্বোচ্চ শ্রেণী দাওরায়ে হাদিস কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করেন।[১৭]

দীর্ঘদিন থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের অধ্যক্ষের নজর তাঁর উপর ছিল বিধায় সে বছরই তিনি তাঁকে দেওবন্দে শিক্ষকতার দায়িত্ব দেন। দারুল উলুম দেওবন্দে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয় এবং অতি অল্প সময়ে তিনি উচ্চ শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য মনোনিত হন। প্রায় সব বিষয়ে পাঠদান করলেও দাওয়ায়ে হাদিসের পাঠ্য আবু দাউদ শরীফ ও মাকামাতে হারিরীর পাঠ দান ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের পাঠদানে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীর বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করত।[১৮] নিজের অধ্যাপনা সম্পর্কে তিনি বলেন-"দারুল দেওবন্দের পক্ষ থেকে আমাকে প্রতিদিন ৬টি করে ক্লাস গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তবে আমি সেখানে দৈনিক ১৮ ঘণ্টা কাজ করতাম।"[১৯] তাঁর কর্মজীবনের প্রায় অধিকাংশ সময় ব্যয় হত অধ্যাপনায়। দারুল উলুম দেওবন্দ ছাড়াও তিনি জামেয়া ইসলামিয়া দেবলে[২০] কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান এবং করাচীতে 'দারুল উলুম' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২১] এ প্রতিষ্ঠানে তিনি আজীবন শায়খুল হাদিসের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বোখারী শরীফ ছাড়াও তিনি সেখানে মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও শামায়েলে তিরমিযীর পাঠদান করতেন।

তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ২০ হাজার।[২২] মুসলিম বিশ্ব তথা পাকিস্তান, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, আফগানিস্তান, ইরান ও বাংলাদেশে তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও ভক্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত মুফাসসির, ফকীহ ও মুবাল্লিগ হিসাবে সারা বিশ্বে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-[২৩] জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়্যা, নিউ টাউন করাচীর প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল হাদিস আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী (র.) (মৃতু-১৯৯৭ খ্রি.)[২৪]; আশরাফ আলী থানবী (র.) (১২৮০ – ১৩৬২ খ্রী.)-এর বিশিষ্ট খলিফা ও

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা-ই-মিফতাহুল উলুম জালালাবাদ ভারতের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মসীহুল্লাহ খান (র.) (জন্ম-১৯৩০ খ্রী.)[২৫]; ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি অব পাকিস্তানের সাবেক সদস্য শায়খুল হাদিস মাওলানা আব্দুল হক (র.) (১২৫৮-১৩৪২ হিজরী)[২৬]; ভারতের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'বুরহান'-এর সম্পাদক মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী (র.) (জন্ম-১৯০৭ খ্রী.)।[২৭]

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) রাজনীতিকে কখনও জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেননি। তবে রাজনীতিকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে উল্লেখ করে এক্ষেত্রে সম্মিলিত ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে অন্যতম ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৮] আর এ কারণেই মুসলমানদের তীব্র প্রয়োজনের সময় তাঁকে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তিনি রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তিনি রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তিনি রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন যখন আসন্ন তখন এ আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে জনসমর্থন প্রতিষ্ঠা করা ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর দারুল উলুম দেওবন্দে কর্মরত থেকে এ ধরনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল দারুল উলুমের প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। তাই আশরাফ আলী থানবীর (র.) পরামর্শে ১৬ই রবিউল আউয়াল ১৩৬২ হিজরীতে মুফতী শফী (র.) স্বীয় পদ থেকে ইস্তফা দেন।

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে কোলকাতায় জমঈয়্যাতে উলামায়ে ইসলাম গঠন করা হয়। মুফতী শফী (র.)-এ সংগঠণের সদস্য হন এবং পরবর্তীকালে কার্যকরী কমিটির প্রধান নির্বাচিত হন।[২৯] একটি আদর্শ ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষে পূর্ণ দু'বছর রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমত গঠনে ব্যাপৃত থাকেন এবং এজন্য তিনি মাদ্রাজ হতে পেশোয়ার পর্যন্ত এবং পশ্চিমে করাচী পর্যন্ত সমগ্র দেশ ভ্রমণ করেন।[৩০]

২৭ রমযান ১৩৬৭ হিজরী মোতাবেক ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের মুসলমানরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের জন্য একটি ইসলামি সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষে শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আহবানে মুফতী শফী (র.) দেওবন্দ ছেড়ে পাকিস্তান যাবার সিদ্ধান্ত নেন।[৩১] ২৯শে জমাদিউস সানী, ১৩৬৭ হিজরী (১লা মে, ১৯৪৮ সালে) সপরিবারে তিনি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ৬ই মে, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান পৌঁছেন।[৩২] তখন থেকেই পাকিস্তানের করাচীতে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর ৮০ বছরের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান। ১৩৪৯ হিজরী থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষ তাঁকে দারুল উলুমের প্রধান মুফতীর পদে অধিষ্ঠিত করেন।[৩৩] ১৩৬২ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর তিনি উক্ত পদে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৩৫৪ হিজরির মুহাররম মাস থেকে 'আল মুফতী' নামে একটি শিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা প্রকাশনার কাজ শুরু করেন। এ পত্রিকার সম্পাদনা, তত্ত্বাবধান ও প্রকাশনা সবই তাঁর দায়িত্বে ছিল। তৎকালীন সময়ে উলামায়ে দেওবন্দের ফতোয়াসহ ধর্মীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রকাশ ও প্রচারের একমাত্র মুখপত্রের কাজ করে 'আল মুফতী' পত্রিকাটি।[৩৪]

পাকিস্তানের প্রচলিত আইন ব্যবস্থাকে ইসলামি ছাঁচে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার ১৯৫০ সালে একটি ল'কমিশন গঠন করেন। এ ল'কমিশনে তাঁকে সদস্য নিযুক্ত করা হয়।[৩৫] ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী ইন্তিকাল করলে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী জমঈয়্যাতে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি নিযুক্ত হন। ২২শে নভেম্বর ১৯৫৩ সালে তিনি ইন্তিকাল করলে জমঈয়্যাতের সভাপতির গুরু দায়িত্ব মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)-এর উপর ন্যস্ত হয়।[৩৬] প্রায় একই সময়ে (১৯৫০ খ্রী.) পাকিস্তান সরকার যাকাত সংগ্রহ ও এর খাত সম্পর্কে ইসলামি আইন প্রণয়নের লক্ষে যে যাকাত কমিটি গঠন করেন তিনি তাতেও সদস্য হিসাবে কাজ করেন।[৩৭]

গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ রচনার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা করা। ফলে সমসাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে যখনই তিনি কোনো বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন তখনই সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত পুস্তিকা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেহেতু গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা করা সেহেতু তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির স্বর্বস্বর্ত নিজের জন্য সংরক্ষণ করেননি এবং কখনও কোন রচনা হতে আর্থিক সুবিধাও গ্রহণ করেননি। হাদিস, তাফসির, ফিকহ ও অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি বিপুল সংখ্যক তত্ত্ব ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ছোট-বড় রচনার সংখ্যা ১৬২টি।[৩৮] তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে মা'আরেফুল কোরআন; জাওয়াহিরুল ফিকহ; আলাতে জাদীদাকে শারঈ আহকাম (আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ইসলামের বিধান); খতমে নবুওয়াত (কামিল); ইসলাম কা নিজামে আবাদী (ইসলামের ভূমি আইন); ইসলাম কা নিজামে তাকসীমে দাওলাত (ইসলামে সম্পদ বন্টননীতি); আদাবুল মাসাজিদ (মসজিদ সম্পর্কিত আহকাম ও মাসায়েল); বীমা যিন্দেগী (জীবন বীমা); তাসবীর কী শারঈ হাইছিয়্যাত (ফটো বা ছবি সম্পর্কে ইসলামের বিধান); প্রভিডেন্ট ফান্ড পর যাকাত আউর সুদ (প্রভিডেন্ড ফান্ডের উপর যাকাত এবং সুদের মাসআলা); ঈমান কুফর কুরআন কী রৌশনী মেঁ (কুরআনের আলোকে ঈমান ও কুফুর সম্পর্কিত বিধান); সুন্নত ও বিদআত; সীরাত-ই খাতামূল আম্বিয়া; ভোট ওয়া ভোটার কী শারঈ হাইছিয়্যাত (শরীআতের দৃষ্টিতে ভোটদান ও ভোটার সম্পর্কিত বিধান); আউযানে শারঈয়্যা (শরীআতের পরিমাপসমূহ); কুরআন মেঁ নিযামে যাকাত (কুরআনে বর্ণিত যাকাত পদ্ধতি); মাকামে সাহাব (সাহাবাগণের মর্যাদা); আহকামূল কুরআন (আরবি); ফাতাওয়াগণের রচিত গ্রন্থাবলি প্রকাশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও উপকারার্থে এবং স্বীয় গ্রন্থাবলি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করার লক্ষে পাকিস্তানের বিখ্যাত দুটি প্রকাশনী দারুল ইশাআত ও

Dhaka University Institutional Repository

ইদারাতুল মা'আরিফ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনীদ্বয় অদ্যাবধি ইসলাম ও মুসলমানদের নিরন্তর সেবা করে যাচ্ছে।

১১ শাওয়াল ১৩৯৬ হিজরী (৬ অক্টোবর ১৯৭৬ সালে) উপমহাদেশের এ প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মুফতী-ই-আযম মুহাম্মদ শফী (র.) ইন্তিকাল করেন। করাচী দারুল উলুম মাদ্রাসার পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৩৯] তিনি পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁরা হলেন-মাওলানা যাকী কায়ফী, মাওলানা মুহাম্মদ রাফী, ওয়ালী রাযী, মাওলানা মুফতী রাফী উসমানী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী কন্যাগণের নাম-নাঈমা খাতুন, আতীকা খাতুন, হাসীবা খাতুন, রাকীবা খাতুন।

ইসলামী শরীআতের প্রধান উৎস হল আল-কুরআন। এ কুরআনে বিধৃত হয়েছে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ ও শ্বাশত দিক নির্দেশনা। তবে কুরআনের নির্দেশগুলো অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হওয়ায় সাধারণ লোকের পক্ষে তা বোঝা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। পবিত্র কুরআনকে সকলের জন্য বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে মুসলিম পণ্ডিতগণ হাদিস ও সাহাবাগণের বাণীর আলোকে এর ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন। ভারত উপমহাদেশে যে সকল প্রখ্যাত মুফাসসির কুরআনের ব্যাখ্যা করে ইসলামি জগতে অমর হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)- এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিকে তাফসির শাস্ত্রের প্রতি তাঁর তেমন একটা মনোযোগ ছিল না। তিনি নিজেই বলেন-"প্রথম দিকে তাফসির শাস্ত্রের প্রতি আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না কিন্তু আল্লাহতাআলার অনুগ্রহে বর্তমানে তাফসীর শাস্ত্রের প্রতি আমার আসক্তিটা বেশি মনে হচ্ছে। আল্লাহর নিকট আকুল কামনা তিনি যেন এই আগ্রহটা শেষ অবধি জিইয়ে রাখেন।"[৪০] দারুল উলুমের দায়িত্ব থেকে ইস্তিফা দানের পর হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) তাঁকে আহকামুল কুরআন রচনার ভার অর্পণ করেন। এ দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই তাফসিরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পৃক্ততার সূচনা হয়।[৪১]

ইতোমধ্যে তিনি ১৯০৫ খ্রী. করাচি আরামবাগের বাবুল ইসলাম মসজিদে প্রতিদিন ফজর সালাতের পর দরসে কুআন চালু করেন। ৩০শে শাওয়াল, ১৩৭২ হিজরী (২রা জুলাই ১৯৫৪ খ্রী.) রেডিও পাকিস্তানের মহাপরিচালকের অনুরোধে তিনি প্রতি শুক্রবার সকালে 'মা'আরেফুল কোরআন' শিরোনামে কুরআন শিক্ষার এক ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।[৪২] একটানা ১১ বছর এ কুরআন শিক্ষার আসর রেডিও পাকিস্তানে অব্যাহত থাকে। পাকিস্তান ছাড়া আফ্রিকা ও ইউরোপের অনেক মুসলমান কুরআন শিক্ষার এই আসরের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন।

পরবর্তীকালে সমসাময়িক ওলামায়ে কেরামের অনুরোধ ও উৎসাহে তিনি রেডিওতে তাঁর পরিবেশিত 'দারসে কুরআনকে' লিখিত রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৬ সফর ১৩৮৩ হিজরী তিনি এ কাজে হাত দেন। শারীরিক দুর্বলতা ও অত্যধিক ব্যস্ততার দরুন সংকলন কাজ মন্থর গতিতে চলতে থাকে এবং অবশেষে ১৩৯২ হিজরী সনে তা সমাপ্ত হয়। মূলত রেডিও

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে তাঁর পরিবেশিত 'দারসে কুরআনের' সম্প্রসারিত ও লিখিত রূপই হচ্ছে মাআরেফুল কোরআন।[৪৩]

মাআরেফুল কোরআন শীর্ষক বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ হচ্ছে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)-এর এক অক্ষয় কীর্তি যা তাঁকে চিরদিন অমর করে রাখবে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রাণপণ চেষ্টা করে উর্দু ভাষায় তিনি ৫৬৬২ পৃষ্ঠা সম্বলিত বড় বড় ৮ খন্ডের এই বিশাল তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন।

তাফসির শাস্ত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)-এর অপর এক অনবদ্য সৃষ্টি হল আরবি ভাষায় রচিত আহকামূল কুরআন গ্রন্থটি। এ গ্রন্থ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)-এর এমন উঁচু মানের রচনা যার দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্বে তেমন দেখা যায়নি। ইমাম আবু বকর আল-জাসসার (র.) (মৃত. ৩১০ হিজরী)-এর পর হানাফী মাযহাবের মাসয়ালা সংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থ তেমন একটা লেখা হয়নি। মুফতি শফী (র.)-এর উপরিউক্ত গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এ গ্রন্থটি তিনি তাঁর শায়খ হাকীমূল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর নির্দেশক্রমে রচনা করেন।[৪৪] উল্লেখ্য যে, তাঁর এ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ কুরআনের ব্যাখ্যা নয়। এতে তিনি সূরা আশ-শু'আরা থেকে সূরা আল-হুজরাত পর্যন্ত মোট ২৪টি সূরার তাফসির করেন।

আহকামূল কুরআন গ্রন্থে মুফতি শফী (র.)-এর জ্ঞানের প্রশস্ততা, মাসয়ালা উদঘাটনে দৃষ্টিভঙ্গির সুদৃঢ় প্রসার ও ব্যাপকতা প্রতিভাত হয়েছে। এতে কতিপয় বিষয় এত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, পরবর্তীতে সেগুলো স্বতন্ত্র পুস্তিকার রূপ ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত আয়াত নিয়ে রচিত হয়েছে তাফসীলুল খিতাব ফি তাফসীর আয়াতিল হিজাব নামের একটি গ্রন্থ। সাহাবাগণের সমালোচনা সম্পর্কে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থানের স্বপক্ষে কুরআন সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী মনীষীগণের বাণীর আলোকে রচিত হয়েছে মাওকিফু আহলিল ইনাবাতি ফি মুশাজারাতিস সাহাবা একটি গ্রন্থ। ইসলামি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয়েছে আরেক অনবদ্য গ্রন্থে দস্তুরে কুরআনী মাজামীমা গায়রে মুসলিমু কে হুকুক। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা ও যাকাতের আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি নিয়ে রচিত হয়েছে কুরআন মেঁ নেজামে যাকাত নামের একটি গ্রন্থ। ঈমান, কুফর ও মুসলমানদের সংজ্ঞা ও পরিচয় নিয়ে রচিত হয়েছে ঈমান ও কুফর কুরআন কি রৌশনী ম্যাঁয়। প্রায় ১০০টি আয়াতের তাফসির প্রদান করে 'খতমে নবুওয়্যাত' শীর্ষক সমস্যার প্রায় সব দিক সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে খতমে নবুওয়্যাত ফিল কুরআন নামক গ্রন্থে। কাদিয়ানি সমস্যা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সর্তক করে রচিত হয়েছে হাদীয়াতুল মাহদিয়্যিন ফি আয়াতে খাতামিন নাবিয়্যীন গ্রন্থে।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)-এর তাফসিরের ধারা বা প্রকৃতি ছিল অন্যান্য তাফসির থেকে ভিন্নধর্মী। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাব ও আল্লাহর বাণীর উদ্দিষ্ট অর্থসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সময়ের দাবি ও যুগের চাহিদা

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী স্থানে স্থানে আধুনিক সমস্যাবলির সমাধানে এত বিস্তর উপাদান সন্নিবেশিত করেছেন যে, পরবর্তীকালে কিছু কিছু বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচিত হয়েছে।[৪৫]

তথ্য ও টিকা নির্দেশ

১. মুফতী রফী, "হায়াতে মুফতীয়ে আযম", আল-বালাগ পত্রিকা, করাচী, (জমাদিউস সানী, শাবান, ১৩৯৯ হিজরী), পৃ. ৯৪।

২. শায়খ রশীদ আহমদ ১৮২৯ সালে সাহারানপুর জেলার গাঙ্গুহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা গাঙ্গুহী উঁচুমানের ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর রচিত ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া গ্রন্থকে হানাফী ফিকহের বিশ্বকোষ বলা যায়। মাওলানা নানাতুবীর ইন্তেকালের পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন। ১২ আগস্ট ১৯০৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩. হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরী, (ঢাকা, আল কাউছার প্রকাশনী-১৯৯৬), পৃ. ১২২

৪. দারুল উলুম দেওবন্দ হচ্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। এটিকে 'এশিয়ার আযহার' নামেও অভিহিত করা হয়। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জেলার 'দেওবন্দ' নামক শহরে ১৫ মুহাররাম ১২৩৮ হিজরী/৩০ মে, ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ) ঢাকাঃ ই.ফা.বা-১৯৯৬, খন্ড-১৩, পৃ. ২৮

৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইমদাদুল মুফতীনে কামেল, দারুল ইশাআত, করাচী তা.বি., পৃ. ৩৯।

৬. ইমদাদুল মুফতীনে কামেল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৭. মারিফাত শব্দটি ক্রিয়াবিশেষ্য। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে-চেনা, জানা, অবগত হওয়া। তাসাউফের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলাকে তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলির সাথে জানাকে মারিফাত বলে। তবে, 'উলামা-ই-দীন, ফকীহগণ ও অন্যান্যদের মতে আল্লাহতাআলা সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানকে মারিফাত বলে। (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮, পৃ. ১৮৪

৮. মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদ বা সুফিবাদে 'যুহদ' একটি প্রায়োগিক পরিভাষা। যাহিদের গুণ বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'যুহদ'। 'যুহদ' বলতে বোঝায় পাপ কাজ এবং আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন যে কোনো জিনিস হতে সংযম অবলম্বন বা আত্মসংবরণ করা। অতঃপর মনের নিরাসক্তি ও নির্লিপ্ততা সহকারে সকল নশ্বর দ্রব্যাদি হতে সংযম ও মিতাচার অবলম্বন, কঠোর সংযম বা তপস্যা এবং সকল সৃষ্ট জিনিসকে বর্জন করা। (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খন্ড-২১, পৃ. ৬৬৯)

৯. তাকওয়া শব্দের অর্থ হল আত্মরক্ষা, আল্লাহভীতি এবং কোনো প্রকার অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। শরীআতের পরিভাষায় তাকয়া হল আল্লাহতাআলার ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে দূরে থেকে ইসলাম নির্দেশিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা। (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খন্ড-১২, পৃ. ১০৭)

১০. আল-বালাগ পত্রিকা, পৃ. ৯৮

১১. হযরত জুনায়েদ (র.) বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁর নামের সাথে বাগদাদী শব্দটি স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি অনেক বড় শায়খ এবং মুর্শিদানের বাদশাহ ছিলেন। তিনি ইলমে যাহিরী এবং ইলমে বাতেনীর বহুবিদ বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন। সমকালীন বিভিন্ন সাধকেরা তাঁকে একবাক্যে নিজেদের ইমামরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে তিনি 'শায়খদের কেন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। হযরত জুনায়েদ মূলত শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত সমুদ্রের গভীর সন্ধানী ছিলেন। তাঁকে জাতির মুখপাত্র এবং জাতির গৌরব বলে মনে করা হত। এছাড়া তাঁকে গাউছুল উলামা ও সুলতানুল মুহাক্কিকীন নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছিল। 'এশক' ও 'যুহদে' কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। পাশাপাশি গ্রন্থরচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বহু দ্বীনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। (শেখ ফরিদউদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

১২. আল্লামা আর-কারখী-এর পুরো নাম উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান। তিনি ২৬০ হিজরী/৮৭৩ সালে বাগদাদের কারখ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা ফকীহ (ইসলামী আইনবিদ) উসূলী (আইন তত্ত্ববিদ) ও অনেক গ্রন্থপ্রণেতা। তিনি ১৫ শাবান, ৩৪০/৯৫১ সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-৭, পৃ. ২৩৫, ২৩৬

১৩. ইবন হাজার আল 'আসকালানীর নাম হচ্ছে আবুল ফাদল শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল আসকালানী। শাফিঈ মাযহাবের একজন মিসরীয় বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাদিসবিদ, বিচারক ও ঐতিহাসিক। তিনি ২৬ শাবান ৭৭২/১৫ মার্চ, ১৩৭১ খৃ. মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন কর্ম হাদিস বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে নির্দেশ করে এবং তাঁকে যেমন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসরূপে চিহ্নিত করে, তেমনি মুসলিম ধর্মীয় পান্ডিত্যের সর্বাপেক্ষা আদর্শ প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এ মহান জ্ঞানসাধক হাদিস শাস্ত্রসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১৫০টি গ্রন্থ রচনা করেন। ২৮ জিলহজ্জ ৮৫২/২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড ৪, পৃ. ২০৯–২১৩

১৪. সায়্যিদ মাহবুব রিজভী, তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ, (ভারতঃ ইদারায়ে ইহতিমাম দারুল উলূম দেওবন্দ-১৯৭৮), খন্ড-২, পৃ. ১৩০

১৫. 'মাকামাত' হল আরবি সাহিত্যের একটি শাখা। উন্নতমানের ভাষণ বা বক্তৃতা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মাকামাতে হারিরী বলতে সুসাহিত্যিক আল্লামা আল হারিরীর সেই গ্রন্থকে বোঝায় যাতে ৫০টি মাকামাত স্থান পেয়েছে। তার রচিত এ মাকামাগুলো এ জাতীয় সাহিত্যের সর্বোচ্চ নির্দশন। ভাষার সৌন্দর্য, শব্দের ব্যবহারে বাক্যবিন্যাসে, উপমা উৎপ্রেক্ষা ও আলঙ্কারিক সাজ-সজ্জায় মাকামাতে হারিরির তুলনা হয় না। উপমহাদেশের প্রতিটি মাদরাসাসহ বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাকামাতে হারিরী গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকে মর্যাদা লাভ করেছে। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় ভাগ, খন্ড-১৬, পৃ. ৪৫৫–৪৫৭

১৬. আল বালাগ পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯–১০০

১৭. হাবীবুর রহমান, হায়াতুল মুসান্নিফীন, ঢাকাঃ আল-কাউছার প্রকাশনী-১৯৯৭, পৃ. ৮৬

১৮. ইমদাদুল মুফতীন, পৃ. ৪৫

১৯. আল-বালাগ পত্রিকা, পৃ. ১৫৭

২০. দেবল খাট্টা ও করাচীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি বন্দর। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় (৭১১–৭১৪) থেকে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার কারণে এখানে বহু বিদেশী পণ্ডিতের আগমন ঘটে এবং এটা ইসলামি শিক্ষার এক লীলাভূমিতে পরিণত হয়। (ড. মুহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, ই.ফা.বা.-১৯৯৩, পৃ. ৩৪–৩৫

২১. শামসুল হক দৌলতপুরী, তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি। ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৯, পৃ. ৭৬

২২. ইমদাদুল মুফতীন, পৃ. ৪৬

২৩. রশীদ আশরাফ, "হযরতে মা'রুফ তালামিযা আউর উনকে খিদমাত", আল-বালাগ পত্রিকা, পৃ. ৯১৫

২৪. মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরী পেশোয়ার জেলার এক বিদ্যোৎসাহী সাইয়্যেদ খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ আলিম ও খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। মাওলানা বিন্নোরী ছিলেন একজন ধীমান, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কোমল ও সুপ্রশস্ত দৃষ্টির অধিকারী আলিম। হাদিস শাস্ত্রে মারিফুস সুনান তাঁরই অনবদ্য গ্রন্থ। তিনি ১৭ অক্টোবর ১৯৭৭ সালে/১৩৯৭ হিজরী উষার সময় ইসলামাবাদ শহরে ইন্তিকাল করেন। সাইয়্যেদ মাহবুব রিজভী, অনু-মাওলানা মুশতাক আহমদ, দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস, ইফাবা-২০০৩, পৃ. ৬৪৩–৬৪৪

২৫. মাওলানা মাসীহ উল্লাহ খান ১৯৩০ সালে আলীগড় জিনার সারায়ে বারালায়ু-এর আপন পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সরকারি স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে দারুল উলুম

Dhaka University Institutional Repository

দেওবন্দ থেকে দাওরা হাদিস সম্পন্ন করে মানইতক ও ফালাসিফা শাস্ত্রে উচ্চতর গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর মুরিদ ছিলেন। ১৩৫১ হিজরী সালে তিনি তাঁর খিলাফত লাভে ধন্য হন। মাওলানা থানবীর ৯১ জন খলিফার অন্যতম ছিলেন। তিনি শরীআত ও তাসাউফ নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪২ – ৬৪৩

২৬. মাওলানা আব্দুল হক পুরকাযবী মুযাফফর নগর জেলার অন্তর্গত পুরকাজী গ্রামে ১২৫৮ হিজরির কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৩ হিজরী সালে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১২৮৬ সালে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। আমল ও আখলাকে তিনি ছিলেন সালফে সালেহীন আলিমগণের যোগ্য নমুনা। তিনি ১৩৪২/১৯২৩ সালে ইন্তিকাল করেন। দারুল উলুম দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮-৫১৯

২৭. মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী ১৩২৫ হিজরী/১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৪৪ হিজরী তে দারুল উলুম দেওবন্দ শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করেন। তারপর লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে ফাযেল এবং সেন্ট স্টেপেন কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনিয়াত বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৩৮২ হিজরী থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪ – ৬৩৬

২৮. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ, ভারতঃ দারুল ইশাআত দেওবন্দ-২০০১, পৃ. ১১৬

২৯. ইমদাদুল মুফতীন, পৃ. ৫৫–৫৬

৩০. ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড, পৃ. ১৬৩

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

৩২. ইমদাদুল মুফতীন, পৃ. ৬৪

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৩৪. আল-বালাগ পত্রিকা, পৃ. ১৮০ – ১৮২

৩৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-২১, পৃ. ১৬৩

৩৬. ইমদাদুল মুফতীন, পৃ. ৬৯

৩৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১শ খন্ড, পৃ. ১৬৩

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩৯. হাবীবুর রহমান, হায়াতুল মুসান্নিফীন, ঢাকাঃ আল কাউছার প্রকাশনী-১৯৯৭, পৃ. ৮৮

৪০. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ, পৃ. ৮৫

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৪২. ইমদাদুল মুফতীন, পৃ. ৭২

৪৩. আল-বালাগ পত্রিকা, পৃ. ৬৬৮

৪৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, আহকামুল কুরআন, করাচীঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৫

৪৫. আল-বালাগ পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮

মাওলানা মনিরুদ্দীন আনওয়ারী

(১৮৭৮ – ১৯৪৩)

দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানাধীন রাণীবন্দর গ্রামে ১২৮৫ সনের ১৭ পৌষ মওলানা মোহাম্মদ মনিরুদ্দীনের জন্ম। পিতা মাওলানা মাযহারুদ্দীন ছিলেন দিল্লীর মওলানা মিঞা নাযীর হুসাইনের শিষ্য। মওলানা আনওয়ারী প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর বিহারের দুমকা জেলার অন্তর্গত

Dhaka University Institutional Repository

দেলালপুর মাদ্রাসায় তিন বছর পড়েন। এরপর পাটনায় শিক্ষা করেন। সর্বশেষে কানপুরের মাদ্রাসা-এ-জামিয়ায় দরসে নিযামিয়ায় শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[১]

কর্মজীবনে মাওলানা আনওয়ারী পিতা প্রতিষ্ঠিত রাণীরবন্দরের মাযহারুল-উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। অমনি ১৯১৯ সালে খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ হয়। তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে তাতে যোগ দেন। দিনাজপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি আবদুল্লাহেল বাকীর মাধ্যমে আংকারায় পাঠান। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাণীবন্দরের মাযহারুল উলূম মাদ্রাসা ভবনকে আঞ্চলিক কংগ্রেস অফিসে পরিণত করা হয়। আপত্তিকর বক্তৃতার জন্য ১৯২০ সালে মওলানা আনওয়ারী ৬ মাস কারাবরণ করেন। ঐ সালের শেষের দিকে অন্য একটি ভাষণের দায়ে আরেকবার এক সভা থেকে তাঁকে বন্দী করা হয়।[২] তখন দেশের অজস্র জনতা জড়ো হয়ে জেলের কপাট ভেংগে তাঁদের প্রিয় নেতাকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করেন।[৩] খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসলে মাওলানা আনওয়ারী 'বাংলা-আসাম আনজুমানে আহলে হাদিস' এবং এর মুখপত্র 'মাসিক আহলে হাদিস' (কলকাতা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রী.) পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হন। আহলে হাদিস পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ বাবর আলী ও মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। এর সপ্তম সংখ্যা থেকে সম্পাদকরূপে শুধু মোহাম্মদ বাবর আলীর নাম দেখা যায়। নবম বর্ষে মোহাম্মদ আবদুল লতিফ কয়েকটি সংখ্যার সম্পাদনা করেন। মওলানা বাবর আলীর অসুস্থতার সময়ে মওলানা আনওয়ারী পত্রিকাটির সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন। এতে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধও লিখতেন। তাঁর চেষ্টায় পত্রিকাটি মাসিক থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। (১৫ ডিসেম্বর ১৯২৭ খ্রী.)। সাপ্তাহিকীটির সম্পাদনা করতেন বাবর আলী সাহেব। তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা (জানুয়ারী ১৯৩০ খ্রী.) থেকে একাদশ সংখ্যা পর্যন্ত এটি বাবর আলী ও মওলানা আনওযারী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ঐ বছরের দ্বাদশ সংখ্যা (২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ খ্রী.) থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মোটামুটি ১০ বছর কেবল মওলানা আনওয়ারী ঐ পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সাপ্তাহিকীটি মোট ১৩ বছর (১৯২৭ – ১৯৩৯ খ্রী.) চলার পর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়।৪ পত্রিকাটির আদর্শ ছিল 'মোহাম্মদী' তথা 'আহলে হাদিস' সম্প্রদায়ের সমর্থন ও 'হানাফী' মতবাদের বিরোধিতা করা।

পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে (১৩৪৬ বাং) মওলানা আনওয়ারী স্বগ্রামে ফিরে এসে ধর্মপ্রচার ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। রাণীরবন্দর দাতব্য চিকিৎসালয় ও পল্লীমঙ্গল পাঠাগার তাঁরই চেষ্টার ফসল।

১৩৪৯ বংগাব্দ মুতাবিক ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে মওলানা আনওয়ারী বালুরঘাটে ইন্তিকাল করেন।[৪]

তথ্য নির্দেশ

১. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষার কুরআন চর্চা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ২২৪
২. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
৩. Bangladesh District Gazatteers, Dinajpur-1975, P. 37

Dhaka University Institutional Repository

৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৯, পৃ. ১৯৯, ৫৩৯

৫. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা হাকীম হাবীবুর রহমান

(১৮৮১ – ১৯৪৭)

মওলানা হাকীম হাবীবুর রহমান ছিলেন উনিশ শতক পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী। মুসলিম বাংলার রেনেসাঁ আন্দোলনে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। নওয়াব সলীমুল্লাহর রাজনীতি ও শিক্ষা আন্দোলনের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় পূর্ব বাংলায় ইউনানী তথা হাকীমী চিকিৎসা প্রসার লাভ করে। ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গবেষণা এবং এখানকার স্মরণীয়-বরণীয়দের আলেখ্য রচনার জন্য তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। বাঙলার আরবী, ফার্সী ও উর্দু গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করে তিনি বিশাল একটি গ্রন্থাগার সৃষ্টি করেন। মুসলিম ঐতিহ্য বিজড়িত অনেক প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপি সংগ্রহ করে তিনি আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের এই দিকটি জিইয়ে রাখার প্রয়াস পান।

হাকীম সাহেবের জন্ম ১৮৮১ সালের ২৩ মার্চ ঢাকার কাটরায়। পিতা মওলানা মুহম্মদ শাহ্ আখুনযাহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইয়াগিস্তান থেকে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিকার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। ঢাকা মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর হাকীম সাহেব ১৩ বছর বয়সে কানপুরের জামিউল উলূম মাদ্রাসায় তিন বছর সময়ে (১৮৯৪ – ৯৭ খ্রী.) ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর ইউনানী চিকিৎসা-বিদ্যা শেখার জন্য প্রথম লখনৌ, পরে দিল্লী যান। সর্বশেষ ১৮৯৯ সালে আগ্রায় তিব্বে ইসলামী সম্পন্ন করেন। দীর্ঘ ১৩ বছর (১৮৯৪ – ১৯০৪ খ্রী.) কানপুর, লখনৌ, দিল্লী ও আগ্রায় ধর্মীয় শিক্ষা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ঢাকায় ফেরেন এবং ইউনানী চিকিৎসা শুরু করেন। অল্প সময়ে এ পেশায় তিনি খ্যাতিলাভ করেন। এতে তাঁর উপর নওয়াব সলীমুল্লাহর নজর পড়ে। নওয়াব সাহেব তাঁকে নওয়াব পরিবারের চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। এই সুবাদে নওয়াব সাহেবের সাথে হাকীম সাহেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই সূত্র ধরে হাকীম সাহেব নওয়াব সাহেবের রাজনীতি ও শিক্ষা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন এবং আজীবন চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি সাংবাদিকতা, রাজনীতি, শিক্ষা আন্দোলন, পুরাকীর্তি ও মুদ্রা সংগ্রহ এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত থাকেন। হাকীম সাহেব ছিলেন স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা ছিল মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী সর্বভারতীয় নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের অনুরূপ। তাঁর সমকালীন মুসলিম বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা স্যার সলীমুল্লাহও ছিলেন একই পথের পথিক। তাই তিনি নওয়াব সাহেবের রাজনীতি ও শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে স্যার সলীমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় যে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' গঠিত হয়, তার পশ্চাতে হাকীম সাহেবেরও ভূমিকা ছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জনের উদ্যোগে এবং সলীমুল্লাহসহ পূর্ববংগের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমর্থনে ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ছিলেন এর প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর। এই নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে পূর্ববাংলা ও আসামের মুসলমানদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চার

Dhaka University Institutional Repository

হয়। মুসলিম জাতীয়াতাবাদে উদ্বুদ্ধ দিশারী-হাকিম সাহেবের ঐকান্তিক কামনা ছিল, পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানরাও শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সামর্থ্য ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের পাশাপাশি উন্নতি লাভ করুক, তারা রাজনৈতিক মঞ্চে সংঘবদ্ধ হোক। তিনি মনে প্রাণে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও মুসলিম জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি 'সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ' গঠনের পূর্বেই এর ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য ১৯০৬ সালের অক্টোবরে ঢাকা থেকে 'আল-মাশরিক' (প্রাচ্য) নামক মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বাংলা-আসামের মূসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিনি আগাগোড়া এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এটা ছিল তদানীন্তন পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় পত্রিকা। নওয়াব সলীমুল্লাহ ছিলেন ঐ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক। পত্রিকাটি কিছুকাল মাসিক থাকার পর সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। কিছুদিন পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ পত্রিকাটি বংগবিভাগ সমর্থন করে এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বংগবিভাগ বিরোধী আন্দোলনের অযৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করে। পত্রিকাটির বিভিন্ন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি মুসলমানদের দৈন্যদশা তুলে ধরার প্রয়াস পান। ১৯০৭ সালের মার্চে তিনি বলেনঃ-

দুঃখের বিষয়, মুসলমানরা অর্থ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য সব দিক থেকেই অবনতির অতল গহবরে আপতিত। তুলনামূলকভাবে দেখুন। স্কুল-কলেজের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন হিন্দু ছেলেরা কত হৃষ্টপুষ্ট, তাদের চেহারা কত সুন্দর, তারা সুন্দর পোশাক পরে বেরিয়ে আসছে। অথচ মুসলমান ছেলেরা কত জীর্ণ-শীর্ণ, তারা ময়লা ও কুৎসিত পোশাক নিয়ে বেরিয়ে আসছে। লোকেরা বলে, স্কুলের এই (হিন্দু) ছোকরারা লাঠির প্রশিক্ষণ নিয়ে মুসলমানদের একটি পশমও বাঁকা করতে পারবে না। আমারও এ ধারণা ছিল। কিন্তু এখন বুঝলাম আমাদের অন্যান্য ভুল ধারণার ন্যায় এটাও একটি ভুল ধারণা। শক্তি-সামর্থ্যে তারা আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তারা এখন সাহসেরও অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। আজ এ মেম সাহেবকে গালি দিলো, কাল ঐ ইংরেজকে ইট মারলো, পরশু এই মুসলমানকে মারধর করে উধাও হয়ে গেলা, তরশু কোন মুসলমানকে বন্দুক মেরে অসাড় করে দিলো।[১]

কংগ্রেসী পত্রিকাসমূহ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী প্রচার করতো। কিন্তু এর পেছনে তাদের কোন আন্তরিকতা ছিল না। সেগুলো মুসলিম নেতাদের নাম ধরে আশালীন ভাষায় ব্যঙ্গোক্তি করতো এবং তাঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সমালোচনা করতো। এর পাল্টা জওয়াবে হাকীম সাহেব তাঁর 'আল-মাশরিক' পত্রিকায় বলেন-

কপট ঐক্যের দাবিদার কংগ্রেসী পত্রিকাসমূহ নিত্য মুসলমান ও তাদের নেতাদের সম্পর্কে ব্যাঙ্গোক্তি করে চলেছে। মুরাদাবাদের এক অপ্রকৃতিস্থ পত্রিকা-সম্পাদক সলীমুল্লাহ, না কি ভুসিভরা মোল্লা" এই শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে জাতির গৌরব ঢাকার নওয়াব সাহেবের উপর কাপুরুষোচিত হামলা করে হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আলীগড়ের অন্য একজন কংগ্রেসী মুসলমান সম্পাদক 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসি'-র প্রস্তাবকে 'ডবল পাগলামি' এবং মুসলিম লীগের

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবাবলীকে 'ছেলেমি কথা' আখ্যায়িত করে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেছেন। অন্যের অধিকারে হাত না দিয়ে শুধু স্বাধিকার আদায়ের জন্য 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়েছে। অথচ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের লজ্জাকর ক্রিয়াকর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলিম লীগ এবং এর সম্মানিত নেতাদের প্রতি কটাক্ষ করেও আমাদের ঐক্যের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ ধরনের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে দুঃখ করা বই আর কিছুই নাই।[২]

১৯০৮ সালে ঢাকায় 'পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' গঠিত হলে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ এর অনারারি সেক্রেটারি এবং হাকীম হাবীবুর রহমান জয়েন্ট সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট ছিলেন কাযেম আলী সিদ্দিকী (মৃ. ১২–১২–১৯৩৬ খ্রী.)।

নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহর মৃত্যুর (১৯১৫ খ্রী.) পর খাজা মুহম্মদ আযম রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হাকীম সাহেব খাজা মুহাম্মদ আযমেরও পরামর্শদাতা ও সহযোগী ছিলেন। ঢাকার সকল শ্রেণীর নাগরিক ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপর হাকীম সাহেবের প্রভাব ছিল। হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর পরামর্শ মেনে নিতো।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এ অসহযোগ আন্দোলনের এক প্রস্তাবে বৃটিশের দেয়া খেতাব, আইনসভা, কোর্ট-কাছারি, সরকারী-আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, বিলাতী দ্রব্য এবং সরকারী চাকরি বর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়। (২-৬-১৯২০ খ্রী.)। এর ফলে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা স্কুল-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাকার্য অব্যাহত থাকে। সে সময় ঢাকার মুসলিম নেতৃবৃন্দ[৩] হাকীম হাবীবুর রহমানের সহযোগিতায় মুসলমানদের 'শিক্ষা রক্ষা কমিটি' নামক একটি কমিটি গঠন করেন এবং ৪৪ পৃষ্ঠা সংবলিত "অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ভারতীয় আলিমগণের অভিমত" শীর্ষক একটি উর্দু পুস্তিকা প্রকাশ করেন (২৪ শে রবিউল আউয়াল, ১৩৩৯ হিজরী-১৯২০ খ্রী.) এবং এ মর্মে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, শিক্ষা-দীক্ষা ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে মোটেই সমীচীন হবে না।

হাকীম সাহেব খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ত্যাগ করাকে তিনি তাদের জন্য অহিতকর বলে বিবেচনা করেন। ১৯১৯ সালে খিলাফত আন্দোলন চলাকালে তিনি রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে 'গরীব হিন্দুস্থান' শীর্ষক একটি উর্দু নাটক লিখে ঢাকায় মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু তা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। কারণ এতে নাটক সংক্রান্ত টেকনিসকস এর দিক থেকে কিছুটা দুর্বলতা ছিল।[৪]

১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে হাকীম সাহেব খাজা আদেলের সহযোগিতায় ঢাকা থেকে 'জাদু' (মন্ত্র) নামক আরো একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি ছিল পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় উর্দু পত্রিকা। পত্রিকাটি বেশ উন্নতি লাভ করে এবং একবার বিরতির পর ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। 'আল্-মাশরিক' এর ন্যায় এ পত্রিকাটিও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত প্রকাশের পাশাপাশি তাদের জাতীয় স্বার্থের দিকগুলো তুলে ধরার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করে। ১৯২৩ সালে হাকীম সাহেব ও খাজা আবদুল করীম ঢাকা থেকে ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য পদপ্রার্থী ছিলেন।[৫]

১৯২৫ – ২৬ সালের পর থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত হাকীম সাহেব রাজনৈতিক অংগন থেকে দূরে ছিলেন বলে মনে হয়। এ সময় তাঁর কোন রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। ঢাকার মাসিক পত্রিকা 'জাগরণ'-এর প্রতিষ্ঠা বর্ষের ১ম সংখ্যায় সমাজ ও রাজনীতির অংগন থেকে হাকীম সাহেবের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে বলা হয়।

অনেকে হয়ত জানেন, ঢাকার প্রসিদ্ধ হাকীম হাবিবুর রহমান হাকিমী চিকিৎসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু তিনি পূর্ববংগের মুসলমানের রাষ্ট্র সমস্যা সম্বন্ধে খুব সজাগ-এ কথা হয়ত অতি অল্প লোকেই জানেন। তাঁর মত প্রখর বুদ্ধি ব্যক্তি আজ নেতাহীন অনাথ মুসলমানদের ভবিষ্যতের পথ ইঙ্গিত করবার জন্য ভাল করে মনোযোগ দিলে আমরা বড় সুখী হইতাম। তাঁর নিকট বাদশাহ-নবাবদের কাহিনী সম্পর্কে অনেক materials আছে এবং তিনি নিজে সেগুলি সম্বন্ধে বেশ দস্তুরমত ওয়াকিফহাল আছেন।[৬]

ঐ পত্রিকার একই বর্ষের ৩য় সংখ্যায় হাকীম সাহেব খুব সম্ভব উক্ত সম্পাদকীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের অবগতির জন্য সম্পাদকের নিকট এক পত্রে বলেন-

স্নেহাস্পদেষু,

১৯০৬ হইতে এ পর্যন্ত একবার 'আল-মাশরিক' ও একবার 'জাদু' নামক মাসিক পত্রিকা শুধু এই উদ্দেশ্যেই মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য বাহির করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল পত্রিকা নানা কারণে এ পর্যন্ত সাধারণ সমক্ষে বিকশিত রাখা সম্ভবপর হয় নাই। ..... আপনারা অবগত আছেন যে, প্রায় আড়াই বৎসর যাবত আমি পাবলিক লাইফ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি এবং সমস্ত politics ছাড়িয়া দিয়া কেবল চিকিৎসা ব্যবসার দ্বারা সর্বসাধারণের শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলাম এবং ইহাকেই জীবনের একমাত্র সাধনা স্থির করিলাম।[৭]

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বে কোন এক সময় হাকীম সাহেব টাংগাইল শহরে গিয়ে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ডায়মন্ড প্রেস সংলগ্ন ঘরে অবস্থিত ছিল তাঁর হাকীমী দাওয়াখানা। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ও মুসলিম লীগের ঘোর সমর্থক। বেশীদিন তিনি রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেন না। বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হলেন তদানীন্তন টাংগাইল মহকুমা-মুসলিমলীগ গঠনের কাজে।[৮]

১৯৩১ সালেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী টাংগাইলের মুসলিম জনসমাজকে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় জমিদারদের ষড়যন্ত্রে, বিশেষত সন্তোষের মহারাজার দাপটের সামনে তিনি বেশীদিন টাঙ্গাইলে টিকে থাকতে পারেননি। টাংগাইল ছেড়ে তাঁকে পাবনায়, আবার পাবনা থেকে রংপুরে, তারপর রংপুর থেকে রাজশাহীতে আশ্রয় নিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ সালে তাঁকে সরকারের আদেশে বাংলা ছেড়ে আসামে পাড়ি জমাতে হয়। হাকীম সাহেব ভাসানী কর্তৃক জাগরিত মুসলিম কওমের প্রতি সংঘবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তাঁর আহবানে সাড়া জাগালো টাংগাইল মহকুমার সর্বত্র।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ সালের কোন একদিন নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ টাংগাইলের জামে মসজিদে সমবেত হন। জুমু'আর নামাযান্তে তাঁরা গঠন করলেন টাংগাইল মহকুমা মুসলিম লীগ। সভাপতি ও সেক্রেটারী হলেন যথাক্রমে চাঁদ মিঞার পুত্র মাসুদ আলী খান পন্নী ওরফে নওয়াব মিঞা ও মওলানা হাকীম হাবীবুর রহমান। মওলানা ভাসানীর একনিষ্ঠ সহকর্মীদের অনেকেই সে সময় মুসলিম লীগের সদস্য হন। টাংগাইলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। টাংগাইলে মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার ফলে সেখানকার দীর্ঘকালীন কংগ্রেসী আধিপত্যে ভাটা পড়ে। এতকাল যে সব মুসলিম নেতা কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় রাজনীতি করছিলেন, তাঁরা মুসলিম লীগের প্রতি ঝুঁকতে লাগলেন। ঐ সময় নির্বাচনের ব্যাপারে 'কায়েদে আযমে'র সাথে এ.কে.ফজলুল হকের সমঝোতা না হওয়ায় তিনি (হক সাহেব) মুসলিম লীগের বিরোধী দলরূপে দাঁড় করান। ফলে সর্বত্র মুসলিম লীগের সমর্থকদের বড় একটি অংশ যোগ দিল কৃষজ-প্রজা পার্টিতে। টাংগাইলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। হাকীম হাবীবুর রহমান ও নিযামুদ্দীন আহমদ মোক্তার ছিলেন পরস্পর বন্ধু। হাকীম সাহেব ছিলেন মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আর নিযামুদ্দীন মোক্তার ছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির সেক্রেটারি। ফলে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মুসলিম সমাজে দ্বিধা-বিভক্তি দেখা দেয়। স্বভাবতই নির্বাচনে মুসলিমলীগ টাংগাইলে কৃষজ প্রজা পার্টির প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।[১০]

উত্তর টাংগাইল কেন্দ্রে মুসলিম লীগ প্রার্থী অধ্যক্ষ ইবরাহিম খাঁ কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী নওয়াবজাদা হাসান আলী চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন। পূর্ব টাংগাইলে প্রজা পার্টি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীকে পরাজিত করে মুসলিম লীগ প্রার্থী জনাব মাসুদ আলী খান পন্নী জয়লাভ করেন। টাংগাইল সদর থেকে প্রজা পার্টি প্রার্থী মেজর মফিযুদ্দীনকে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী (পরে মুসলিম লীগ) জনাব মির্জা আবদুল হাফিয নির্বাচিত হন।[১১]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় থেকে ১৯৪৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির আন্দোলনে টাংগাইলের হিন্দু-মুসলমান সমাজ গভীরভাবে আলোড়িত হয়। মুসলিম লীগের সেক্রেটারি মওলানা হাকীম হাবীবুর রহমান ঝড়-ঝাপটা মাথায় নিয়ে, বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে টাংগাইলের থানায়-থানায়, ইউনিয়নে-ইউনিয়নে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যান। অন্যদিকে কৃষক-প্রজা পার্টির সেক্রেটারী নিযামুদ্দীন মোক্তারও তাঁর দলের প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন সমান তালে।[১২]

১৯৩৭ সালের আগে টাংগাইল মহকুমার ১০০টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ৪টি ইউনিয়নে প্রেসিডেন্ট ছিলেন মুসলমান। কিন্তু দু'জন সেক্রেটারির প্রতিযোগিতামূলক সাংগঠনিক তৎপরতার ফলে অল্পকালের মধ্যেই প্রায় অর্ধশ' ইউনিয়নে মুসলমান প্রেসিডেন্ট হতে সক্ষম হন। মফঃস্বল এলাকায় মুসলিম লীগের ব্যাপক নেতৃত্ব গড়ে তোলার পেছনে হাকীম হাবীবুর রহমানের অবদান ছিল অপরিসীম।[১৩]

১৯৪৬ সালের নির্বাচন প্রাক্কালে মওলানা ভাসানী আসাম থেকে টাংগাইল এসে হাকীম হাবীবুর রহমান, শাহ্ রোস্তম আলী ফকির, শমসের আলী সরকার, খাদেম আলী সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক সহায়তায় কাগমারীতে এক মহাসম্মিলন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতিত্ব করেন তদানীন্তন টাংগাইল মহকুমার মুসলিমলীগ সভাপতি অধ্যক্ষ ইবরাহিম খাঁ। ঐ সম্মিলনে মওলানা ভাসানী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ পাকিস্তান প্রস্তাবের যথার্থতা জনগণের সামনে ব্যাখ্যা করেন। ফলে ঐ নির্বাচনে টাংগাইল মহকুমার মুসলিমলীগের জয়-জয়কার অন্য কোন রাজনৈতিক দল রুখতে পারেনি। ঐ নির্বাচনে যে কজন জাঁদরেল মুসলিমলীগ নেতা পাকিস্তান আন্দোলনকে টাংগাইলে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, তন্মধ্যে হাকীম হাবীবুর রহমান ছিলেন অন্যতম।[১৪]

জাতির এই দরদী লোকটি পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় (১৯৪০ খ্রী.) পর পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পূর্বেই তিনি অতি উৎসাহে তাঁর আসুদগান-এর- ঢাকা' গ্রন্থে ঢাকার বিশেষ এক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাকে জনসংখ্যার উদ্বৃতি দিয়ে '"পাকিস্তানী এলাকা' বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি পাকিস্তান দেখে যেতে পারেননি। পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার ৫/৬ মাস পূর্বেই তিনি ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ইনতিকাল করেন।[১৫]

তথ্য নির্দেশ

১. আল-মাশরিফ, ঢাকা, মার্চ-১৯০৭, পৃ. ৯ – ১০

২. পূর্বোক্ত, ঢাকা, ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-১৯০৭, পৃ. ২০।

৩. ১৯২০ সালের ১২ ডিসেম্বর নওয়াব হাবিবুল্লাহর আহবানে এ.কে.ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ঢাকায় বংগীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে অসহযোগ আন্দোলনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার বর্জনের যে সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে ঘোষিত হয়েছিল, তা পরিহার করার নির্দেশ দেয়া হ।

৪. ইশরাত রহমানী, উর্দু ডামা-কা-ইরতিকা, লাহোর, শায়খ গুলাম আলী এন্ড সন্স, ১৯৬৮, পৃ.২১৮

৫. খাজা আযম হাকীম সাহেবকে সমর্থন করেন। কিন্তু খাজা পরিবারের অন্যান্য সদস্য খাজা করীমের পক্ষে ছিলেন। খাজা করীম নির্বাচনে জয়ী হন (ঢাকা খিলাফত কমিটির ট্রেজারার খাজা মওদূদের ডায়েরী, তাং ১৭-১১-১৯২৩ খ্রী.)।

৬. জাগরণ, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-১৩৩৫, পৃ. ৩৪

৭. ঐ, ৩য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, পৃ. ১২৯

৮. আবদুর রহিম খন্দকার, টাংগাইলের ইতিহাস, পৃ. ৪৬০

৯. পূর্বোক্ত, টাংগাইলের ইতিহাস, পৃ. ৪৬০

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১ – ৬২

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

১৫. আসুদগান-এ-ঢাকা, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী

(১৮৭৫–১৯৫০)

মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী ১৮৭৫ সালের ২২ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত বরমা ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী-ফার্সী শিক্ষিত পিতা মতিউল্লাহ প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। মওলানা এছলামাবাদী স্থানীয় মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে হুগলী মাদ্রাসায় ১৮৮৯ সালে (৬ষ্ঠ) জামাআতে ভর্তি হন এবং ১৮৯৫ সালে সেখান থেকে ফাইনাল মাদ্রাসা পাশ করেন।[১]

আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষা শেষে মওলানা এছলামাবাদী জীবিকার উদ্দেশ্যে রেভিনিউ আইন অধ্যয়ন করতে মনস্থ করেন। একদিকে মোক্তারি পরীক্ষা পাসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে মাতৃভাষায় (বাংলা) দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনের গতি মোড় নেয়। তিনি রংপুর শহরের মুনশীপাড়া জুনিয়র মাদরাসায় হেড মৌলবী পদে যোগদান করে সেখানে দুই বছর (১৮৯৬–১৮৯৭ খ্রী.) শিক্ষকতা করেন। পরবর্তী সময় তিনি রংপুরের পীরগঞ্জের অন্তর্গত কুমেদপুর মাদ্রাসায় হেড মৌলবী পদে দুই বছর (১৮৯৮–১৯০০ খ্রী.) চাকুরী করেন। মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে গেলে মওলানা এছলামাবাদী চট্টগ্রাম ফিরে এসে সেখানে মৌলবী আব্দুল আজিজ প্রতিষ্ঠিত মুসলিম বোডিং এ সুপারিন্টেনডেন্ট পদে ৬ মাস (১৯০০ খ্রী.) কাজ করেন। তারপর সীতাকুণ্ড সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক পদে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সীতাকুণ্ড মাদ্রাসায় থাকাকালে তিনি একদিকে মিসরের 'আল-মানার' ও 'আল আহরাম' প্রভৃতি বহু বিখ্যাত পত্রিকায় আরবী প্রবন্ধ লিখতেন, অন্যদিকে উত্তর মধ্য ভারতের প্রখ্যাত উর্দু পত্রিকাসমূহে মূল্যবান উর্দু রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। খিলাফত আন্দোলনের সময় মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত কলকাতার উর্দু 'দৈনিক যামানা' (১৯২০–২৪ খ্রী.) পত্রিকায়ও তিনি কতেক প্রবন্ধ লিখেন। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটিতে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের পরামর্শ দেন।[২]

তারপর মওলানা এছলামাবাদী সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষকতা ছেড়ে কলকাতা যান এবং রাজশাহী মির্জা ইউসুফ আলীর সাহায্য ও সহযোগিতায় ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে 'ছোলতান' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা পুনঃপ্রকাশ করেন। তাঁর যোগ্য সম্পাদনায় 'ছোলতান' পত্রিকা দেশের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।[৩] এটি ১৯১০ সালে বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯২৩ সালে কলকাতা থেকে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে কলকাতা থেকে এর দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ সময় তিনি একাধারে 'সাপ্তাহিক ছোলতান' ও 'দৈনিক ছোলতান' উভয়েরই প্রধান পরিচালক ছিলেন।[৪]

মওলানা এছলামাবাদী আজীবন শীর্ষ কাতারের ন্যাশনালিস্ট তথা কংগ্রেসী ভাবাপন্ন জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাই তিনি সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী পরিচালিত বংগবিভাগ রদ-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং নিজের সম্পাদিত 'ছোলতান' পত্রিকায় ঐ আন্দোলনের সমর্থনে বহু প্রবন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

ও মন্তব্য লেখেন।[৫] তিনি একদিকে ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসপন্থী, আবার অন্যদিকে ছিলেন প্যান ইসলাম আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক। ত্রিপলি ও বলকান যুদ্ধে (১৯১১-১৯১৩ খ্রী.) বাংলা ব্যাপী যে প্যান ইসলাম আন্দোলন চলে, তাতে তিনি সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। খিলাফতের ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে তিনি তুরস্ক-সুলতানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে কলকাতায় আগত (১৮৯০ খ্রী.) প্যান ইসলামপন্থী নেতা আগা মঈদুল ইসলাম ত্রিপলি ও বলকান যুদ্ধের সময় তাঁর ফার্সী সাপ্তাহিক 'হাবলুল মতীন' এর সাপ্তাহিক ইংরেজী সংস্করণ, সাপ্তাহিক বাংলা সংস্করণ ও দৈনিক বাংলা সংস্করণ কলকাতা থেকে বের করেছিলেন। বাংলা দৈনিকের সম্পাদনা করতেন ডঃ আব্দুল সুহরাওয়ার্দী। মূল ফার্সী পত্রিকার সম্পাদক আগা মুঈদুল ইসলামের ন্যায় মওলানা এছলামাবাদী এবং ডঃ আব্দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীও ছিলেন প্যান ইসলামাবাদী। তাঁরা পত্রিকা চতুষ্টয়ে প্যান ইসলামী ভাবধারা প্রকাশে ত্রুটি করেননি। মওলানা এছলামাবাদী সম্পাদিত দৈনিক বাংলা 'হাবলুল মতীন' এর ইংরেজী ও বাংলা সংস্করণ কিছুকাল পর আগা মুঈদুল ইসলাম কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৬] কিন্তু ফার্সী 'হাবলুল মতীন' এর প্রকাশনা ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

মওলানা আকরম খাঁ ও মওলানা এছলামাবাদী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে 'আনজুমান এ উলামা এ বাংলা', 'ইসলাম মিশন', 'খাদিমুল ইসলাম'-এর ন্যায় জরুরী কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। অনেক দিন থেকেই হানাফী উলামা ও আহলে হাদীস উলামার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় মতামত নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলছিল। এই সংঘাত লক্ষ্য করে মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী, মওলানা এছলামাবাদী, মওলানা আকরম খাঁ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ হানাফী ও আহলে হাদীস আলিমগণকে একই মঞ্চে আনার এবং তাঁদের দ্বারা সমাজের গঠনমূলক কাজ করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তারা ১৯১৩ সালে বগুড়ার বানিয়া গ্রামে 'আনজুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা' প্রতিষ্ঠা করেন। মওলানা এছলামাবাদী ছিলেন এর জয়েন্ট সেক্রেটারি। মওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন যথাক্রমে এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারি। 'আনজুমান'-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী।

১৩২২ সনের বৈশাখ মুতাবিক ১৯১৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে আনজুমানে মাসিক মুখপত্র 'আল এসলাম' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রকাশনা ৬ বছর অব্যাহত ছিল। মওলানা এছলামাবাদী দীর্ঘদিন এই পত্রিকার সম্পাদনা করে মুসলিম সাহিত্যের অকালের যুগে মুসলিম লেখক গোষ্ঠী সৃজনে ও ইসলামী সাহিত্য প্রণয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'বংগীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩ খ্রী.) এবং 'বংগীয় মুসলমান সাহিত্যে সমিতি' (১৯১১ খ্রী.)-এরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং উভয় সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন।[৭] ১৯১৮ সালে তিনি সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'র সম্পাদনা পরিষদে যোগ দেন এবং এর পরিচালনায় মওলানা আকরম খাঁ সহযোগিতা করেন।[৮]

বংগবিভাগ রদ-আন্দোলনের ন্যায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনেও মওলানা এছলামাবাদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করে জনসাধারণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করার চেষ্টা করেন। ঐ আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন। তাই অনেকে খদ্দর প্রস্তুত ও ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। স্বতন্ত্রভাবে বা যৌথ উদ্যোগে বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বিভিন্ন স্থানে খদ্দর বিক্রির জন্য বহু স্টোর খোলা হয়। কলকাতায় চিৎপুর রোডে শাহাজান স্টোর নামে একটি স্টোর ছিল। মওলানা এছলামাবাদী ছিলেন তার প্রধান পরিচালক।[৯] খিলাফত আন্দোলন চলাকালে টাংগাইলের চাঁদ মিঞা সাহেবের আহবানে করটিয়ায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ঐ সভায় খিলাফতের সমর্থনে ভাষণ দেন।[১০] ১৯২০ সালের ৩ মার্চ নওয়াব হাবীবুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকার আহসান মনযিলে খিলাফত সংক্রান্ত এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মওলানা শওকত আলী ভাষণ দেন। মওলানা এছলামাবাদী খিলাফত আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন।[১১] খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন করতে গিয়ে যে সব বিশিষ্ট আলিম কারাবরণ করেন, তন্মধ্যে মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী, মওলানা আকরম খাঁ, পীর বাদশা মিঞা, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা আহমদ আলী, মওলানা মনিরুদ্দীন আনওয়ারী, মওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ খান, মওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ, মৌলবী ইব্রাহীম (ফেনী), মৌলবী এ্যাডভোকেট শামসুদ্দীন আহমদ (কুষ্টিয়া) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মওলানা এছলামাবাদী খিলাফত আন্দোলন করে গ্রেফতারও হননি, কারবরণও করেননি। তিনি বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এবং বংগীয় খিলাফত কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ছিলেন।

'ছোলতান' পত্রিকার কিছু কথা আগে বলেছি। ১৯২৩ সালের সাপ্তাহিক 'ছোলতান' ছিল খিলাফত স্বরাজ অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র। এটি ছিল মুসলিম জাগরণের প্রয়াসী ও হিন্দু-মুসলমান মিলনপন্থী। পত্রিকাটি বাংগালী মুসলমান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১২] মওলানা এছলামাবাদী এর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ভাবশিষ্য ওলী ইসলামাবাদীও সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন। অর্থাভাবে সাপ্তাহিকটি কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৬ সালে কলতাকায় ভীষণ হিন্দু-মুসলিম দাংগা হয়। মুসলমানের জান-মালের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। ঐ সময় ওলী ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের করিম বখশ্ ব্রাদার্সের অর্থানুকূল্যে কলকাতা থেকে 'দৈনিক ছোলতান' প্রকাশ করেন। সম্পাদনার ভার অর্পিত হয় মওলানা এছলামাবাদী উপর। একমাত্র জাতীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদেই গুরু-শিষ্য দুই ইসলামাবাদী দৈনিকটি বের করেছিলেন। মুসলিম রাজনীতির সেই দুঃসময়ে দৈনিক ছোলতান ভারতীয় মুসলমানদের, বিশেষ করে মুসলিম রাজনীতির সেই দুঃসময়ে দৈনিক ছোলতান ভারতীয় মুসলমানদের, বিশেষ করে মুসলিম বাংলার জাতীয় স্বার্থকে উঁচু করে তুলে ধরেছিল। পত্রিকাটি দৃঢ় কণ্ঠে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এ পত্রিকাটিও অর্থাভাবে বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। যে ব্যবাসীয়রা লোকসান থেকে রক্ষা করার জন্য পত্রিকার আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সাথে মতানৈক্যের জন্যই সম্ভবত মওলানা এছলামাবাদী পত্রিকার সাথে সংশ্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন (১৯২৮-২৯ খ্রী.)। এরপর মরহুম কবি আশরাফ আলী

Dhaka University Institutional Repository

খান এ কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত হন।[১৩] কবি সাহেব মওলানাকে 'ছোলতানে' ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হয়নি।[১৪] মওলানা এছলামাবাদীর অনুপস্থিতির কারণে পত্রিকাটি ভালভাবে চলেনি। ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি সময় এটি বন্ধ হয়ে যায়।[১৫]

'ছোলতান' ত্যাগের পর মওলানা এছলামাবাদী এ.কে.ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৯ সালে কলকাতা 'দৈনিক আমীর' প্রকাশ করেন। সম্পাদক ছিলেন আলী আহমদ ও ওলী ইসলামাবাদী। এটিও বেশী দিন চলেনি। এক বছরের মধ্যেও পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এর মওলানা এছলামাবাদী কলকাতা ত্যাগ করে বার্মা গমন করেন।[১৬]

১৯৩০ সালে মওলানা এছলামাবাদী চট্টগ্রামে কদম মুবারক ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৭ সালে মওলানা এছলামাবাদী চট্টগ্রাম-দক্ষিণ এলাকা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে বংগীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯–১৯৪৫ খ্রী.) চলাকালে কংগ্রেস নীতির প্রতি মওলানা এছলামাবাদী আস্থা হারান এবং সুভাষ বসুর রাজনৈতিক আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এ যোগদান করেন। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে (আগস্ট ১৯৪২ খ্রী.) যোগদান এবং ১৯৪২ সালের অক্টোবরে সুভাষ বসু গঠিত 'আযাদ হিন্দ ফৌজ'-এর কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জ্ঞান। বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে তিনি 'আযাদ ফৌজ' কে সক্রিয় সাহায্য দিতে মনস্থ করেন এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবী দল গঠন করেন। ঐ দল গঠনের দায়ে তাঁকে ১৯৪৪ সালের ১৩ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয়।[১৭] মি. গান্ধী, জওহর লাল নেহেরু প্রমুখ নেতার সাথে তাঁকে দিল্লীর লালকিল্লায় আটক রাখা হয়। তারপর সেখান থেকে পাঞ্জাবের মিঃাওয়ালীর কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ বলেন- মওলানা এছলামাবাদী ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবগণের কেহ কেহ বলিতেন, তাহার জেলভীতি ছিল। বলা নিস্প্রয়োজন, এ কারণে তিনি কোন মহলে বিশেষ সমালোচনার পাত্রও হইয়াছিলেন। আমারও ধারণা কতকটা সেরূপ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরে জাপানের যোগদানের পর একদিন তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলেন, প্রস্তাব পাশ নয়, বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের সময় সমুপস্থিত। অস্ত্র কোথায় পাইব জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দেন, সেই ভাবনা তিনিই করিবেন। ইহার মাত্র কিছুদিন পর জাপানীদের সহিত যোগসাজশের সন্দেহে বৃটিশ সরকার তাহাকে গ্রেফতার করেন।[১৮]

১৯৪৬ সালে মওলানা এছলামাবাদী জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দু এর প্রার্থীরূপে চট্টগ্রাম থেকে বংগীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হন। কিন্তু তিনি মুসলিমলীগ প্রার্থী আলী আহমদ চৌধুরীর নিকট কয়েক হাজার ভোটে পরাজিত হন। তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হন।[১৯] পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি মনে করতেন মুসলমানে জন্য একটি আত্মঘাতী পরিকল্পনা। তিনি বলতেন, ভারত দ্বিখন্ডিত হলে মুসলমানরাই অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা মুসলমানরা সেই অবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে এক অংশ ভারতে, এক অংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং অপর অংশ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে থাকবে বলে সংহতি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে।[২০]

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি নিজ মাতৃভূমি পূর্ববংগে না এসে কলকাতায় থেকে যান। সেখানে প্রায় দু'বছর থাকার পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ভক্ত ও বন্ধু-বান্ধবের পীড়াপীড়িতে তিনি চট্টগ্রামে আসেন এবং প্রায় ৭৫ বছর বয়সে ১৯৫০ সালের ২৪শে অক্টোবর পরলোকগমণ করেন। তাঁকে কদম মোবারকে নওয়াব ইয়াসিন খাঁর মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়।[২১]

রাজনীতি ও সমাজ সেবার দিক প্রাধান্য লাভ করায় তাঁর সাহিত্য খ্যাতি অনেকটা চাপা পড়ে যায়। 'তুরস্কের সোলতান'-(১৯০৯), 'কনস্ট্রান্টিনোপল'-১৯১২', 'ভারতের মুসলমান সভ্যতা'-(১৯১৪), 'খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া'-(১৯১৫), 'ভারতে ইসলাম প্রচার', 'খগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'আরঙ্গজেব', 'মোসলেম বীরাঙ্গনা', 'ইসলামের উপদেশ', 'সুদ সমস্যা', 'সমাজ সংস্কার' প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। এইগুলো মুসলিম জাতির ঐতিহ্য, ধর্ম, জীবন, ভূগোল, জ্যোতিষ ও সমাজ বিষয়ক। এ ছাড়া 'প্রচারক', 'ইসলাম প্রচারক', 'নবনূর', 'আল-এসলাম', 'হোলতান', হাবলুল-মতিন', 'মোহাম্মদী' ইত্যাদি পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। এসব রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজসেবা, ধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, রাজনীতি ও আযাদী সংগ্রাম বিষয়ক চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার লেখাগুলো ভাবাবেগ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দোষ থেকে মুক্ত এবং প্রগতি ও যুক্তিবাদের মহিমায় সমৃদ্ধ। তিনি বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, তালাকপ্রথা, শরীফ-আতরাফ ভেদনীতি, পীরপূজা, কবরপূজা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করেন।[২২]

আরবীর প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ধর্ম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন এবং এর জন্য চট্টগ্রামে এক খন্ড জমিও খরিদ করেন (আল-এসলাম, আষাঢ়-১৩২৭)। তিনি হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন এবং আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবীদের প্রতি খুবই রুষ্ট ছিলেন। তিনি আরবী শিক্ষিত ও ইংরেজী শিক্ষিত উভয় শ্রেণীর দোষত্রুটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেন। বহুমুখী কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর সুনাম উপমহাদেশের সর্বত্র প্রসার লাভ করে এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন-

মওলানা মরিজ্জমান ইসলামাবাদীও দেশ ও জাতি প্রেম ছিল অকৃত্রিম। তিনি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। সে যুগে আলেম সমাজের মধ্যে এতটা প্রতিভার বিকাশ আর কারুর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নাই। তাঁর 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' শীর্ষক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। সেকালে একাধারে সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণ করছেন, বাঙলায় আলেমদের মধ্যে এমন চারজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মওলানা

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহের কাফী। শুধু সাহিত্যে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, মওলানা ইসলামাবাদী সমাজকল্যাণ সাধনার ক্ষেত্রেও একটি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তা হচ্ছে তাঁর চট্টগ্রাম এতিমখানা।[২৩]

অন্য একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বলেন-

মওলানা এছলামাবাদীর অসাধারণ সংগঠনশক্তি ছিল। তাহার পরিকল্পনাগুলিও হইত নিঁখুত। সমাজের মঙ্গল চিন্তা ছাড়া তাঁহার মনে আর কিছুরই স্থান ছিল না। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রথমদিকে তাহার সহিত হিন্দু-মুসলমান বহু নেতাকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করিতে দেখা যাইত। সারা জীবন দারিদ্র্যের সহিত এমন কঠোর সংগ্রাম করিতে আমি আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অথচ কলিকাতা মাদ্রাসার বহু ছাত্র তাহাদের আহার, বাসস্থান ও আর্থিক সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। মওলানা এছলামাবাদীর বক্তৃতাও হইত খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ। মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়টি মনোনীত করিয়াছিলেন। জীবনের বেশ কয়েক বৎসরই উহাই ছিল তাহার একমাত্র স্বপ্ন। ইহার বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একবার তিনি বার্মায়ও গিয়েছিলেন। বাংলার মুসলমান সমাজ মওলানা এছলামাবাদীর নিকট কত দিক দিয়া ঋণী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না।[২৪]

==========

তথ্য নির্দেশ

১. সৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পা), মওলানা ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম-১৯৮০, পৃ. ৭৯
২. এনামুল হক, মুহম্মদ, মুসলিম বাংলা সাহিত্যে, পাকিস্তান পাবলিকেশনস্, ঢাকা-১৯৬৫, পৃ. ৩১২ – ১৫
৩. নাসির উদ্দীন, মোহাম্মদ (সম্পা), সওগাত, আশ্বিন-১৩৮৩, পৃ. ৪৯০; আত্মজীবনী: পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪ – ১৫
৪. সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৩/১৯২৬ খ্রী. পৃ. ১২০
৫. সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৩/১৯২৬ খ্রী. পৃ. ১২০
৬. সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ -১৩৬৩ /১৯২৬ পৃ.
৭. চৌধুরী আব্দুল হক, চট্টগ্রামের চারিতাভিধান, চট্টগ্রাম-১৯৭৯, পৃ. ১১৩
৮. সওগাত, আশ্বিন-১৩৮৩, পৃ. ৪৯০
৯. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, যুগবিচিত্রা, ঢাকা-১৯৬৭, পৃ. ১১৩
১০. প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ, বাতায়ন, পৃ. ৩৬৩
১১. ঢাকা প্রকাশ, ১ম চৈত্র, ১৩২৬/১৩ মার্চ, ১৮৪২
১২. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, পৃ. ৪৪১
১৩. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা-১৯৫৮, পৃ. ১৩৭
১৪. ঐ, পৃ. ১৪৪
১৫. ঐ, পৃ. ১৩৭;
১৬. সৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পা), মওলানা ইসলামাবাদী, পৃ. ৬৫
১৭. সৈয়দ মোস্তফা জামাল, পৃ. ৮৫
১৮. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, পৃ. ২৭৫
১৯. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, পৃ. ২৭৫
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
২১. আবদুল হক চৌধুরী, পৃ. ৬৮–৭০
২২. শাহেদ আলী, বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান, জিলা কাউন্সিল-১৯৬৫, পৃ. ২০১-২০২
২৩. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, পৃ. ১৩৮
২৪. মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ, পৃ. ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

পীর বাদশা মিয়া

(১৮৮৪ – ১৯৫৯)

মওলানা আবা খালেদ রশীদুদ্দীন আহমদ ওরফে পীর বাদশা মিঞা ছিলেন ফারায়েযী আস্তানার ৫ম গদিনশীন। মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে স্বনামধণ্য হাজী শরীঅতুল্লাহর বংশে ১৮৮৪ সালের ২২মে তাঁর জন্ম। পিতা খানবাহাদুর সাইদুদ্দীন আহমদ (১৮৫৫–১৯০৬ খ্রী.)। মাতা ছিলেন ঢাকার যিন্দাবাহারের জমিদার চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস ওরফে দাদন মিঞার কন্যা। বাদশা মিয়া ১৮৯৮ খ্রী. ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় জামাআতে হাশতুমে (তৃতীয় শ্রেণী) ভর্তি হন। তিনি জামাআতে উলা (বর্তমানে ফাযিল ২য় বর্ষ) পর্যন্ত তথায় অধ্যন করেন। কিন্তু ১৯০৬ সালে পিতৃবিয়োগের কারণে তিনি মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেননি। ১৩১৩ সালের ১ বৈশাখ মুতাবিক ১৯০৬ সালে তিনি ফারায়েযী আস্তানার গদিনশীনরূপে স্থলাভিষিত হন।

১৯০৬ সালের ২৭–২৯ ডিসেম্বর তারিখে নওয়াব সলীমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকার শাহবাগে 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র ২০ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ মাসের ৩০ তারিখে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের এক সভায় 'নিখিল ভারত মুসলিমলীগ' গঠিত হয়। ঐ সভায় বাদশা মিয়া ফারায়েযী আস্তানার প্রধানরূপে যোগদান করেন।[১] ১৯০৭ সালের ১৫ জানুয়ারি মুনশীগঞ্জের (ঢাকা) রেকাবীবাজারে বন্দরে তাঁর অনুগত ও অনুসারীদের উদ্যোগে মুসলিম লীগের সংগঠনকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাদশা মিয়া তাতে ভাষণ দেন।[২]

বাদশা মিয়া খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, সভা-সমিতিতে বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা করেন। তুরস্ক সুলতানের রাজ্য ও তুর্কী খিলাফতকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। ঐ আন্দোলনের দায়ে তাঁকে ১৯২১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এক বছর কারাবরণ করতে হয়। কারামুক্তির পরেও তিনি বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং ইংরেজ শাসনের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলার বিভিন্ন জেলায় সভা-সমিতি করেন। ঐ সময় তিনি 'জমিয়ত-এ-ইলামা-এ-হিন্দ' এর নেতৃবৃন্দের সাথে একযোগে জনসভা করতেন কিন্তু 'জমিয়ত' এর সদস্য তিনি ছিলেন না।[৩]

১৯২৬ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'শুদ্ধি' আন্দোলনের মধ্যদিয়ে অশিক্ষিত মুসলমানদের নানা প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অভিযান চালান। প্রায় একই সময় পাঞ্জাবে ডঃ মুঞ্জেও 'সংগঠন' আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে যুবকদের দৈহিক কসরতের বিভিন্ন ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেন এবং মুসলমানদের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ঐ পরিস্থিতে পাঞ্জাব-কেশরী ড. শায়ফুদ্দীন কিচলু মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করার জন্য 'শুদ্ধি' আন্দোলনের পাশাপাশি 'তানযীম' আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এতে শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের তীব্রতা অনেকটা ব্যাহত হয়।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

লাহোরের রাজপাল নামক জনৈক ব্যবসায়ী নবীজী (স.)-এর কুৎসাপূর্ণ 'রংগীলা রসূল' নামক পুস্তক প্রকাশ করলে মুসলিম উপমহাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে (১৯২৭ খ্রী.)। ঐ সময় বাদশা মিয়াও ঐ পুস্তকের প্রতিবাদ করেন।

১৯২৭ সালের ২ মার্চ বরিশালের পোনাবালিয়া গ্রামে একটি মসজিদের সম্মুখ দিয়ে হিন্দুদের বাদ্য বাজিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তখন বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেড মিঃ ব্লান্ডির আদেশে পুলিশ গুলি চালালে ২০ জন মুসলমান শহীদ হন। ঐ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে বাদশা মিঃা শিবচর বন্দর ও অন্যান্য স্থানে প্রতিবাদ সভা করেন।

১৯২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সিমলা অধিবেশনে ইসলাম বিরোধী সর্দা আইন পাস করা হয় (১৯২৯ খ্রী.)। ঐ বিলে সর্দা আইন অমান্যকারীদের ১ মাস জেল ও ১ হাজার টাকা জরিমানা শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। বাদশা মিঃা প্রাদেশিক মুসলিম সমিতির সভায় যোগদান করে ঐ আইন অমান্য করার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি ঐ আইন ভংগ করে তাঁর মেজো কন্যাকে ফরিদপুরের ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিঃার সাথে বিয়ে দেন।[৫]

১৯৩৫ সালে এ.কে.ফজলুল হক নিখিল বংগ কৃষক-প্রজা পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় প্রজা পার্টি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় বাদশা মিয়া পার্টির পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন। ১৯৩৭ খ্রী. বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির তরফ থেকেও নমিনেশন দিয়ে প্রার্থী দাঁড় করান হয়। পীর সাহেব, শেরে বাংলা ও পার্টির আরো নেতৃবৃন্দ বাংলার বহু নির্বাচন কেন্দ্রে জনসভা করে পার্টিকে জয়যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ফলে বহু সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে সদস্য নির্বাচিত হন।[৬]

১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান ইস্যুর উপর সাধারণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। ঐ নির্বাচন ছিল দশ কোটি ভারতীয় মুসলমানের জন্য অগ্নিপরীক্ষাস্বরূপ। ম.মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সকলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরিহার করে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য মুসলমানদের নিকট আবেদন করেন। তখন বাদশা মিয়াও মুসলানদের জন্য স্বতন্ত্র 'মুসলিম রাষ্ট্র' পাকিস্তান কায়েমের উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্প হন। তিনি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য আবেদন করেন এবং বাংলার বিভিন্ন জেলার বহু কেন্দ্রে জনসভায় বক্তৃতা করে মুসলিম লীগের বিজয়ের পথ সুরাহা করেন। তিনি সিলেটের গণভোট (৬-৭ জুলাই ১৯৪৭ খ্রী.) উপলক্ষে তথায় গিয়ে সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাদশা মিয়া 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' ১৯৪৫ খ্রী. ও নেজামে ইসলাম পার্টির (১৯৫২ খ্রী.) পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন এবং আমৃত্যু ঐ দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সাথে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। পীর বাদশা মিয়া যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেন এবং নিজের অসুস্থতাবশত বড় পুত্র মওলানা মুহসিনুদ্দীন আহমদকে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে বিভিন্ন জেলায় জনসভা করার নির্দেশ দেন।[৮]

আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন (১৯৫৮ খ্রী.)। ঐ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাদশা মিয়া শয্যাশায়ী হয়েও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করেন।

বাদশা মিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে বলা হয়ঃ

মোসলেম বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাদশা মিঞার অবদানের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফারায়েযী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ সাহেবের প্রপৌত্র। উত্তরাধিকার সূত্রেই সে নেতৃত্বের অধিকার তাঁর উপর বর্তাইয়াছিল এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে এবং সে জন্য কারাবরণ করিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্থ হন নাই। তিনি যে হাজী শরীয়তুল্লাহর যোগ্য বংশধর, এই ব্যাপারে তার প্রমাণ মিলিয়াছিল।[৯]

মরহুম বাদশা মিঞার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাফেয মোহসিনুদ্দীন আহমদ দুদু মিঞার জন্ম ১৩২৩ সনের ১০ ফাগুন মুতাবিক ১৯১৭ খ্রী. ২ ফেব্রুয়ারি। তিনি প্রথমে ঢাকার ইসলামিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। পরে ১৩৪২ বাংলা মুতাবিক ১৯৩৬ খ্রী. তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। পরে ১৩৪২ বাংলা মুতাবিক ১৯৩৬ খ্রী. তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হন এবং এক বছরে দাওরায়ে হাদীসের শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন ১৯৪৫ খ্রী.। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ফরিদপুর জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সদস্য হয়েছিলেন। এরপর তিনি মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করে জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম ও নিজামে ইসলাম পার্টিতে যোগদান করেন (১৯৫২ খ্রী.)। ১৯৫৪ খ্রী. তিনি নিজামে ইসলাম পার্টিতে যোগদান করেন (১৯৫২ খ্রী.)। ১৯৫৪ খ্রী. তিনি নিজামে ইসলাম পার্টি হতে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হন।[১০]

পীর বাদশা মিয়ার ইনতিকালের পর তিনি ফারায়েযী আস্তানার ৫ম গদিনশীল হন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রী. তিনি বিরোধী দলের প্রার্থী হয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে চীন ভ্রমণ করেন। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি ঢাকা নগরীর জমিয়ত-এ-উলামা এ ইসলাম-এর বিরাট সম্মিলনে তিনি বিনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' এর সভাপতি মনোনীত হন। তাঁর নেতৃত্বে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[১১]

তথ্য নির্দেশ

১. আবদুল লতীফ শরিফাবাদী, পীর বাদশা মিঞা, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ. ৪০ – ৪১
২. ঐ, পৃ. ৮২
৩. ঐ, পৃ. ১৪৫
৪. ঐ, পৃ. ১৪৪
৫. ঐ, পৃ. ১৪৫
৬. ঐ, পৃ. ৯৬
৭. ঐ, পৃ. ১৪৬
৮. ঐ, পৃ. ১৪৮
৯. আজাদ, ২৮ অগ্রহায়ন-১৩৬৬/১৫ ডিসেম্বর-১৯৫৯
১০. Twenty years of Pakistan, 1947 – 1967, Pakistan Publications, Karachi-1967, P. 774
১১. আবদুল লতীফ শরীফাবাদী, পৃ. ১৭২

মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী

(১৮৯৮ – ১৯৫৯)

মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী যশোর মহকুমার অন্তর্গত কোতোয়ালী থানাধীন এনায়েতপুর গ্রামে ১৮৯৮ সালের ২১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। এ গ্রামটি যশোর শহর থেকে ৭ মাইল এবং মেহেরুল্লাহনগর স্টেশন থেকে ২ মাইল দূরে অবস্থিত।

মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী যশোর জেলার স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। এরপর পিতা আবেদ আলী (মৃ. ১৯৫৬ খ্রী.) তাঁকে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। তিনি একদিকে নিয়মিত ছাত্ররূপে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়তেন আবার অন্যদিকে প্রাইভেটভাবে মওলানা গুল মুহাম্মদ খাঁ ও মওলানা বশীর আহমদের নিকটও বিভিন্ন কিতাবের সবক নিতেন। বেশী দিন তিনি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেননি। ফুরফুরার মওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর নির্দেশে তিনি শরীয়ত প্রচার ও ওয়ায নসীহতে অবতীর্ণ হন।[১]

১৩২৭ সনের ২১ আষাঢ় মুতাবিক ১৯২০ খ্রী. তিনি কলকাতার টিকাটুলি মসজিদে মওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর নিকট আধ্যাত্মিকতার প্রথম সবক গ্রহণ করেন। পীর সিদ্দিকী সাহেব আহমদ আলী এনায়েতপুরীকে বিভিন্ন তরীকার তালীম দেয়ার জন্য নিজের খলীফা মওলানা তাজাম্মূল হুসাইন সাহেবকে নিয়োজিত করেন। ১৩৩০ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯২৩ সালে মওলানা আহমদ আলী তাঁর পীর মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী ও তাঁর খলীফা মওলানা তাজাম্মূল হুসাইনের সাথে একত্রে হজ্জব্রত পালন করেন।[২]

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ থেকে ফিরে এসে মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী পীর সাহেবের নির্দেশক্রমে ১৩৩১ সনের বৈশাখ মুতাবিক ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মরহুম শেখ হাবীবুর রহমান 'সাহিত্যরত্নের' সহযোগিতায় কলকাতা থেকে 'মরিয়ত' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং নিজেই এর সম্পাদনা করেন। এটি ছিল বংগীয় হানাফী সম্প্রদায়ের মুখপত্র তথা 'মোহাম্মদী' (আহলে হাদীস) সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী।

১৩৩২ সালের মাঘ মুতাবিক ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরীর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে পূর্বোক্ত 'শরিয়ত' পত্রিকাটি মাসিক 'শরিয়তে এসলাম' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কুরআন-হাদীসের নির্দেশানুযায়ী মুসলমান সমাজকে পরিচালিত করা। এটি ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী। রাজনীতি ক্ষেত্রে এটি ছিল মুসলিম লীগপন্থী এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবাদী।

মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী ১৯৩৭ সালে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ নির্বাচনে ঝিনাইদহ এলাকা থেকে মুসলিম লীগের টিকেটে সদস্য নির্বাচিত হন।[৩] ১৯৩৪ সালের ১ জানুয়ারি তিনি বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে 'খান সাহেব' খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৩৭ সালের পর কোন এক সময় 'খান বাহাদুর' খেতাবও লাভ করেন।

মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী ১৯৫৯ সালের ১৮ জানুয়ারি রোববার দিবাগত রাত্র সাড়ে চার ঘটিকার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।

==========

তথ্য নির্দেশ

১. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ. ৩২১ – ২২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১-২২
৩. ছুন্নত অল-জামায়াত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ-১৩৪৩/১৯৩৭, পৃ. ১১২

মৌলবী আফসারুদ্দীন আহমদ

(১৮৮৬ – ১৯৫৯ খ্রী.)

কুষ্টিয়া জেলার অন্যতম কৃতি সন্তান মৌলবী আফসারুদ্দীন আহমদ ১৮৮৬ খ্রী. কুমারখালী থানার সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাহতাবুদ্দীন আহমদ। তাঁর ভাই অবিভক্ত বাংলার বিখ্যাত মন্ত্রী ও কৃষক প্রজা পার্টির সেক্রেটারি মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদ নানা দিক থেকে অধিকতর খ্যাতিলাভ করলেও স্বীকার করতে হবে যে, মৌলবী আফসারুদ্দীন আহমদের মত নিঃস্বার্থ কর্মী, বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা, মানব দরদী, সমাজসংস্কারক ও অনলবর্ষী বক্তা ঐ জেলায় খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।[১]

Dhaka University Institutional Repository

মৌলবী আফসারুদ্দীন হুগলী মাদ্রাসার ফাইনাল পরীক্ষা পাস করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কোন চাকরি করেননি, ব্যবসাও পরিচালনা করেননি। প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি আয়ের পথ বেছে নেননি এবং জনসেবার জন্য তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রি করে ফেলেছিলেন। তাঁর মত এমন নিঃস্বার্থ জনসেবক খুব বেশি দেখা যায় না। তিনি কুষ্টিয়ার খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ইসলামী সংস্থার আন্দোলন এবং বাউল বিরোধী 'ন্যাড়ার ফকির খেদা' আন্দোলন করে জনগণের মন এতটা জয় করেছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের দায়ে সরকার কর্তৃক তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার সময় হাজার হাজার মানুষ কুষ্টিয়া বড় স্টেশনের নিকট রেলের উপর শুয়ে পড়ে রেলগাড়ি কয়েক ঘন্টা বন্ধ করে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে বুঝিয়ে তাদের শান্ত করেন।[২]

মৌলবী আফসারুদ্দীন বহরমপুর জেলে অবস্থানকালে কবি নজরুলকে একটি টিয়া পাখী দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কবি নজরুল ইসলাম, দেশবন্ধু সি.আর. দাশ ও তাঁর পত্নী বাসন্তী দেবী, নেতাজী সুভাষ বোস, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সহ বহু বিখ্যাত নেতা তাঁর সুলতানপুর বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তিনি 'ন্যাড়ার ফকির খেদা' আন্দোলন পরিচালনা করে বহু বাউল ফকিরকে ধরে নিয়ে একটা লোহার খুঁটির সংগে বাঁধতেন এবং তাদের লম্বা চুল ও গোঁফ কেটে দিয়ে মুসলমান করতেন। এ সবের কারণে বাউলরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে জনগণ উত্তেজিত হয়ে উঠে। ফলে বাউলরা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়।

তিনি কুষ্টিয়ার 'কুওয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদ্রাসা', সুলতানপুর মাহতাবুদ্দীন হাই স্কুলসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ নির্মান করেন। মুসলমানরা এক সময় দুধ, মাছ বিক্রি করা, চুলকাটা, কাপড় ধোয়ার কাজ ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করতে চাইতো না। কিন্তু মৌলবী সাহেবের চেষ্টায় বহু লোক এসব পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করে।[৩]

কুষ্টিয়া জেলার এই কৃতী সন্তান ১৯৫৯ সালের ২৯ জানুয়ারি সুলতানপুরের নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র মোহাম্মদ সালাহুদ্দীন আহমদ একজন সমাজ সেবক (মৃ. ১৯৯৫) এবং জামাতা ব্যারিস্টার মুহাম্মদ আবদুল হক একজন রাজনীতিবিদরূপে পরিচিত।

==========

তথ্য নির্দেশ

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্ব বঙ্গীয় রাজনীতিক উলামার জীবনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৫২
২. ঐ, পৃ. ১৫২
৩. ঐ, পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আগা মুঈদুল ইসলাম

(১৮৬৩ – ১৯৩০)

রাজনৈতিক কারণে ইরান থেকে বিতাড়িত এই মহাপুরুষ ১৮৯০ সালে ২৭ বছর বয়সে কলকাতায় উপনীত হন। এখানে কিছুদিন ধর্মপ্রচার আর কিছুদিন ব্যবসা করার পর ইরানের কাজার বংশীয় শাহদের একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারের অবসান এবং মুসলিম এশিয়ার দেশসমূহ, বিশেষত ইরানের উপর থেকে ইউরোপীয় প্রভাব ও হস্তক্ষেপ নিবারণের উদ্দেশ্যে তিনি শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতার পেশা বেছে নেন এবং ১৯৩০ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত সাংবাদিকতায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি বাংলাকেই স্বদেশরূপে গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ ৪০টি বছর বাংলার মাটিতে অতিবাহিত করেন। তিনি তাঁর বলিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও লেখনি ধারার মধ্য দিয়ে একদিকে ইরানের কাজার বংশীয় দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে তাঁর দেশকে ইউরোপীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করেন এবং গণতন্ত্রের দ্বার উদঘাটন করেন, আবার অন্যদিকে বাংলার রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন। এখানকার মুসলিম সমাজের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কার সাধনের কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁর 'হাবলুল মতীন'-এর ফার্সী সংস্করণ, ইংরেজী সংস্করণ ও বাংলা সংস্করণে সেগুলো ফলাও করে বর্ণনা করেন।

ড. মোহাম্মদ আবুল কাসেম মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় 'মরুহম আগা মুঈদুল ইসলাম" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেনঃ

ভারতের বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক কথাঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, মওলানা মুহাম্মদ আলী প্রভৃতি মহাশয় ব্যক্তিগণ তাঁর নিকট গিয়ে নানা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করতেন। রাজনীতি মহলে তিনি 'রাজনীতিক ভবিষ্যদ্বক্তা' নামে পরিচিত ছিলেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে এবং ইংরেজ ও ফরাসী কর্তৃক রাশিয়ার বলশেভিক দমনের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি যে সকল মতামত প্রকাশ করেছিলেন, কার্যত তা যথার্থ বিবেচিত হয়েছে। প্রকৃতই তিনি ইসলামের শক্তি সম্পন্ন খুঁটি সরূপ ছিলেন। তিনি জীবনব্যাপী প্রাচ্যের মুক্তি কামনা করে গেছেন। তিনি প্রায়শঃ বলতেন- ইসলামের মুক্তির অর্থ প্রাচ্যের মুক্তি এবং প্রাচ্যের মুক্তির অর্থ ইসলামের মুক্তি।[১]

আগা মুঈদুল ইসলাম বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম নেতৃবর্গের নেতৃত্ব দিতেন এবং তাঁর বাসভবনেই ঐতিহাসিক 'হিন্দু-মুসলিম' প্যাক্ট (১৯২৩ খ্রী.) রচিত হয়েছিল এ বিষয়ে বাংলার প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ বলেনঃ

কতটা সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে সে সময় কলিকাতায় এরূপ একটি গুজব প্রচারিত ছিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ শাসমল, জনাব মুজিবর রহমান, আগা মুঈদুল ইসলাম এবং আরও দুই-একজন একদা সন্ধ্যায় শেষোক্ত নেতার বাড়িতে বসিয়া উক্ত চুক্তিপত্রটি রচনা করেন। স্বেচ্চাচারী পারস্য সরকারের কূটনৈতিক পদত্যাগ করিয়া আগা মুঈদুল ইসলাম কলিকাতায় স্ব-আরোপিত নির্বাসন জীবন-যাপনের সময় কোন কোন ব্যাপারে শুধু যে এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গকে নেতৃত্ব দান করিতেন তাহা নয়, উপরন্তু তাঁহার বিখ্যাত 'হাবলুল মতীন' পত্রিকার সাহায্যে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। দেশবন্ধু দাশ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।[২]

Dhaka University Institutional Repository

আগা মুঈদুল ইসলাম ১৮৬৩ খ্রী. ইরানের অন্তর্গত কাশান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নামঃ সৈয়দ জালালুদ্দীন হুসাইনী। আহমদ শাহ কাজার (১৯০৯ – ১৯২৫ খ্রী.) ইসলামের সহায়তাদানের জন্য তাঁকে 'মুওয়াইয়েদুল ইসলাম' (ইসলামের সহায়ক) খেতাবে ভূষিত করেন।[৩] কিন্তু নামটি বাংলাদেশে বিকৃত হয়ে 'মুঈদুল ইসলাম'-এ পরিণত হয়েছে। এই নামেই তিনি পরিচিত হন। মুঈদুল ইসলামের পিতা ছিলেন সৈয়দ মুহম্মদ রেযা কাশানী। তিনি পারস্যের বিখ্যাত 'মুজতাহিদ' তথা ধর্মীয় গবেষক ছিলেন। ত্যাগ আর ধর্মীয় সেবাই ছিল ঐ বংশের প্রধান গৌরব। মুজতাহিদের পুত্র হয়েও আগা মুঈদুল ইসলাম কেবল ধর্মীয় বিদ্যায় নয়, বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সহকারে আইন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করেন। কাশান শহরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে পিতার মৃত্যুর পর তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ইস্পাহান নগরে যান।[৪]

সে সময় ইস্পাহান নগর ছিল সর্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। সেখানে ৫ বছর কঠোর সাধনাপূর্বক আগা মুঈদুল ইসলাম সর্ববিধ ইসলামী শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করে দেশে ফিরে এলেন। এরপর কবি শেখ সা'দীর ন্যায় পর্যটনে বের হন এবং তেহরান, খোরাসান, আসতারাবাদ, হামাদান ইত্যাদি নগর ভ্রমণ করে সর্বশেষে তিনি মেসোপোটেমিয়ায় উপনীত হন। সেখানকার ধর্মপ্রচারক মির্যা হাসান শীরাযীর সাহচর্যে কিছুকাল আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে বন্দর আব্বাস হয়ে আবার পারস্যে ফিরে আসেন।[৫]

ঐ সময় প্রখ্যাত প্যান ইসলামী নেতা জামালুদ্দীন আফগানীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। কিছুকাল আগা সাহেব তাঁর সাথে থেকে তাঁর শিষ্য হন। তারপর তিনি পারস্য উপকূলীয় উম্মন শহরে যান। সেখানে মির্যা আলী আসগর সাহেবের কাছে তথাকার রাজনৈতিক অবস্থা থেকে সম্পর্কে তিনি একটি পত্র লিখেন। ওখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। ঐ সময় পারস্যের কাজার বংশীয় নাসিরুদ্দীন শাহের একনায়কত্বমূলক শাসন চলছিল। তিনি ছিলেন বৃটিশ ও রুশ সরকারের প্রভাবাধীন। ইউরোপীয় দেশসমূহের সাথে অসম চুক্তির ফলে ইরানের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। বৃটিশ ও রুশ শাসকগণ পারস্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন এবং পারস্য বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সময় তারা ইরানের সীমারেখায় সামরিক অভিযানও চালাতেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় শাহের কোন ক্ষমতাই ছিল না। অথচ তিনি দেশবাসীর প্রতি স্বৈরাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আযাদীর কথা কেউ উচ্চারণ করলেই তাকে হত্যা বা জেল দ্বীপান্তরের আদেশ দেয়া হতো। এ অবস্থায় জামালুদ্দীন আফগানী, আগা মুঈদুল ইসলাম, প্রিন্স মালেকোম শীরাযী, হাজী শায়খ হাদী নাজমাবাদী প্রমুখ দেশবাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের পথে এগুতে থাকেন।[৬] শেষ পর্যন্ত তাঁরা কাজার বংশীয় শাসনের (১৭৭৯ – ১৯২৫ খ্রী.) অবসান ঘটান এবং পাহলবী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২৫)।

নাসিরুদ্দীন শাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে আগা মুঈদুল ইসলাম পারস্য গভর্নমেন্টের কোপানলে পড়েন এবং দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি নির্বাসিত হয়ে বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেংগুন,

Dhaka University Institutional Repository

পেনাং, সিংগাপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে ১৮৯০ সালে কলকাতায় উপনীত হন এবং জীবন সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে বসবাস করতে মনস্থ করেন।[৭]

আগা মুঈদুল ইসলাম সাহেব কলকাতায় কিছুদিন ধর্মপ্রচার করেন, আবার কিছুদিন ব্যবসায়ও রত ছিলেন। অবশেষে সাংবাদিকতাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি কলিকাতা থেকে ফার্সী সাপ্তাহিক 'হাবলুল মতীন' (দৃঢ় রজ্জু) প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং এর প্রকাশক, পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন। এর পূর্বে তিনি তাঁর গুরু জামালুদ্দীন আফগানী ও ইংল্যান্ডে নিযুক্ত পারস্য দূত মালেকোম খানের সাথে একযোগে ইরানে পূণর্জাগরণ ও রেনেসাঁ আনয়নের উদ্দেশ্যে লেখনী পরিচালনা করছিলেন। তিনি এবং তাঁর সহযোগী মালেকোম খান উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতীয় জীবনে গঠন ও বিপ্লব সাধনের জন্য নির্ভীক ও সংবাদপত্রের প্রয়োজন। তাই একযোগে লন্ডন থেকে পিন্স মালেকোম খান কর্তৃক ইংরেজী 'কা' নাম এবং আগা মুঈদুল ইসলাম কর্তৃক কলকাতা থেকে ফার্সী 'হাবলুল মতীন' প্রকাশ করা হয়। মালেকোম খানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে 'কা'নাম পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 'হাবলুল মতীন' পত্রিকাটি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বছর বহাল থাকে, পারস্য সন্তানদের বুকে জাতীয়তার মশাল জ্বালিয়ে রাখে এবং বাংলা তথা উপমহাদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। পারস্য যখন রাশিয়ার আক্রমণ ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হচ্ছিল, তখন 'হাবলুল মতীন' পত্রিকাটি পারস্যবাসীদেরকে জীবন্ত ও সজীব রেখেছিল। এজন্যই আগা মুঈদুল ইসলামকে পারস্যের 'বিসমার্ক' (জার্মান রাজনীতিবিদ ও জাতীয় জাগরণের নায়ক) বলা হয়।[৮] ইরানের মসজিদে ইমামগণ মিম্বরে দাঁড়িয়ে আগা মুঈদুল ইসলামের সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধসমূহ পাঠ করে শুনাতেন এবং জাতীয় চেতনা সঞ্চার করতেন।[৯] প্রধানত তাঁর লেখনী ধারার বদৌলতেই কাজার বংশের বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধিত হয় এবং পাহলবী শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নব্য গণতান্ত্রিক ইরান জন্মলাভ করে।

হাবলুল মতীন-এর প্রচার বাংলা ও ইরানে সীমাবদ্ধ ছিল না, আফগানিস্থান এবং তুরস্কেও এ পত্রিকাটি ব্যাপকভাবে পঠিত হতো।

ত্রিপলি ও বলকান যুদ্ধের সময় (১৯১১-১৩ খ্রী.) আগা মুঈদুল ইসলাম মুসলিম জাহানে, বিশেষ করে বাংলাদেশে সাড়া জাগাবার উদ্দেশ্যে তাঁর 'হাবলুল মতীন' এর একটি সাপ্তাহিক ইংরেজী সংস্করণ এবং একটি দৈনিক বাংলা সংস্করণ কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল 'প্যান ইসলাম' মতবাদ প্রচার করা। আগা মুঈদুল ইসলাম স্বয়ং প্যান ইসলামবাদী ছিলেন। তাই দুটি পত্রিকার সম্পাদনার জন্য বেছে নিলেন আরো দু'জন প্যান ইসলামবাদী ড. আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী ও মওলানা মনিরুজ্জমান এছলাবাদীকে। ইংরেজী সংস্করনের সম্পাদক ছিলেন ড. আব্দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী এবং বাংলা দৈনিকটির সম্পাদনা করতেন মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী। ড. আব্দুল গফুর চৌধুরী এছলামাবাদীর সহায়তা করতেন। এ সংস্করণ দু'টি যুদ্ধ থাকার পর আগা সাহেব বন্ধ করে দেন। দৈনিক বাংলা সংস্করণটি ছিল সম্ভবত মুসলিম বাংলার সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী প্রমুখ আলিমের উদ্যোগে মুসলিম সমাজের মধ্যে জাগৃতি, বিশেষত হানাফী ও আহলে হাদীস উলামা সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁদের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে ১৯১৩ সালে 'আনজুমান-এ-উলামা-এ- বাংলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। হাবলুল মতীন এর ইংরেজী সংস্করটিতে 'আনজুমান'-এর খবরাখবর ফলাও করে বর্ণনা করা হয় এবং মুসলিম বাংলার শিক্ষা, ঐক্য ও ধর্মীয় সংস্কার সাধনের গুরুত্ব আরোপ করে এর একটি সংখ্যায় বলা হয়–

The Moslems constitute more than one half of the population in the province of Bengal. But they cannot be said to weild that influence and power which their numerical strength shuld entitle them. this is due to the fact that education has not yet made such progress in our community. It can also, be attributed to the fact that there is no such spirit of cohesion among the Moslems in Bengal as in the other provinces. the vast majority of the moslems of Bengal profess the Islamic religion but have not imbued the spirit of the true faith. It is, for this reason, that an active religious propagand is necessary for the social, moral and civic advancement of our community in this province.

It is, therefore, the duty of every Moslem to extend his zealous support to the Anjuman-i-Ulam-i-Bangala, which has been started for mission work in the cause of our true faith in Bengal.[১০]

আগা মুঈদুল ইসলাম হাবলুল মতীন ছাড়া 'মিফতাহুল যফর' নামে আরো একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১৮৯৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন এবং উপমহাদেশের উপকারার্থে এই পত্রিকাটির ইংরেজী ও উর্দু সংস্করণ বের করেন।[১১]

পূর্বেই বলা হয়েছে, আগা মুঈদুল ইসলাম স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হলেও স্বদেশের অদৃষ্ট নিয়ামকের গৌরবময় আসন থেকে তিনি কোন সময় বিচ্যুত হননি। পারস্যের বিলাস-পরায়ণ ও ইন্দ্রানী সুখান্বেষী কাজার বংশীয় আহমদ শাহ (১৯০৯ – ১৯২৫ খ্রী.) কে যে গণবিপ্লব সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন, তাঁর অন্যতম প্রধান স্রষ্টা ছিলেন আগা মুঈদুল ইসলাম। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, কাজার বংশের অবসানের পর পাহলবী বংশের রেযা শাহ কবীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে আগা সাহেব তাঁর প্রতিও পুরোপুরি সমর্থন দিতে পারেননি। কারণ তিনি স্বদেশে সাধারণতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য তিনি 'হাবলুল মতীন' পত্রিকায় রেযা শাহ পাহলবীর কোন কোন অনুসৃত নীতির ঘোর সমালোচনা করেন।[১২]

এহেন অবস্থায় রেযা শাহ আশংকা করেছিলেন যে, হাবলুল মতীন এর সম্পাদকে কলকাতা থেকে বের করে যদি নিজ দেশে এনে তাঁর শাসন বিরোধী কর্মতৎপরতা বন্ধ না করা হয়, তবে ইরানে আবার বিপ্লব উপস্থিত হবে। এই মনস্তাপ নিয়ে তিনি তদানীন্তন ভারত সরকারের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগও করেছিলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হয়নি। তিনি তাঁর নীতিতে অটল থাকেন এবং কলকাতায়ই আজীবন বসবাস করেন।[১৩] ভারত সরকার কয়েকবার হাবলুল মতীন এর নীতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু আগা মুঈনুল ইসলাম নীতিতে বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা দেশত্যাগ শ্রেয় মনে করে ভারত ত্যাগের সংকল্প করেছিলেন।[১৪] তবে শেষ পর্যন্ত কলকাতার মাটিতেই টিকে রইলেন।

ভাগ্যের পরিহাস, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং চক্ষুকে অতিশয় কাজে লাগাবার ফলে তিনি মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বেই অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু সাংবাদিকতা ত্যাগ করেননি। তাঁর মেয়েরা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অধিকারী। তাঁরা পিতাকে সাংবাদিকতার কাজে সহায়তা করেন। এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ ১৯৩০ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর ম্যাকলিয়ড স্ট্রীটস্থ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন।[১৫] তাঁর লাশ মমি করে কলকাতার গার্ডেন রীচে রাখা হয় এবং তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে ১৯৩১ সালের ১১ নভেম্বর ইরানের রেযা শাহ পাহলবী কর্তৃক তা উড়োজাহাজযোগে ইরানে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৬] আগা মরহুমের ভাবগুরু জামালুদ্দীন আফগানীর অন্তিম দশাও এমনটি হয়েছিল। আফগানী তাঁর জীবনের শেষ আশ্রয়ভূমি তুরস্কে ইন্তিকাল করেন ১৮৯৭ সালের ৯ মার্চ। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে আফগান বাদশাহ যহীর শাহ কর্তৃক তাঁর মমিকরা লাশ তুরস্ক থেকে কাবুলে নীতি হয় এবং ১৯৪৫ সালের দোসরা জানুয়ারি কাবুলের শহরতলি আলী আবাদের নিকট তাঁকে পুনঃদাফন করা হয় এবং তাঁর সমাধি নির্মাণ করা হয়।[১৭]

==========

তথ্য নির্দেশ

১. আবুল কাসেম, মাসিক মোহাম্মদী, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা, মাঘ-১৩৩৭/১৯৩০, পৃ. ২৫৭
২. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, পৃ. ১৯৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
৪. আবুল কাসেম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
৫. ঐ।
৬. সৈয়দ আসগর আলী শাহ্ জাফরী, তারিখ-এ-ইরান (উর্দু), উর্দু বাজার, লাহোর-১৯৬৭, পৃ. ৭১৮ – ৭২০
৭. আবুল কাসেম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
৮. ঐ।
৯. The Mussalmans, Friday December-19, 1930
১০. Ibid.
১১. The Hablul Matin, Calcutta, December-1, Page. 192
১২. Ibid, 15, P. 1915
১৩. আবুল কাসেম, প্রাগুক্ত।
১৪. সওগাত (সম্পাদকীয়), ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-১৩৩৩/৯২৬, পৃ. ১২০
১৫. সওগাত (সম্পাদকীয়), ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-১৩৩৩/৯২৬, পৃ. ১২০
১৬. মোহাম্মদী, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাগুন-১৩৩৮/১৯৩১
১৭. ওহীদ, মুহাম্মদ, মির্যা (সম্পা.), দায়েরা-এ-মাআরিফ-এ-ইসলামিয়া, ৭ম খন্ড, লাহোর-১৯৭১, পৃ. ৩৭৭–৭৮

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আবদুল জাব্বার ওহীদী

(১৯০৬ – ১৯৪৬ খ্রী.)

গণ্যমান্য ও বিত্তশালী আবদুর রহীমের স্বনাম-ধন্য পুত্র মওলানা আবদুল জাব্বার ওহীদী বিহার প্রদেশের গয়া জেলার অন্তর্গত বাগীবাড়িয়া গ্রামে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন বিহার শরীফের আযীযিয়া মাদ্রাসায়। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন লাহোরে। 'মৌলবী ফাযিল' সনদ লাভ করেন লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে। তিনি সেখানে ইংরেজী শিক্ষা করেন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাশেষে পাটনায় 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদকরূপে মওলানা ওহীদীর কর্মজীবন তথা সাংবাদিক জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি সেখানকার দু'টি মাসিক পত্রিকা 'নিগার' ও 'বাহার'-এর সম্পাদনা করেন (১৯৩১ – ৩২ খ্রী.)।[১]

কর্মজীবনের ২য় পর্বে ১৯৩২ সালে মওলানা ওহীদী পাটনা ত্যাগকরে কলকাতায় আগমন করেন এবং মওলানা আবদুর রাযযাক প্রতিষ্ঠিত (কলকাতা ১৯৩১ খ্রী.) 'দৈনিক হিন্দ'-এর সম্পাদনা পরিষদে যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে তিনি স্বয়ং কলকাতা থেকে 'দৈনিক যামানা' প্রকাশ করেন এবং জামীল মাযহারী এম.এ. সহ যুগ্মভাবে এর সম্পাদনা করেন। পাঁচ বছর চলার পর অনিবার্য কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় (১৯৪০ খ্রী.)। জীবনের শেষ অধ্যায় মওলানা ওহীদী কলকাতার 'দৈনিক আসর-এর জাদীদ' (উর্দু) এর সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৯৪০–৪১ খ্রী.)। পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি 'দৈনিক আজাদ' এর পাশাপাশি পাকিস্তান আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর এই অবদানের জন্য তাঁর নাম ও 'আসর-এ-জাদীদ' উভয়ই পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।[২]

১৯৪৫ – ৪৬ সালে পাকিস্তান আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। তখন 'আসর-এ জাদীদ' ছিল বংগের সর্বাধিক জনপ্রিয় উর্দু দৈনিক। সে সময় আমি কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়ায় অধ্যয়নরত ছিলাম। থাকতাম ইলিয়ট হোস্টেলে। হোস্টেলের শতকরা ৯৮ জন ছাত্রই মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিল। ভোর হলেই আমরা 'আসর-এ-জাদীদ' পত্রিকা পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম।

মওলানা ওহীদী শিক্ষা শেষে সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে জড়িয়ে পড়েন। বিহারে থাকাকালে অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক অন্যান্য নেতার ন্যায় তিনিও কংগ্রেসপন্থী ছিলেন এবং কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালে কলকাতায় আগমনের পর তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিবর্তন ঘটে। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে 'মুসলিম লীগ'এ যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ – ৩৭ সালে প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনলগ্নে লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলিম লীগের যথেষ্ট সহায়তা করেন। ১৯৩৭ সালে মুসলিমলীগ পুনর্গঠিত হলে মৌলবী মুহাম্মদ উসমান কলিকাতা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি এবং মওলানা ওহীদী জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের ১৯ আগস্ট শাহাদত বরন করার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মওলানা ওহীদী ঐ পদে বহাল ছিলেন এবং 'আসর-এ-জাদীদ' এরও সম্পাদক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশকে স্বায়ত্ত শাসন দেয়ার লক্ষ্যে ইংলেন্ডের প্রধানমন্ত্রী মি.এটলী ১৯৪৬ সালের ২৭ মার্চ ভারতে তিন সদস্য বিশিষ্ট এক ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেন। ১৬ মে মন্ত্রী মিশন তাঁদের প্রস্স্থাব ঘোষণা করেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে তা মেনে নিতে অনুরোধ করেন। ক্যাবিনেট মিশন বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করেন। ৬ জুন মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা মেনে নেন এবং "স্বাধীন পাকিস্স্থান প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য" - সে কথাও একই সাথে ঘোষণা করেন। কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন শাসন পরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করে। অথচ নতুন কেন্দ্রীয় সংবিধান রচনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় অংশগ্রহণে রাজী হয় (২৬ জুন)। বড়লাট ওয়াভেল অঙ্গীকার করেছিলেন যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে কোন একটি দল ক্যাবিনেট পরিকল্পনা মেনে নিলেই তিনি তা বাস্স্থবায়ন করবেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞানুসারে মুসলিমলীগকে নিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন করেননি। ঐ পরিস্থিতিতে লীগ বৃটিশ প্রস্স্থাব উপেক্ষা করে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট তারিখে সরাসরি ব্যবস্থা (Direct Action) দিবস পালনের সিদ্ধান্স্থ গ্রহণ করেন। ঐ দিন কলকাতার সর্ববৃহৎ মনুমেন্ট ময়দানে মুসলিমলীগের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মওলানা ওহীদীও ভাষণ দেন। ওটাই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ বক্তৃতা। ঐ দিন কলকাতায় ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ঐ দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক নিহত ও আহত হয়।[৩]

১৯ শে আগস্ট (১৯৪৬ খ্রী.) মওলানা ওহীদী কলকাতার চুনাগলিস্থ 'আসর-এ-জাদীদ' এর অফিস থেকে মুসলিম মুজাহিদদের সাহায্যার্থে ৮নং যাকারিয়া স্ট্রীটস্থ মুসলিমলীগের অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক গোরা সৈন্যের গুলিতে তিনি শহীদ হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁকে স্থানীয় মানিকতলার নাখোদাবাগে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে সালেম ওহীদী ও এক কন্যা নাজমা খাতুনকে রেখে যান।

মওলানা ওহীদী 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁর পরামর্শেই মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী, মওলানা রাগের আহসান, মওলানা কাজী সৈয়দ মুহম্মদ গুফরান বরকতী প্রমুখ কংগ্রেসপন্থী 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ হিন্দ' এর বিকল্পস্বরূপ সর্বভারতীয় 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' গঠনের জন্য কলকাতার এক বৈঠক আহবানের সিদ্ধান্স্থ গ্রহণ করেন। ঐ বৈঠক ১৯৪৫ সালের ১১ জুলাই তারিখে কলকাতার মাছুয়া বাজারস্থ মওলানা ওহীদী প্রতিষ্ঠিত 'মারকায-এ-আতফাল' (শিশু পালন কেন্দ্র) ভবনে মওলানা আযাদ সুবহানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে 'সর্বভারতীয় জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' গঠিত হয়। ঐ বছর ২৬–২৯ নভেম্বর কলকাতার মুহাম্মদ আলী পার্কে মওলানা আবদুল হাই ফুরফুরীর সভাপতিত্বে 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' এর উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মওলানা ওহীদী মুসলিম লীগের সমর্থনে জোরালো ভাষন দেন। ঐ সভায় মওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানীকে সভাপতি, শামস কুরায়শীকে সেক্রেটারি ও মওলানা ওহীদীকে জয়েন্ট সেক্রেটারী মনোনীত করা হয়। মওলানা ওহীদী একজন নিঃস্বার্থ দেশ সেবক ছিলেন। ২য় মহাযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৩ সালে বাংলায় ভীষণ

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ ঘটে। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়। ঐ সময় তিনি খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর পরামর্শে বাংলার মুসলমানদের সাহার্থে 'মুসলিমলীগ সেন্ট্রাল রিলিফ অর্গানাইজেশন' গঠন করেন এবং কাজী সৈয়দ গুফরান বরকতী ও অন্যান্য সহযোগিকে নিয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মওলানা ওহীদী ঐ রিলিফ সংগঠনের প্রধান সংগঠক ছিলেন। তিনি তাঁর স্বরচিত 'খিদমাত' (উর্দু) শীর্ষক পুস্তিকায় (পৃ. ২৪) তাঁর ঐসব কর্মকান্ডের বিবরণ দেন। ঐ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নক্লিষ্ট মুসলিম শিশু-কিশোরদিগকে হিন্দু আশ্রমে আশ্রয় নিতে দেখে দুঃখবোধ করেন। কারণ তাদেরকে সেখানে শুদ্ধির মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চলছিল। ঐ শিশু-কিশোরদের হিন্দু আশ্রমের খপ্পর থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মওলানা ওহীদী কলকাতার মাছুয়া বাজারে মারকায-এ- আতফাল (শিশু-কিশোর কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের প্রচেষ্টা চালান। দুর্ভিক্ষে জর্জরিত ও অনাহারক্লিষ্ট মুসলমান স্ত্রীলোকদের মান-ইয্যত রক্ষার মানসে মওলানা ওহীদী কলকাতায় 'দারুল আমান' নামক আরো একটি সেবা সংস্থা স্থাপন করেন। শেষোক্ত সংস্থা দুটির সেক্রেটারি ছিলেন মওলানা কাজী গুফরান। তিনি ও মওলানা ওহীদী এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মাধ্যমে দারিদ্র-পীড়িত ও অন্নকষ্টে আপতিত মুসলমানদের যথেষ্ট সেবা করেন। এছাড়া মওলানা ওহীদীর নেতৃত্বে ও ডঃ নুমান যায়দীর সহযোগিতায় ঐ সময় (১৯৪৩ খ্রী.) দীনহীন মুসলমান ছাত্রদের সহায়তাকল্পে কলকাতায় 'দারুত তুলাবা-এ-ইসলামিয়া' নামক আরো একটি সংস্থা স্থাপিত হয়।[৪]

==========

তথ্য নির্দেশ

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

২. ঐ, পৃ. ২৩৯

৩. ঐ, পৃ. ২৪০

৪. ঐ, পৃ. ২৪০

মওলানা হাকীম আবদুর রউফ দানাপুরী

(১৮৬৬ – ১৯৪৮)

মওলানা হাকীম আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী বিহার প্রদেশের পাটনা সংলগ্ন দানাপুর শহরের শাহটুলি মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] পিতা আবদুল কাদের শিক্ষিত লোক ছিলেন। আবদুর রউফ দানাপুরী ছিলেন ইতিহাস বিখ্যাত আলিম মাখদুমুল মূলক বিনইয়াহইয়া মানেরীর (১২৬৩ – ১৩৮১ খ্রী.) নবম বংশধর। দানাপুরের শাহ আকবরের নিকট কুরআন পাঠ ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি প্রথমে আরা জেলায়, তারপর উড়িষ্যা প্রদেশের কটকস্থ দারুল উলূম মাদ্রাসা থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করেন। এরপর লখনৌ মাদ্রাসায় আরবী ভাষা, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুদিন গবেষণারও কাজ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৭ সালে মওলানা দানাপুরী কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় রমযানিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন এবং শিক্ষকতার পাশাপাশি ৯২/২ নং চুনাগলীতে একটি তিব্বী দাওয়াখানা খুলে ইউনানী চিকিৎসাও চালিয়ে যান। চিকিৎসা পেশায় থেকেও তিনি ধর্মীয় জটিল প্রশ্নসমূহের এমন যুক্তিভিত্তিক উত্তর দিতেন, যেগুলো নিঃসঙ্কোচে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হতো। এতে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি শিক্ষকতা ও চিকিৎসা পেশায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারলেন না। রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করেন।[২]

হাকীম দানাপুরী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর দুশমন ছিলেন। ১৯১৬ সাল থেকে তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আযাদী আন্দোলনে শরীক ছিলেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯২১ সালে তিনি সি.আর.দাশ ও অন্যান্য নেতার সাথে গ্রেফতার হন এবং ৬ মাস কারাবরণ করেন। তিনি কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবক কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক ছিলেন। কোর্টে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন বলে 'বিদ্রোহী মওলানা' নামে অভিহিত হন। (ওয়ালিউল্লাহ, মোঃ, যুগ বিচিত্রা, ঢাকা-১৯৬৭, পৃ. ১২৯) তিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সদস্য এবং দীর্ঘকাল কলিকাতা খিলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন।[৩]

১৯২২ সালে গয়ার বিভিন্ন স্থানে একাধারে কংগ্রেস, খিলাফত এবং 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা দানাপুরী ছিলেন জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ আয়োজিত অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতিরূপে ঐ অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ দেন, তা ঐতিহাসিক গুরুত্বের অধিকারী। ১৯২৫ সালে দিল্লীর জামেআ-এ-মিল্লিয়ার বার্ষিক সভায় হাকীম সাহেব 'ইসলাম আওর মুদুনী মাসায়েল' (ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা) শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তা বুদ্ধিজীবী মহলে প্রশংসা লাভ করে। মওলানা আবুল কালাম আযাদ ঐ প্রবন্ধ পাঠ করে হাকীম সাহেবকে এক পত্রে বলেন, এই প্রবন্ধটি সাধারণ লোকের চাইতে আলিমদের জন্য অধিকতর পথপ্রদর্শক।

কংগ্রেস দলে থেকে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়লে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে মওলানা দানাপুরীর মতানৈক্য শুরু হয়। অবশেষে ১৯৩৩ সালে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। পরবর্তী সময় তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আজীবন ঐ পদে বহাল ছিলেন। তিনি 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' এর সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ- হিন্দ' এর সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলামে' যোগদান করেন।[৪]

এছাড়া মওলানা দানাপুরী বাংলার 'বোর্ড অব ইউনানী ফ্যাকালটি' ও 'আনজুমান-এ-অতিব্বা-এ-বাংগালা-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন।

ধর্ম, রাজনীতি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে মওলানা দানাপুরীর ৫০টি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'আসাহ-হুস-সিয়ার' (উর্দু) নামক রচনাটি নবীচরিত বিষয়ে একটি উচ্চ মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত। অনেকের মতে এ বিষয়ে এর চাইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়নি। কলিকাতা মাদ্রাসায় 'মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন' ডিগ্রী ক্লাসে পড়ার সময় আমি নবীচরিত ও হাদীস বিষয়ে এই গ্রন্থ থেকে অনেক সাহায্য গ্রহণ করেছি। এ গ্রন্থ রচয়িতার সাথে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত্র ১ টার সময় হাকীম দানাপুরী কলকাতায় ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এবং মানিকতলায় পেশাওয়ারী কবরস্থানে সমাধিস্থ হন।[৫]

==========

তথ্য নির্দেশ

১. মুহম্মদ আসরারুল হক, তারীখ-এ-আতিব্বা-এ-বিহার ১খ, পাটনা-১৯৮০, পৃ. ৭২–৭৫
২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ. ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ৪৫৩
৩. আসরারুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩
৪. সুলায়মান নদভী, ইয়াদ-এ-রাফ্তেগান, আযমগড়-১৯৮৬, পৃ. ৩৬৪
৫. আসরারুল হক, পূর্বোক্ত।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ

(১৮৮৮ – ১৯৫৮)

মূল নামঃ মুহীউদ্দীন আহমদ; কবি নামঃ আযাদ; উপাধিঃ আবুল কালাম (বাগ্মী)। জন্মঃ মক্কা শরীফ। তাঁর পূর্বপুরুষ বাবরের শাসনামলে হিরাত থেকে ভারতে (কসুর, পাঞ্জাব) আসেন। আযাদের পিতা খায়রুদ্দীন অল্প বয়সে পিতার স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হন এবং নানা মওলানা মুনাওয়ারুদ্দীনের গৃহে লালিত-পালিত হন, যিনি মোগল যুগে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুনাওয়ারুদ্দীনের মৃত্যু হলে আযাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দীন (মৃ. ১৯০৯ খ্রী.) ২৫ বছর বয়সে ১৮৫৭ খ্রী. পূর্বে মক্কা শরীফে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মিসরে প্রকাশিত ১০ খন্ড বিশিষ্ট একটি বই লিখে আরবী সাহিত্যের একজন পণ্ডিত বলে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি একজন পীরস্থানীয় লোক ছিলেন। ভারত ও বহির্ভারতে তাঁর অনেক মুরীদ ছিল। তিনি মদীনার মুহাম্মদ যাহের আল-ওয়াতরীর কন্যা আলিয়া কে বিয়ে করেন, যিনি আরবীর একজন বিশিষ্ট পন্ডিত ছিলেন।[১]

মওলানা আবুল কালাম আযাদের জন্মের দু'বছর পর তাঁর পিতা খায়রুদ্দীন ১৮৯০ সালে তার পায়ের ভগ্ন হাড়ের চিকিৎসার জন্য মক্কা শরীফ থেকে সপরিবারে কলকাতায় আসেন এবং গুণগ্রাহী ও শাগরিদের অনুরোধে এখানেই চিরতরে থেকে যান। মওলানা আবুল কালাম আযাদ এখানে তাঁর পিতা ও অন্যান্য শিক্ষকের নিকট প্রাইভেটভাবে ১৬ বছর বয়সে যাবতীয় প্রচলিত শিক্ষা সমাপ্ত করেন (১৯০৪ খ্রী.)। তিনি যুলায়খা বেগমকে বিয়ে করেন, যিনি তাঁর (আযাদের) কারাবরণের সময় ১৯৪৩ সালে মারা যান। আযাদের একমাত্র ছেলে হুসাইন ৪ বছর বয়সে মারা যায়।[২]

শিক্ষা শেষে আযাদ স্যার সৈয়দের রচনাবলীর সাথে পরিচিত হন এবং অনুধাবন করেন যে, সত্যিকার শিক্ষিত হলে তাঁকে অবশ্যই আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং ইতিহাস ও দর্শনের বই-পুস্তক অনুধাবনের যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেন।[৩]

মওলানা আবুল কালাম আযাদ একসময় বাংলার হিন্দু বিপ্লবী দলে যোগদান করেছিলেন। প্রথমদিকে তারা মুসলমান বলে তাঁর আনুগত্যে সন্দেহ পোষণ করতো। পরবর্তী সময় তারা তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত সদস্য করে নেয় এবং তাঁর পরামর্শে উত্তর ভারত ও বোম্বাইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহরে তাদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে।[৪]

মওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রচলিত ও চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার উর্ধ্বে রয়েছেন-এ-কথাটি বোঝাবার জন্য তিনি কাব্যনাম অবলম্বন করেন 'আযাদ' (স্বাধীন)। ১৪ বছর বয়সে যুগের সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য পত্রিকা বলে পরিচিত 'মখযান' এ তিনি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯০৫ সালে বোম্বাই শহরে আল্লামা শিবলীর সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। শিবলী তাঁর কথাবার্তায় চমৎকৃত হয়ে তাঁকে লখনৌর নাদওয়ায় নিয়ে যান এবং তাঁকে স্বীয় প্রকাশিত 'আন-নাদওয়া' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯০৬ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি সে পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তারপর ১৯০৬ সালে তিনি অমৃতসরের অর্ধ সাপ্তাহিক 'ওয়াকিল' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি ইরাক, মিসর, সিরিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ করেন।[৫]

কর্মজীবনের গোড়ার দিকে মওলানা আযাদ চরম প্যান ইসলামবাদী ছিলেন। কুরআনের মর্মানুসারে তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলমানরা পৃথিবীর সর্বসেরা জাতি। তাই তিনি তাদেরকে কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার ডাক দেন। তিনি মনে করতেন; রাজনীতিতে অবশ্যই ধর্মীয় প্রেরণার অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে। স্বধর্মালম্বীদের মধ্যে এই ভাবধারা সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১২ সালের জুনে কলকাতা থেকে উর্দু সাপ্তাহিক 'আল হেলাল' (নতুন চাঁদ) প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি উর্দু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বল্প পরিসরে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই পত্রিকার বৃটিশ বিরোধী সুরকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার প্রেস এ্যাক্টের বলে ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে এই দুই হাজার টাকার জামানত তলব করেন। এই জামানত অচিরেই বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর আবার দশ হাজার টাকার জামানত তলব করা হয়। তাও শীঘ্র খোয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ – ১৮ খ্রী.) আরম্ভ হলে ১৯১৫ সালে 'আল হেলাল' প্রেসটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর মওলানা আবুল কালাম আযাদ ১৯১৫ সালের ১৩ নভেম্বর 'আল-বালাগ' নামক আরো একটি উর্দু সাপ্তাহিক কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এ পত্রিকাটিও ১৯১৬ সালের মার্চে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সরকারের আদেশে মওলানা আবুল কালাম আযাদকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। পাঞ্জাব, দিল্লী, ইউপি ও বোম্বাই সরকার ইতিপূর্বেই তাঁর প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিলেন। তাই অগত্যা তিনি বিহারের রাঁচিতে গমন করেন। এর ৫ মাস পর তাঁকে সেখানে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তরীণ করে রাখা হয়। ১৯২০ সালের জানুয়ারিতে তিনি অন্তরীণ থেকে মুক্তিলাভ করেন।[৬]

১৯১৪ সালে মওলানা আবুল কালাম আযাদ কুরআন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'দারুল ইরশাদ' নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।

যুদ্ধশেষে অন্তরীণ থেকে মুক্তিলাভের পর মওলানা আযাদ ১৯২০ সালের ১৮ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর সাথে দেখা করেন এবং তাঁর অসহযোগ-কর্মসূচীর অধীনে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ বছর ১৯ জানুয়ারি মওলানা মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে খিলাফতের ইস্যু নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলমান নেতাদের যে প্রতিনিধি দল বড়লাট চেমসফোর্ডের সাথে দেখা করেন, মওলানা আবুল কালাম আযাদ সেই দলভুক্ত ছিলেন। মিত্রশক্তি কর্তৃক তুরস্ককে ভাগাভাগি করার বিরুদ্ধে ঐ বছর মার্চে যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করা হয়, তাতে তিনি স্বাক্ষর দেন। একই সালের মে থেকে অসহযোগ কর্মসূচী পালনের জন্য বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি কর্তৃক যে সাব-কমিটি গঠিত হয়, তাতে তিনি সদস্য ছিলেন। ঐ বছর জুনে সর্বদলীয় নেতৃবর্গের যে কনফারেন্স এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তিনি যোগদান করেন। ঐ সর্বদলীয় কনফারেন্স কর্তৃক অনতিবিলম্বে অসহযোগ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সাব কমিটি নিযুক্ত করা হয়, এতে তিনি সদস্য ছিলেন। ঐ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির যে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন।[৭]

১৯২১ সালের মার্চে বেরিলীতে অনুষ্ঠিত 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ'-এর কনফারেন্সে মওলানা আবুল কালাম আযাদ সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন- 'শরীয়ত অনুযায়ী বৃটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের ভর্তি হওয়া অবৈধ।' ঐ বছর ২৫ অক্টোবর আগ্রায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক খিলাফত কনফারেন্সে তিনি সভাপতি ছিলেন। একই বছর অক্টোবর মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত উলামা কনফারেন্সে তিনি সভাপতিত্ব করেন।[৮]

১৯২২ সালের নভেম্বরে মওলানা আবুল কালাম আযাদ বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা প্রদানের দায়ে ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মওলানা আযাদকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারে তাঁকে এক বছর কারাবরণ করতে হয়। বিচারের সময় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে বিবৃতি দেন, তা পরবর্তী সময় 'কওল-এ-ফায়সাল' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি লিখেছিলেন-

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। মহান আল্লাহর বান্দাকে পরাধীন করে রাখার অধিকার কোন মানুষ বা মানুষসৃষ্ট কোন আমলাতন্ত্রের নাই।..... তদনুসারে আমি বর্তমান সরকারকে বৈধ সরকার বলে স্বীকার করতে পারি না এবং আমি মনে করি, আমার দেশকে ও আমার দেশবাসীকে এই সরকারের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা আমার জাতীয়, ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য।[৯]

১৯২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মওলানা আবুল কালাম আযাদ জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ কিছুদিন মুসলিমলীগের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯১২ সালের মার্চে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল-ইন্ডিয়া মুসলিমলীগের ৫ম অধিবেশনে তিনি গোখলের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিল এবং মুসলিম লীগের ৭ম সেশনে প্রেস এ্যাক্ট বাতিলের যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, মওলানা আবুল কালাম আযাদ তাতে সমর্থন দেন। ঐ অধিবেশনে কানপুর মসজিদে হাংগামার ব্যাপারে ভাইসরয়ের মুসলিম স্বার্থানুকূল সিদ্ধান্তের জন্য তাঁর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাতে মওলানা আবুল কালাম আযাদের সম্মতি ছিল। ১৯১৫-১৬ সালের ডিসেম্বর-

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি মাসে মোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ৮ম সেশনে শাসন সংস্কারের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, মওলানা আবুল কালাম আযাদ তার সদস্য ছিলেন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ষষ্ঠদশ সেশনে আইনসভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবিসমূহ স্থির করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, মওলানা আবুল কালাম আযাদ তারও অন্যতম সদস্য ছিলেন।[১০]

খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার পর মওলানা আবুল কালাম আযাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ১ম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে এবং বিপরীতমুখী ২য় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই সময় তিনি প্যান-ইসলামী ভাবধারা ত্যাগ করে একজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসীরূপে বাকি জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। কাউন্সিলের ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ সমীচীন হবে কি-না, এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মওলানা আবুল কালাম আযাদ সভাপতিত্ব করেন। ঐ অধিবেশনে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, আইন সভায় প্রবেশ করে গভর্নমেন্টের সাথে বোঝাপড়া ও লড়াই করাই হবে সমীচীন। ১৯২৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের যে সভায় সায়মন কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে মওলানা আবুল কালাম আযাদ সভাপতিত্ব করেন। সায়মন কমিশনের ভণ্ডুল সাধনে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩০ সালে লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় মীরাটের এক বক্তৃতার জন্য তিনি গ্রেফতার হন এবং প্রায় দেড় বছর মীরাট জেলে অন্তরীণ ছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৩২ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ঐ সময় তিনি এক বছরের বেশিকাল দিল্লী জেলে কারা নির্যাতন ভোগ করেন।[১১]

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর মওলানা আবুল কালাম আযাদ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কংগ্রেস-গরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা এ জন্যই গঠন করা উচিত, যাতে প্রাদেশিক দেয়া ক্ষমতার পুরোপুরি অনুশীলন সম্ভব হয়। মন্ত্রীসভাসমূহ গঠিত হওয়ার পর সেগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক যে পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হয়, তিনি তার সদস্য ছিলেন।[১২]

১৯৩৯ সালের শেষের দিকে মওলানা আবুল কালাম আযাদ এম.এন. রায়কে পরাজিত করে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪০ সালের মার্চে রামগড় ও বিহারে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলিম সৃষ্ট অবিচ্ছেদ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করে বলেনঃ

ভারতবাসীরূপে ভারত-ভূমির উপর ইসলামের বিরাট অধিকার রয়েছে। কয়েক হাজার বছর ধরে যদি এখানে হিন্দু ধর্ম কার্যকর থাকে, তবে এটাও বলতে হবে যে, হাজার বছর ধরে এখানে ইসলাম মুসলমানদের ধর্মরূপে বিরাজ করছে। একজন হিন্দু যেমন গর্ব করে বলতে পারে যে, সে একজন ভারতীয় এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তেমনি সমান গর্ব নিয়ে আমরা মুসলমানরাও বলতে পারি যে, আমরা

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী। উভয় ধর্মাবলম্বীদের কার্যাবলী ভারতের ১১শ বছরের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের ভাষা, কবিতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কলা, পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলী প্রত্যেকটি বস্তুই আমাদের যুগ্ম চেষ্টার স্বাক্ষর বহন করছে।[১৩]

ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণের পূর্বেই ১৯৪০ সালে মওলানা আবুল কালাম আযাদকে আহমদাবাদে গ্রেফতার করা হয় এবং নৈনিতাল জেলে দুই বছর অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯৪১ সালে তিনি মুক্তি পান। ব্যর্থ ক্রিপস্ মিশনের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে তিনি ১৯৪২ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টরূপে নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ভাবতেন, ঐ আন্দোলন আরম্ভ করলে গভর্নমেন্ট সকল কংগ্রেসী নেতাকে গ্রেফতার করে ফেলবেন। ফলে দেশ-পরিচালকের অনুপস্থিতিতে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করবে। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার একদিন পরেই ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং আহমদাবাদ জেলে রাখা হয়। পরে তাঁকে বাকুড়া জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৫ সালের জুনে তিনি মুক্তিলাভ করেন।[১৪]

ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় আলোচনার জন্য ভাইসরয় ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের জুনে সিমলায় কনফারেন্স ডেকেছিলেন, তাতে মওলানা আবুল কালাম আযাদ কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪৬ সালে বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের সাথে আলোচনাকালে তিনি নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন করেন।[১৫]

মওলানা আবুল কালাম আযাদ অখন্ড ভারতের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। সেটি ১৯৪৬ সালের এপ্রিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। ঐ পরিকল্পনায় তিনি দেশের জন্য এমন একটি ফেডারেল গঠনতন্ত্রের রূপরেখা অংকন করেছিলেন, যাতে জরুরী অল্প কয়েকটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকি সব ক্ষমতা প্রদেশসমূহের হাতে দেয়ার প্রস্তাব ছিল। তিনি বলেছিলেন- "এই ব্যবস্থার ফলে একদিকে মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ সর্বাধিক স্বাধিকার ভোগ করতে পারবে, অন্যদিকে দেশের অখন্ডতাও বজায় থাকবে।" মওলানা আবুল কালাম আযাদ পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলতেন, "পাকিস্তান প্রস্তাব কেবল ভারতের জন্যই ক্ষতিকর নয়, বিশেষ করে তা মুসলমানদের জন্যও অহিতকর।" পরবর্তী সময় যখন দেশ-বিভাগের পরিকল্পনাটি বিবেচনা করা হচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর দুই সহযোগী প্যাটেল ও নেহেরুকে ফাইনাল সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছিল, তখন তিনি মি. গান্ধীর কাছে এই বলে সর্বশেষ অনুরোধ করেছিলেন যে, ব্যাপারটিকে এমনি অবস্থায় দুই বছর থাকতে দিন; এ সময়ের মধ্যে মুসলিমলীগ হয়তো একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হবে।[১৬]

মুসলিমলীগ অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলে মওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁদেরকে অর্থ দফতর না দিয়ে স্বরাষ্ট্র দফতর দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ভাবতেন, অর্থ দফতর হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম লীগকে অর্থ ফেরত দেয়া হলে তারা অসুবিধার সম্মুখীন

Dhaka University Institutional Repository

হবেন। মওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রথমত অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগদান করেননি। কিন্তু পরবর্তী সময় ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে তিনি শিক্ষামন্ত্রীরূপে যোগদান করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮) ঐ পদে বহাল থাকেন।

১৯৪৮-৫০ সালে মওলানা আবুল কালাম আযাদ গণপরিষদের কংগ্রেস সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫০–৫২ সালে ভারতের পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি লোকসভার (রামপুর, ইউ.পি) সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি গোরগাঁও (বর্তমানে হরিয়ানা) থেকে পুনরায় সদস্য নির্বাচিত হন। এ ছাড়া তিনি পার্লামেন্টে কংগ্রেসের ডেপুটি নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।[১৭]

'আল-হেলাল' প্রকাশের সময় থেকেই মওলানা আবুল কালাম আযাদের ধ্যান-ধারণার চম পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। তিনি একজন প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার, অনৈসলামিক রীতিনীতি এবং সাম্প্রদায়িক কোন্দলের তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ততটা জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়নি।

মওলানা আযাদ একজন শ্রেষ্ঠ আলিম, বহুবিধ গভীর জ্ঞানের অধিকারী মহাপন্ডিত ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত বাগ্মীও ছিলেন। এ জন্যই তাঁকে 'আবুল কালাম' (বাগ্মী) উপাদিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ছিলেন প্রভাবশালী লেখক এবং উর্দু, ফার্সী ও আরবী সাহিত্য-জগতে স্বতন্ত্র লেখনিভংগির অধিকারী একজন যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক। শান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন তিনি।

১৯৫৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি মওলানা আবুল কালাম আযাদ দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁকে স্থানীয় জামে মসজিদের সম্মুখস্থ ময়দানে দাফন করা হয়।

তথ্য নির্দেশ

১. Naresh Kumar Jain, Muslims in India, Vol-I, P. 409
২. Ibid, P. 41
৩. Ibid, P. 41
৪. Ibid, P. 41
৫. Ibid, P. 42
৬. Ibid, P. 42
৭. Ibid, P. 42
৮. Ibid, P. 42
৯. Ibid, P. 42
১০.Ibid, P. 42
১১. Ibid, P. 43
১২. Ibid, P. 43
১৩. Ibid, P. 44
১৪. Ibid, P. 44

Dhaka University Institutional Repository

১৫. Ibid, P. 44
১৬. Ibid, P. 109
১৭. Ibid, P. 109

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ সুবহানী

(১৮৯৭ – ১৯৬৪)

জন্মঃ বৃটিশ ভারতের যুক্ত প্রদেশে বালিয়া জেলার সিকান্দারপুর গ্রামে। পিতা-সৈয়দ মুর্তযা আলী। মওলানা সুবহানী জৌনপুর মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে হাদীসের সনদ লাভ করেন। তাঁর ধর্মীয় জ্ঞান ছিল গভীর। তিনি কয়েক বছর কানপুরের ইলাহিয়াত মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন এবং শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনীতেও অংশ নেন। তিনি প্যান-ইসলামবাদী ও বৃটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' ও কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থক হয়েও তিনি মুসলিমলীগের সাথে সহযোগিতা করেন এবং এর বার্ষিক সম্মিলনে অংশগ্রহণ করেন। 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' প্রতিষ্ঠায় (১৯১৯ খ্রী.) এবং এর বিভিন্ন সম্মিলনের আয়োজনে মওলানার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

মওলানা আযাদ সুবহানী ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বোম্বাই নগরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খিলাফত কনফারেন্সের উলামা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সেই বছর সেপ্টেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত খিলাফত কনফারেন্সেও তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি ইউপি খিলাফত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আহমদাবাদে অল-ইন্ডিয়া মুসলিমলীগের যে চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তার সাবজেক্ট কমিটিতে মওলানা আযাদ সুবহানী এ মর্মে একটি প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে একযোগে কাজ করা এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করা উচিত। তাঁর প্রস্তাবটি সাবজেক্ট কমিটিতেই নাকচ হয়ে যায়। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে বোম্বাই নগরে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির যে ওয়াকিং কমিটি গঠিত হয়, মওলানা আযাদ সুবহানী তার সদস্য ছিলেন। ১৯২২ সালের জুন মাসে খিলাফত কর্মসূচীর অহিংসতা তত্ত্বাবধানের জন্য কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি কর্তৃক লখনৌতে যে কমিটি গঠিত হয়, মওলানা আযাদ সুবহানী তার সদস্য ছিলেন।[১]

খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে তাতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য মি. গান্ধী ও মওলানা আবুল কালাম আযাদসহ মওলানা আযাদ সুবহানী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বহু সভা-সমিতির আয়োজন করেন এবং মূল্যবান ভাষণ দেন। ১৯২৩ সালে তিনি ইউপি কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং কাজকর্মে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন।[২]

কংগ্রেসের হিন্দুঘেঁষা রাজনীতির কারণে মওলানা আযাদ সুবহানী ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।[৩]

১৯৪৫ সালের অক্টোবরে কলকাতায় 'নিখিল ভারত জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' গঠিত হলে মওলানা আযাদ সুবহানী 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' ত্যাগ করে ঐ সংগঠনে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হন। এই জমিয়ত গঠনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ঐ সময় তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ, বর্ধমান ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করে পাকিস্তানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতার গড়ের মাঠে ঈদের সমাবেশে ইমামতি করার জন্য কংগ্রেসী

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে বাদ দিয়ে তদস্থলে মওলানা আযাদ সুবহানীকে মনোনীত করা হয়। সিলেটের গণভোটেও তিনি পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন।[৪]

ভারত বিভাগের পর মওলানা আযাদ সুবহানী মাতৃভূমি ভারতে চলে যান। এবং তাঁর মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রচার ও তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর চিন্তাধারা 'রব্বানী দর্শন' নামে পরিচিত। রব্বানী দর্শনে মূল কথা হলোঃ 'মহান আল্লাহ সকলের রব বা প্রতিপালক। মানুষ হলো এই দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়াতে মহান আল্লাহর রবুবিয়ত বা প্রতিপালনবাদ কায়েম করাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম ইবাদাত।

==========

তথ্য নির্দেশ

১. Jain, Naresh Kumer, Muslims in India, Vol-1, P. 33
২. Ibid, P. 33
৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ২৬
৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ২৬

মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী

(১৯০০ – ১৯৬০)

মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে দিনাজপুরের নূরুল হুদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক উর্দু-ফার্সী শিক্ষা করেন মাতা উম্মে সালমার নিকট। পিতা আব্দুল হাদীর নিকটও তিনি কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৬ বছর বয়সে পিতা মারা যাওয়ার পর তিনি বড় ভাই মওলানা বাকীর নিকট আরবী সাহিত্য ও আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি পিতা প্রতিষ্ঠা নূরুলহুদা মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এখানে তাঁর আরবী সাহিত্য ও ধর্মীয় শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়।[১]

তারপর মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী রংপুর শহরে কৈলাশ রঞ্জন হাইস্কুলে কিছুকাল পড়াশোনা করেন। এরপর হুগলী জেলা স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। পরবর্তী সময় কলিকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো-পার্সিয়ান সেকশনে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স মিশনারী কলেজ থেকে আই.এ ও আইএসসি সংযুক্ত কোর্সে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস করেন। একই কলেজে বিএ পড়ার সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কলেজ ত্যাগ করেন এবং বৃটিশবিরোধী ক্রিয়াকর্মে যোগ দেন। ঐ সময় দিনাজপুর জেলা খিলাফত কমিটির সেক্রেটারিরূপে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[২]

খিলাফত আন্দোলন চলাকালে মওলানা কাফী 'বংগীয় ও কলিকাতা খিলাফত কমিটি'র-সভাপতি মওলানা আযাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর ইসলামী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। ১৯১৯-২০ সালে তিনি মওলানা আযাদের নির্দেশে বংগীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত কর্মীদের প্রশিক্ষণদানের জন্য ঢাকায় আসেন। এখান থেকে ৬ মাস যাবত ঢাকার খিলাফত নেতা খাজা আব্দুল করীমের বাসায় অবস্থান করে কর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে মফঃস্বলে কাজ করার জন্য পাঠাতেন। ঐ সময় তিনি ঢাকা, গাইবান্ধা, কুমিল্লা ও অন্যান্য অঞ্চলে খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের বিভিন্ন সভা-সম্মিলনে যোগদান করেন এবং লোকদের খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

ঢাকার খিলাফতের প্রচারকার্য সম্পাদন করে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী কলকাতায় ফিরে যান এবং খিলাফত কমিটি প্রকাশিত (১৯২০ খ্রী.) ও মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত উর্দু 'দৈনিক যামান' পত্রিকার প্রথম সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। শায়েক আহমদ উসমানী (উর্দুভাষী) ছিলেন এর অন্যতম সম্পাদক। এ কাগজের মালিক ও সম্পাদক ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ। শুধু এই উর্দু দৈনিকই নয়, অন্য একখানা বাংলা দৈনিকও তাঁর সম্পাদনায় তখন প্রকাশিত হতো। তার নাম ছিল 'সেবক'। মওলানা সাহেবের এক গরম লেখার ফলে তাঁকে গ্রেফতার ও কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং 'সেবক'-এর জামানত তলব করা হয়। তখন তদস্থলে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর একটি দৈনিক সংস্করণ 'দৈনিক মোহাম্মদী' নামে প্রকাশ করা হয়।[৩]

১৯২১ সালের ডিসেম্বরে মওলানা আকরম খাঁ ও শায়েক আহমদ উসমানী খিলাফত আন্দোলনের দায়ে গ্রেফতার হলে মওলানা কাফী একাই 'যামানা'-র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন এবং খিলাফত আন্দোলনের অগ্রগতি সাধনে বিশেষ সহায়তা করেন।[৪]

১৯২২ সালে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' এর বাংলা শাখার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২২–২৪ সালে তিনি দিল্লী গমন করেন এবং মুহাদ্দিস আবদুল ওয়াহ্হাব 'নাবীনা' ও বেনারসের মুহাদ্দিস আবুল কাসেমের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৫]

কারামুক্তির পর 'শায়েক আহমদ উসমানী প্রথমে কলকাতা থেকে' দাওর-এ-জাদীদ' ও পরে আসর-এর জাদীদ' প্রকাশ করেন। অপরদিকে ১৯২৪ সালে 'যামানা' বন্ধ হয়ে গেলে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী' প্রকাশ করেন (২৯ নভেম্বর ১৯২৪ খ্রী.)। তিনি ছিলেন এর প্রকাশক ও সম্পাদক। তখন আবদুর রব সৈয়েদী ছিলেন তাঁর সহকারী ও সত্যাগ্রহীর ম্যানেজার। পত্রিকাটি পৌনে তিন বছর চলার পর ১৯২৭ সালে বন্ধ হয়ে যায় (আগস্ট)। এটি সুধী সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। সত্যাগ্রহীর সংখ্যাগুলো পাঠ করলে প্রতীয়মান হয় যে, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থন ছিল। তিনি অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী এবং কংগ্রেস ও 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' পন্থী ছিলেন। সত্যাগ্রহী পত্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে।

১৯২৬ সালে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী গঠিত 'ইন্ডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টি'র সংগঠন ও প্রচারণায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ পার্টির সেক্রেটারি এবং ইলেকশন বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। এ পার্টির প্রচারকার্যে তিনি অনেক সভায়

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দেন। 'সত্যগ্রহী' পত্রিকায় পার্টির জন্য প্রচারকার্য চালান। ১৯২৫ সালের মার্চে তিনি ইন্ডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টির উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সত্যাগ্রহী পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেন। এতে বলা হয়-

মুসলমানকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার আদায়ের সমস্ত সংগ্রামে সমাজের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক স্থানীয় মান অনুসারে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতা করতে হবে।[৬]

১৯২৭ সাল পর্যন্ত মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী সুহরাওয়ার্দী সাহেবের অন্যতম লেফটেন্যান্ট ছিলেন। পরবর্তী সময় রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে তিনি সুহরাওয়ার্দী সাহেবের থেকে দূরে সরে যান।[৭]

'সত্যাগ্রহী' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী উত্তরবংগে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, আহলে হাদীস জামায়াতের উন্নতি বিধান করেন, আভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০ – ৩৩ খ্রী.) যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে দুইবার কারাবরণ করেন। প্রথমবার ১৯৩০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁয়ে বক্তৃতা করার দায়ে গ্রেফতার হন এবং এক বছর কলকাতার সেন্ট্রাল জেলে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। মুক্তিলাভের পর তাঁর উপর আরোপিত ১৪৪ ধারা ভংগ করে বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা করায় তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং কলকাতার দমদম জেলে ৬ মাস কারাবরণ করেন।[৮]

১৯৪০ সালে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী দিল্লীতে ভারত জাতীয়তাবাদী কনফারেন্সে উর্দুতে ভাষণ দেন। ১৯৪২ সালে তিনি হজ্জ করেন। হজ্জের পর তিনি দেশে ফিরে সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং একনিষ্ঠভাবে ইসলাম প্রচার ও আহলে হাদীস জামায়াতের সংস্কার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি আহলে হাদীস জামাআতের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন এবং প্রাদেশিক ও উপমহাদেশীয় বিভিন্ন আহলে হাদীস কনফারেন্সে যোগদান করেন।[৯]

১৯৪০ সালে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী'র সভাপতিত্বে পাবনা জেলা আহলে হাদীস কনফারেন্স এবং ১৯৪৬ সালে হারাগাছ বন্দরে 'নিখিল বংগ ও আসাম আহলে হাদীস' গঠিত হয় এবং তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। 'জমিয়ত' এর সদর দফতর ছিল কলকাতায়। ১৯৪৮ সালে ঐ দফতর পাবনা শহরে স্থানান্তরিত হলে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী পাবনায় এসে বসবাস করতে থাকেন।

মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী জমিয়তে আহরে হাদিসের মাসিক মুখপত্র 'তরজুমানুল হাদিস' ও সাপ্তাহিক 'আরাফাত'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৪৯ সালে তিনি পাবনা থেকে 'তরজুমানুল হাদিস' প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে 'তরজুমান'-এর দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। আমৃত্যু তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত থাকে এবং ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৭ সালের ৭ অক্টোবর মওলানা মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহেল কাফীর সম্পাদনায় 'জমিয়ত'-এর অপর মুখপত্র 'সাপ্তাহিক আরাফাত' আত্মপ্রকাশ করে।[১০] পত্রিকাটি এখনো চলছে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় এই কাগজ দু'টি উঁচু শ্রেণীর ধর্মীয় কাগজে পরিণত হয়।

১৯৫৯ সালে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী ঢাকায় মাদ্রাসাতুল হাদীস প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] ইসলাম বিষয়ে তাঁর অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রয়েছে।

দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ, চিরকুমার মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। দিনাজপুরের নূরুল হুদা গ্রামে পিতা-মাতা ও বড় ভাইয়ের সন্নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যেসব মুসলিম মনীষী বাংলার মুসলমানদেরকে ধর্মীয় প্রেরণা, জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তন্মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী, কর্মানুরাগী ও সাংগঠনিক শক্তির অধিকারী।

==========

তথ্য নির্দেশ

১. আরাফাত, ঢাকা-২০ জুন, ১৯৬৬;
২. সওগাত, আশ্বিন-১৩৮৩, পৃ. ৪৯৬
৩. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, পৃ. ৪৪২
৪. আরাফাত, ঢাকা, জুন-১৯৬৬
৫. ঐ।
৬. সত্যাগ্রহী, ২৫ শাবান, ১৩৪৩/১৯ মার্চ, ১৯২৫, পৃ. ১-২
৭. মওলানা কাফীর জেল-ডাইরী, আরাফাত ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
৮. খানবাহাদুর আবদুল হাকীম সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ (১), ঢাকা-১৯৭২, পৃ. ১৬৯
৯. আরাফাত, ২৭ জুন-১৯৭৭
১০. ঐ, ২৮ জুন-১৯৮২
১১. ঐ, ২৮ জুন-১৯৮২

মৌলবী ইদ্রিস আহমদ

(১৮৯২–১৯৬৭)

পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানাধীন কর্পুরকাঠি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা-মিঞাজান তহলিশদার। মৌলবী ইদ্রিস ভোলা সরকারী হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। পরবর্তী সময় চট্টগ্রামের হাটহাজারী কওমী মাদ্রাসায় কয়েক বছর পড়াশোনা করে ২২ বছর বয়সে সনদপ্রাপ্ত হন।[১]

কর্মজীবনে মৌলবী ইদ্রিস সমাজসেবা ও সংস্কারে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি পরপর কয়েকবার স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি দলীয় রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের বংগীয়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপক পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে শেরেবাংলাকে সমর্থন করেন। কিন্তু ঐ নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে তিনি হেরে যান। 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' গঠিত হলে (১৯৪৫) সালে তিনি তাতে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি 'যুক্তফ্রন্টের' টিকেট না নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপেই অংশগ্রহণ করেন এবং হেরে যান। তিনি 'মুজাহিদুল ইসলাম' নামক মানবিক ও সমাজ সেবামূলক একটি সমিতি গঠন করেন।[২]

১৯৬৭ সালে তিনি নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। তাঁর পুত্র জনাব আখতার ফারুক একজন সুসাহিত্যিক ও আল্লাহভীরু মুমিন।[৩]

তথ্য নির্দেশ

১. আ.জ.ম. সিকান্দার মোমতাজী, যাঁদের ভুলিনি, পটুয়াখালী, ১৯৮৭, পৃ. ২৭-৩২
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।

মৌলবী শামসুদ্দিন আহমদ

(১৮৮৯ – ১৯৬৯)

মৌলভী শামসুদ্দিন আহমদ ১৮৮৯ সালে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৌলবী আফসারুদ্দীন আহমদ ছিলেন তাঁর বড় ভাই। তাঁর পিতা মাহতাবুদ্দীন আহমদ একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন।

মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদ হুগলী মাদ্রাসা থেকে মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা পাস করে কলকাতায় পড়াশোনা করেন। ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯১৯ সালে এল.এল.বি. পাস করে প্রথমে কৃষ্ণনগর এবং পরে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন।[১]

মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদের বিরাট রাজনৈতিক জীবন রয়েছে। তিনি ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। খিলাফত আন্দোলন পরিচালনা পরিচালনার জন্য তিনি ১৯২১ সালে কারাদন্ডে দন্ডিত হন।[২] মওলানা আবুল কালাম আযাদ যখন বংগীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন শামসুদ্দিন আহমদ এর সেক্রেটারি ছিলেন।[৩] ১৯২৫ সালে মৌলবী আহমদ কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক শ্রমিক সংঘ সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। দেশ বন্ধু সি.আর. দাশ যখন বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তিনি এর সেক্রেটারি ছিলেন।[৪] ১৯২৭ সালে তিনি কংগ্রেস সদস্যরূপে কুষ্টিয়া থেকে সর্বপ্রথম বংগীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯২৯ সালে ঐ সদস্যপদ ত্যাগ করেন।[৫]

১৯২৯ সালে মৌলবী শামসুদ্দিন মওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম ন্যাশনালিস্ট' দলের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ঐ বছর (১৯২৯) বংগীয় প্রজা সমিতি গঠিত হলে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তার জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে তিনি গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন।[৬] ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন। তখন কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন এ.কে.ফজলুল হক।[৭] কর্পোরেশনের কমিশনার থাকাকালে তিনি এর 'বস্তি এ্যান্ড রোড কমিটি'র চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ১৯২৯ সালে প্রজা-পার্টি গঠনের সময় তাঁকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হলেও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৩৪ সালে সংগঠনে যোগদান করেন এবং পরের বছর (১৯৩৫ খ্রী.) মওলানা আকরম খাঁ'র স্থলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখন কৃষক প্রজা দলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এ.কে.ফজলুল হক।[৮]

মৌলবী শামসুদ্দিন পুনরায় ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা দলের টিকেটে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষক প্রজা দলের প্রতিনিধি হিসেবে ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় কৃষি ও পশু পালন মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রশ্নে তাঁর সংগে ফজলুল হকের মতানৈক্য হওয়ায় ১৯৩৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি পদত্যাগ করেন।[৯] এই পদত্যাগ করার বিষয়টি তদানীন্তন অবিভক্ত ভারতের রাজনীতিতে দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কৃষক-প্রজা দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ পদত্যাগ সম্বন্ধে কৃষক প্রজা দলের অন্যতম নেতা আবুল মনসুর আহমদ এই মন্তব্য করেনঃ

কোনও পার্লামেন্টারি দল স্বীয় মন্ত্রীকে 'কলব্যাক' করা এবং কর্মসূচীর ভিত্তিতে কোন মন্ত্রীর পদত্যাগ করা বাংলা-ভারতের রাজনীতিতে ছিল উহাই প্রথম। সকলে মিলিয়া আমরা শামসুদ্দিন সাহেবের এই সাহসী পদত্যাগ ও স্বার্থত্যাগে তাঁকে ধন্য করিলাম।[১০]

ঐ সময় সমিতির মুখপত্র সাপ্তাহিক 'কৃষক' বের করার পেছনে শামসুদ্দিন আহমদের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী।

ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় জমিদারী প্রথা বিলোপ আইন পাস করতে না পারায় শামসুদ্দিন আহমদ পদত্যাগ করলে তিনি কিছুদিন উক্ত পার্টির নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য 'ফ্লাউড কমিশন' গঠিত হয়েছিল। ফ্লাউড কমিশন বাংলাদেশের জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য রিপোর্ট প্রদান করেছিল। কিন্তু ফজলুল হক উক্ত রিপোর্ট কার্যকরী করতে পারেন নাই। ১৯৪১ সালে শামসুদ্দিন আহমদ পুনরায় হক মন্ত্রীসভায় যোগাযোগ ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে তিনি কৃষক-প্রজা পার্টি থেকে পদত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সালে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভায় শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত তাঁর কাজ করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁকে বার্মার রাষ্ট্রদূত পদে মনোনয়ন দান করেছিরেন কিন্তু তাঁর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উক্ত মনোনয়ন বাতিল করে দেন।[১১] এরপর তিনি ঢাকায় আইন ব্যবসা করেন। ১৯৬২

Dhaka University Institutional Repository

সালে জাতীয় পরিষদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন এবং ১৯৬৩ সালে "পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টি" নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদ কুষ্টিয়াতে ১৯৪৬ সালে 'কুষ্টিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দীর্ঘকাল ঐ কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। কুষ্টিয়ার এই কৃতী সন্তান ১৯৬৯ সালের ৩০শে অক্টোবর চট্টগ্রামে ইন্তিকাল করেন। কৃষক-প্রজা সমিতি পরিচালনার জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন, তা আমাদের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। নির্বাচনে জয় লাভের জন্য অথবা নিজের ভবিষ্যত চিন্তা করে তিনি কোনদিন পক্ষপাত কিংবা দুর্নীতি করেন নাই। মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদ আমাদের রাজনীতিতে যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা শ্রদ্ধাভরে স্মরণযোগ্য। তিনি কোন জমিদার বা জোতদারের সন্তান ছিলেন না। সাধারণত কৃষক পরিবারের সন্তান মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদ এ দেশের কৃষকদের স্বার্থে যতটুকু কাজ করেছিলেন তা বিস্মৃত হবার নয়।[১২]

==========

তথ্য নির্দেশ

১. শওকত আলী শ.ম. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩–৮৪
২. ঐ।
৩. Pakistan Observer, 1 Nov. Page. 1969
৪. Ibid.
৫. Ibid.
৬. শওকত আলী, শ.ম., পৃ. ৮৪
৭. Pakistan Observer, 1 Nov. 1969
৮. শ.ম. শওকত আলী, পৃ. ৮৪
৯. শ.ম. শওকত আলী, পৃ. ৮৪
১০. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আগস্ট-১৯৭৫, পৃ. ১৪২
১১. এ্যাডভোকেট রুহুল ইসলাম, অপর চারজন আইনজীবী কর্তৃক ১৯৬২ সালে প্রকাশিতঃ মৌঃ শামস উদ্দিন আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, পৃ. ৪
২৬. শওকত আলী, শ.ম., পৃ. ৮৫

মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ (র.)

(১৮৭৩-১৯৫২)

বাংলাদেশের মানুষ পীর-মাশায়েখের সাহায্যেই ইসলামের আলোর সন্ধান পেয়েছিল। এ দেশের মানুষকে তাঁরাই যেমন ইসলামের সন্ধান দেন, তেমনি তাদের জীবনকে যখন বিদআত, শিরক ইত্যাদি কুসংস্কার আচ্ছন্ন করে ফেলত তখন অন্ধকার থেকে তাদেরকে মুক্ত করে ইসলামের পথে আনয়নে উলামা-মাশায়েখবৃন্দই যুগে যুগে এগিয়ে এসেছেন। পরাধীন-স্বাধীন, অনুকূল, প্রতিকূল সর্বাবস্থাতেই তাঁরা এ দ্বীনী দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। উলামা ও পীর-মাশায়েখের সেই ধারারই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন শর্ষিণার পীর হযরত মাওলানা নেছার

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দীন আহমদ। এ নক্ষত্রের আলো বহু ধারায় বিচ্ছুরিত হত- শিক্ষাদানে, ওয়াজে, নসিহতে, লেখায় তিনি ছিলেন যেমন আধ্যাত্মিক গুরু তেমনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপন্ডিত শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও দ্বীনী শিক্ষার মহাসাধক। বাংলা ভাষাভাষীদের জ্ঞানের আলো বিশেষ করে দ্বীনী শিক্ষার আলো বিস্তারে অসংখ্য কীর্তির মাঝে মাওলানা নেছার উদ্দীন সাহেবের সর্ববৃহৎ কীর্তি হল বৃহত্তর বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠির অধীন শর্ষিণার দারুসসুন্নাহ আলীয়া মাদরাসা। এটি দেশের উচ্চ দ্বীনি শিক্ষার অন্যতম পাদপীঠ। এ মহান প্রতিষ্ঠানটির ন্যায় এ দেশে আরও বহু আলীয়া মাদরাসা থাকলেও ইলমে হাদীসের সাথে সাথে এখানকার ছাত্রদের মধ্যে আমলী ও রূহানী প্রশিক্ষণ দানের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি খ্যাত।[১]

জন্ম বৃত্তান্ত:

বরিশাল জেলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানাধীন শর্ষিনা গ্রামে ১৮৭৩ খ্রী. বাংলাদেশের অন্যতম মহান পীর ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক মাওলানা নেছার উদ্দীন সাহেবের জন্ম। তাঁর পিতার নাম সাদরুদ্দীন আহমদ। জনাব সাদরুদ্দীন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন শিক্ষিত ও প্রতিভাবান গ্রামপ্রধান ছিলেন। তিনি মরহুম হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র হাজী সাঈদুদ্দীনের মুরীদ ছিলেন।

শিক্ষা জীবন:

পীর সাহেবের বাল্য শিক্ষা নিজ গ্রামের পাঠশালায় শুরু হয়। বাল্য জীবনে তিনি সরল সুবোধ, বিদ্যানুরাগী ও ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন। ধার্মিক পিতা-মাতার প্রভাবে বাল্যজীবনেই তাঁর ধর্মীয় অনুরাগের স্ফুরণ ঘটেছিল। শৈশবেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। অত:পর মাতার চেষ্টায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন। মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত একটি মাদরাসায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন। মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত একটি মাদরাসায় তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করেন। পরে তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া মাধ্যমিক মানের মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। অত:পর তিনি কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন।[২]

কলকাতা মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি উপমহাদেশের খ্যাতনামা পীর হুগলী জেলার মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ উরফে আবু বকর সিদ্দীকি (র.)-এর হাতে বায়াআত গ্রহণ করেন। অত:পর তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর সাহচর্য্যে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা লাভ করেন। এভাবেই তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি তাঁর মুর্শিদের নির্দেশে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি ইলম-এ-মারিফাতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং পীরের নিকট হতে খিলাফত লাভ করত সূফী তরীকায় দীক্ষা দানে অনুমতি প্রাপ্ত হন।

কর্ম জীবন:

হিদায়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করেন মুসলিম সমাজের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দর্শনে বিশেষভাবে মর্মাহত হন এবং শিক্ষা ব্যতীত এই সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়-এ সত্য উপলব্ধি করেন। তিনি তাঁর পীর সাহেবের নির্দেশক্রমে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। অত:পর তিনি একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করে চলতে থাকেন। তা হলো নিজ ও পার্শ্ববর্তী জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে হিদায়েত ও তাবলীগ করা, বাংলা ভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদি প্রণয়ন, বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন। পরবর্তীকালে তিনি একজন কামিল পীর হিসেবে সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁর হাতে বায়আত হয়। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ সারাদেশে ইসলামের আলোড়ন সৃষ্টি করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভা-সমিতির মাধ্যমে তিনি বহুবিধ কুসংস্কার ও অইসলামীক কার্যকলাপ দূর করেন।[৩] তিনি দেশের লোকদের ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এবং খলিফা ও ভক্তগণ এ মহান দ্বীনি খিদমতে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন।

তিনি নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটিকে আপ্রাণ চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে একটি সর্বোচ্চ মানের ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নীত করেন। সরকার পরিচালিত কলকাতা মাদরাসার পরেই অবিভক্ত বাংলার এটাই সর্বপ্রথম বেসরকারী কামিল মাদরাসা। এটি একটি বৃহৎ আবাসিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বহু শত শিক্ষার্থীর বিনা মূল্যে আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা রয়েছে। মাদরাসাটি প্রধানত দেশবাসীর আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। সরকারও মাদরাসাটির উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।[৪] ধর্মীয় ওয়াজ-নসীহত শিক্ষা-দীক্ষা ও দেশের সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি মাদরাসা প্রাঙ্গণে একটি বার্ষিক মাহফিলের আয়োজন করতেন। প্রতি অগ্রহায়ন মাসের চৌদ্দ, পনের ও ষোল তারিখে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর মাদরাসার বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। মাদরাসার উন্নতি বিধান, ইসলামী শিক্ষার সমস্যাদি পর্যালোচনা, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই এই মাহফিলের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নের জন্যে তিনি 'আলিম সমাজ' বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়ও নির্দেশে বহু ইসলামী পুস্তক রচিত হয়। তন্মধ্যে তরীকূল ইসলাম, তালিম-ই মারিফাত, আল-জুমুয়া, মাসায়িল-ই-আরবায়া, নারী ও পর্দা, মাজহাব, তাকলীদ, ফতোয়া-ই সিদ্দিকীয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৫]

তিনি দেশে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকভাবে বিস্তারের লক্ষ্যে বহুসংখ্যক বিভিন্ন মানের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর সংখ্যা প্রায় সতাধিক। বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন এলাকায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত।

পীর সাহেব অনেকগুলো সাহায্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তন্মধ্যে হিমায়ত-ই-ইসলাম তহবিল, এহইয়া-ই-সুন্নাত তহবিল উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত তহবিলে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়িত হত।[৬] তিনি বিনয়ী ও ধনী-দরিদ্র সকলকেই সমানভাবে দেখতেন, আদর-আপ্যায়ন করতেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ইসলামী রীতি-নিয়ম চালু ও অইসলামীক ক্রিয়াকলাপের বিরোধী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রথম দিকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি সরাসরি যোগাযোগ ও পত্রলাপ করতেন। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাত করে তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করতেন।[৭]

পীর সাহেব ইসলামী আইন-কানুন মুতাবিক সরকার গঠন ও শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৭ সালে ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর শর্ষিনাতে ঐতিহাসিক উলামা সম্মেলন আহবান করেন। দেশের বিশিষ্ট 'আলিম উলামা ও রাজনীতিকগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার কার্য নির্বাহের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার মাহকামা-এ-কাযা প্রতিষ্ঠার দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৮] ১৯৫২ সালে ৩১শে জানুয়ারী রোজ শুক্রবার ৭৯ বছর বয়সে পীর সাহেব ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশের ভিতর ও বাইরে তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরীদ রয়েছে। তিনি জমিয়ত-ই-উলামা-এ বাংলার সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র রেখে যান। পীর মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ এবং পীর মাওলানা সিদ্দীক আহমদ যিনি মেজো পীর সাহেব হিসাবে পরিচিত।

মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ মাদ্রাসার ছাত্র এবং উলামা-এ-কিরামের মধ্যে ইসলামী আদর্শের অনুপস্থিতি দেখলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। কর্মজীবনে এসে যাতে কোন মাদরাসা পাস ছাত্র 'আলিম সুলভ চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্যুতি না হয়, এ জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে ওছিয়ত করতেন। এটা তাঁর আজীবনের সাধনা এবং কর্মতৎপরতার এই কেন্দ্রবিন্দুকে নিয়েই আবর্তিত।[৯] দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা-সমিতি করা, ওয়াজের সাহায্যে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল রাখার জন্যে তিনি আমরণ চেষ্টা সাধনা করে গেছেন। মানুষকে আল্লাহর নেকবান্দায় পরিণত করার জন্য ইসলামের এই দরদী শুধু ওয়াজ-নসীহত এবং মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠাতেই নিজের কর্মতৎপরতাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বাংলা ভাষায় ইসলামী শিক্ষা আদর্শ বিস্তার কল্পে ইসলামী প্রকাশনা বিভাগও খুলেছিলেন। তাঁর এ কাজে সবচাইতে তাঁকে সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁর সহকর্মী মাওলানা এমদাদ আলী সাহেব। বাংলা ভাষায় শর্ষিণার ইসলামী সাহিত্য এদেশে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি তমদ্দুন রক্ষার বিরাট সম্পদ। ফুরফুরা দরবারের দুই খলিফা হযরত মাওলানা রুহুল আমীন এবং শর্ষিণার হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন ও উত্তরসূরী মাওলানা মুয়েজুদ্দীন হামিদী প্রমুখ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে যে অবদান রেখে গেছেন, এ গুলোর প্রেরণার মূল উৎস ছিলেন ফুরফুরার পীর সাহেব। সৃষ্টি ও তাদেরকে ইসলামের অনুসারী রূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন সাহেবসহ ফুরফুরা দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উলামা ও পীর-মাশায়েখের সাহিত্য ক্ষেত্রের অবদানও বিরাট ব্যাপার।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. এ.এম. আবুল মাসাকিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩
২. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, বাংলাদেশে কতিপয় আলেম ও পীর-মাসায়েখ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৭৯
৩. এ.এম. আবুল মাসাকিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
৪. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৫. ঐ, পৃ. ৮১
৬. ঐ, পৃ. ৮১
৭. ঐ, পৃ. ৮০
৮. এ.এম. আবুল মাসাকিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
৯. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
১০. এনামুল হক, পীর-মুরিদী, ঢাকা, পৃ, ০৯

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার:

সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হল ইসলাম। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স. ইসলামের দাওয়াতকে নবুওয়াতের সূচনালগ্ন থেকে ক্রমান্বয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম। তাই মহানবী স. মদীনায় আগমনের পর থেকেই সূচিত হয় ইসলাম প্রসারের অগ্রযাত্রার ইতিহাস। ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতে থাকে। ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও সংস্কৃতির জোয়ারেই প্লাবিত হয়েছিল ভারত উপমহাদেশ।

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই ব্যাপকভাবে এদেশে ইসলাম প্রচারকগণ আসতে থাকেন। ইসলামের পতাকাবাহীরা এখানে এসেছেন আরব, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে। তাঁরা এসেছেন কখনো বীরের বেশে, কখনো দরবেশের বেশে, আবার কখনো বণিকরূপে। পরবর্তীকালে অগণিত মুবাল্লিগ এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে। এদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশের অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বিরাট বিরাট এলাকা ইসলামের পূণ্য ভূমিতে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এদেশে গড়ে তুলেছিলেন হাজার হাজার ইসলাম প্রচারকেন্দ্র। এসমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র বা ইসলাম প্রচারকেন্দ্র থেকেই তৈরী হয়েছেন হাজার হাজার মুহাদ্দিস, মুফাসসীর, ফকীহ, শাসক, সেনাপতি, সৈনিক, কর্মচারী ও সমাজকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব।

মুসলমানগণ এদেশে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। তারা ১২০৩ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বছর এদেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। এদীর্ঘ শাসনামলে এদেশে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও আদর্শ মানুষ তৈরীর উদ্দেশ্য। মুসলমানরা এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক সুদূরাপ্রসারী বিপ্লব সাধন করে। ধর্মই ছিল তাঁদের শিক্ষার বুনিয়াদ।

ইসলামের পেশাদার ধর্মপ্রচারকের কোন ব্যবস্থা নেই। ধর্মীয় কর্তব্য বোধের তাগিদে সুফী দরবেশ ও আলিমগণ শহরে-বন্দরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। শুধুমাত্র ভাল কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে নয়, নিজেদের চরিত্র মাহাত্ম্য ও মানব সেবার মাধ্যমে তাঁরা মানুষের কাছে প্রতিভাত হতেন পরম শ্রদ্ধেয় পূন্যাত্মা হিসাবে। মানুষ আকৃষ্ট হত তাঁদের কাজে, কথায়, সেবায় ও তাঁদের মহত্বে। দীক্ষিত হত ইসলামে। নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য দুশ্চিন্তা না করে জানমাল কোরবান করেই তাঁরা ইসলামের বাণী প্রচারের সাথে সাথে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত থাকতেন। মুসলিম শাসক সুলতান ও শাসন-কর্তৃপক্ষের নানা স্তরের ব্যক্তিরা সেচ্ছায় বহন করতেন তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ভার। তাঁরা প্রায় সকলেই ইসলামী দায়িত্ব পালনের তাগিদেই দেশের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠা করতেন মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকাহ্, লঙ্গরখানা ও নানাবিধ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা। এসব মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকাহ্, লঙ্গরখানা, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নিয়ে গড়ে উঠত এক একটা বিশালায়তন ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থী ও দুস্থ মানুষের জন্য থাকত শিক্ষা-খাদ্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা, থাকত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠান বংশ পরম্পরায় সূফী, দরবেশ, আলিমগণের শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রচারকেন্দ্রে পরিনত হত এবং সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী শিক্ষা, আদর্শ ও সমাজকল্যাণের আলো বিস্তৃত হত সারা দেশে।

Dhaka University Institutional Repository

আলিম সমাজের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ ছিল যুগে যুগে, আর আজো তা অটুট রয়েছে। তারা ধর্মক্ষেত্রে, সমাজকল্যাণ ও রাজনীতির মধ্যে, শিক্ষা-সংস্কৃতির অংগনে আলিমদের উপদেশ নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করেছেন, তাদের চিন্তায় চেতনায় প্রভান্বিত হয়েছেন। আলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ একটি অংশ কালে কালে ধর্মক্ষেত্রে যেমন দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি রাজনীতি ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিয়েছেন 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা সম্প্রদায় থাকতে হবে, যারা কল্যাণের পথে ডাকবে (মানুষকে) এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে'- কুরআনের এই মর্মানুসারে তাঁরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করেন এবং ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে শিক্ষা-সংস্কৃতির ও সমাজকল্যাণের বিকাশ সাধনেও কান্ডারির ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯০ জন মুসলমান এদেশে আগত আউলিয়া ও সূফী দরবেশগণেরই পরিশ্রম ও সাধনার ফল।

এদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যতটা না ইসলামী সমাজকল্যাণের বিকাশ লাভ করেছে, তার চেয়ে শতগুণ বেশী সমাজকল্যাণ ধারা বিকশিত হয়েছে আলিম সমাজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে। এদেশের রাষ্ট্রীয় শক্তির উত্থান-পতন ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুকাবিলায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলাম প্রচার ও সমাজকল্যাণের মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন উপমহাদেশের আলিম সমাজ। কালের বিবর্তনে ইসলাম প্রচার ও সমাজকল্যাণ বাস্তবায়ন পদ্ধতির আকার-প্রকার ভিন্ন হলেও উপমহাদেশের আলিম সমাজই এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন-এর প্রবহমান ধারা বিদ্যমান থাকবে অনন্তকাল।

═══ ═══ ═══

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

অনুবাদকবৃন্দ : আল কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

অনুবাদকবৃন্দ : নাসাঈ শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

মোঃ আবদুল হালিম মিয়া : সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা-১৯৯৫

আব্দুল হক তালুকদার : সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০

সৈয়দ শওকতুজ্জামান : সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫

মোঃ আতিকুর রহমান : সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯৯

মোঃ আব্দুল হালিম মিয়া : সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৫

মুহাম্মদ আলী আকবর : "সমাজকর্ম প্রশিক্ষণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ও সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও অবদান" সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ সমাজকর্ম শিক্ষক সমিতি, রাজশাহী-১৯৯০

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান : সমাজকর্ম, বাংলা একাডেমী ঢাকা-১৯৯০

এ.কে. ব্রহী : 'ইসলামী জীবনের আদর্শ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬

আবুল হাশেম : সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ,' ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬,

সৈয়দ কুতুব : 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার', ইসলামের আহবান, ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ঢাকা।

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেসন্স, রাজশাহী-১৯৯৬

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম : মহানবীর (স.) অর্থ প্রশাসন, অগ্রপথিক, সিরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা-১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬

সম্পাদনা পরিষদ : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭

সৈয়দ সুলায়মান নদভী
(অনুবাদ আবদুল মান্নান তালিব) : 'শাশ্বত নবী' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২

মুহম্মদ তাইয়্যেব
(অনুবাদ, মাওলানা আলী আকবর হামিদ) : মানবতার বৈশিষ্ট্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৬

আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী, (অনু.) : ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৫

আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ : 'ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক ও সরকার', ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬

হযরত আলী (রা.) : "প্রশাসনের মূলনীতি" (অনু. খালেদ চৌধুরী) ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬

মোহাম্মদ আজরফ : ইসলাম ও মানবতাবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮০

রেজাউল করিম : সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল : বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের ইতিহাস, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা-১৯৭৪

ড. তারাচাঁদ অনুদিত এস.মুজিব উল্লাহ :ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হোসায়ন অনুদিত : ইবনে বতুতার সফরনামার উর্দু অনুবাদ, আজাইবুল আসফার, ২য় খন্ড, দিল্লী-১৯১৩

মোঃ নুরুল ইসলাম : সমাজকর্মঃ ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫

সম্পাদনা : সমাজকর্ম : প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েজ, ঢাকা-২০০৫

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : ভারতবর্ষের ইতিহাস, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৯৪

আব্দুল করিম : বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭

মিনহাজ-ই-সিরাজ : তাবকাত-ই-নাসিরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬

আসকার ইবনে শায়খ : মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৮

ড.মুহাম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৩৩৫ বাং।

আবদুল হক দেহলভী : আখবারুল আখিবার, দিল্লী, ১৩৩২ হিজরী।

ড. কাজী দীন মুহাম্মদ : সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৬১

দেওয়ান মুহাম্মদ নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী : হযরত শাহজালাল (রহঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭

আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক : ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দীকী, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১ম সং-১৯৮০

সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত : সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-১৯৭৬

সৈয়দ আবদুল মতিন জাহাঙ্গীর : গাওসে যমান শাহ সূফী ফতহ আলী, ১ম সং, রবি আর্ট প্রেস, কলকাতা-১৩৮০ (১৯৭৩)

হুমায়ুন আবদুল হাই : মুসলিম সংস্করক ও সাধক, ঢাকা-১৯৭৬

আনিসুজ্জামান : মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৯

ড. ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩

গোলাম মুহাম্মদ : হায়াত আশরাফ, করাচী, মাকতাবায়ি থানবী, ১৯৬৩

নাযমূল হাসান : হাকিমূল উম্মত আশরাফ আলী থানবী, মুজাফফর নগর, ইদারায়ে তালিকাতে আশরাফীয়া।

আব্দুস সামাদ করিম : হাকিমূল উম্মত কি মুখতাসার সাওয়ানি, হায়াত, এম. গানাউল্লাহ এ্যান্ড সন্স-১৯৬১

আব্দুর রহমান খান মুন্সী : সীরাতে আশরাফ, ১ম খন্ড, শায়খ একাডেমী, লাহোর।

মাওলানা মুশতাক আহমদ : তাহরিক-এ-দেওবন্দ, ঢাকা-১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মোয়েজ্জদীন হামিদ : কর্মবীর মাওলানা রুহুল আমীন, ২৪ পরগণা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

আল-আমীন : ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা-১৯৭৭ খ্রী.

মোহাম্মদ রুহুল আমীন : ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব, ঢাকা-১৯৮৭

শাব্বির আহমদ ওসমানী : ইসলাম ও মুজিযাত, ইদারা-এ-আশরাফিয়া, তাবি।

জুলফিকার আহমদ কিসমতী : বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ। প্রগতি প্রকাশনী ঢাকা-১৯৮৮ খ্রী.

মাওলানা বশীর আহমদ : "তাযকিরাতুল আওলিয়া, শিরীন পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান : মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এর শিক্ষাজীবন, আল্লামা শামছুল হক স্মরণিকা, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, গোপালগঞ্জ-১৯৯৭ খ্রী.

মাওলানা আবদুর রাজ্জাক : সমাজ সংস্কারক আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরীর জীবনী, গোপালগঞ্জ।

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী : হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৯২ খ্রী.

মাওলানা মুহাম্মদ তকী ওসমানী : নকুস-এ-রফতেগা দেওবন্দ, মাকতবা জাবীদ-১৪১৪ হিজরী।

মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার : ফরিদপুরে ইসলাম, ইফাবা-১৯৯৭ খ্রী.

আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪

শেখ হাবিবুর রহমান : সাহিত্যরত্ন, কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪৩

এসরার আহমদ খান : মুফতী দীন মোহাম্মদ খান, এসিরায় রোড, ঢাকা।

বাদরে আলাম মীরাঠী : মূকাদ্দীঃ ফায়দুল বারী, কায়রো-১৯৩৮

মুহাম্মদ আজহার শাহ : হায়াত-ই-আনওয়ার, দিল্লী-১৯৫৫ খৃ.

মুহাম্মদ যুসুত বিন্নুরী : মুশকিলাতুল কুরআন, দিল্লী-১৩৫৭ হিজরী, করাচী।

আনজার শাহ মাসউদী : নাকশ-ই-দাওয়াম, দিল্লী-১৯৭৮ খৃ.

আব্দুল হাই আল হাসানী : নুযহাতুল খাওয়াতির, ৮ম খন্ড, দুইরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, ১৯৭০ খ্রী।

মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার : আল ইসলাহ স্মরণিকা, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা-২০০৭

মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : বাংলা ভাষার কুরআন চর্চা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৮৬

সৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পা) : মওলানা ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম-১৯৮০

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা-১৯৫৮

আবদুল লতীফ শরিফাবাদী : পীর বাদশা মিঞা, ঢাকা-১৯৭৫

ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ : পূর্ব বঙ্গীয় রাজনীতিক উলামার জীবনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

আ.জ.ম. সিকান্দার মোমতাজী : যাঁদের ভুলিনি, পটুয়াখালী, ১৯৮৭

আবুল মনসুর আহমদ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আগস্ট-১৯৭৫

Maclver and Page : **Society**, Indian Print, 1972

Elizabeth Wickenden : **Social Welfare in Changing World,** Washington, Department of Health Education and welfare, 1965

Ronald C. Federico : **The Social Welfare Institution,** Lexinton, D.C, Health and Co, 1983

H. L. Wilensky &

Dhaka University Institutional Repository

Charles N lebeaux : **Industrial Society and Social Welfare,** Newyork, Russel sage foundation, 1958

Editors Board : **Encyclopedia of Social Work,** Newyork, the National association of social workers of U.S.A, 1965

W.A. Friedlander : Introduction to social welfare, New Delhi, Prentice Hall-1963

Bradford W. Sheafor, : Tecknique & Guidlines for social work, Boston-1988

Charles R.Horesji : Social Work in Contemporary Society, 2nd ed. 1998

Charles D. Garvin

Charles Zastraw : Introduction to Social Welfare Institutions, Social Problems, Services Current Issues, 1982

Md. Ali Akbar and

Sayed Ahmed Khan : "Private Investment in Social Welfare, College of Social Welfare and Research, University of Dhaka-1971.

R.C. Fedrico : Social Welfare in todays World, 1990

Lieen Garmbrill : Social Work practics, A Critical thinkers Guide, Oxford University Press, NewYork.

W.A. Friedlander :Introduction to Social Welfare (3rd ed), 1969

Skidmore and thackery : Introduction to Social Work, 1991

Friedlander and Apte. : Introduction to Social Welfare, New Delhi, Prentice Hall of India Pvt. Ltd. 1982

Hammudah Abdalati : Focus in Islam, Al-Ittehad-al-Islami-al-Alami, Jeddah, 1973

Abul Hashim : The Creed of Islam, Islamic Foundation Banlgadesh, Dhaka-1987

P. K. Hitti : History of the Arabs, London.

William Muir : Caliphate, Its Rise, Decline & Fall, Edinburgh-1934.

R. C. Mojumdar : "Social Work in Ancient and Mediaval India", in History and Philosophy of Social Work in India, (Wadia ed.), 1961.

M. S. Gore and I. E. Soares : "Historical Background of Social Work in India", in Social Welfare in India, Planning Commission of India, New Delhi, 1955

G. R. Madan : "Indian Social Problems" Vo-2, New Delhi, 1980.

M.I. Gazdar : Charities their Past, Present & Future in socialwelfare in India, Pci, New Delhi-1955

K.S. Lal : Early Muslim in India, New Delhi, 1984.

Mohammad Nurul Haq : Arab Relation with Bangladesh, 1980, Ph.D thesis, DU.

Mohammad Khalid : Welfare Statet A case study of Pakistan, Royal Book Co. Karachi, 1968

Sayed Athar Abbass Resvi : A History of Sufism in India, Vol-2, New Delhi, 1983

Dr. Muhammad Enamul Haq : A History of Sufism in Bengal, 1st Ed Asiatic Society, Dhaka, Bangladesh, 1975.

Dr. A.K.M. Ayub Ali : History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, Down to AD 1980, 1st ed. Dhaka-1983

Ghulam Hussain Salim : Riyazu-S-Salatin (A history of Bengal), Tr. Abdus Salam, 1st Ed. Delhi, 1903

Naresh Kumar Jain : Muslims in India, Vol-I.